Volume-IV, Issue-I, July 2022

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

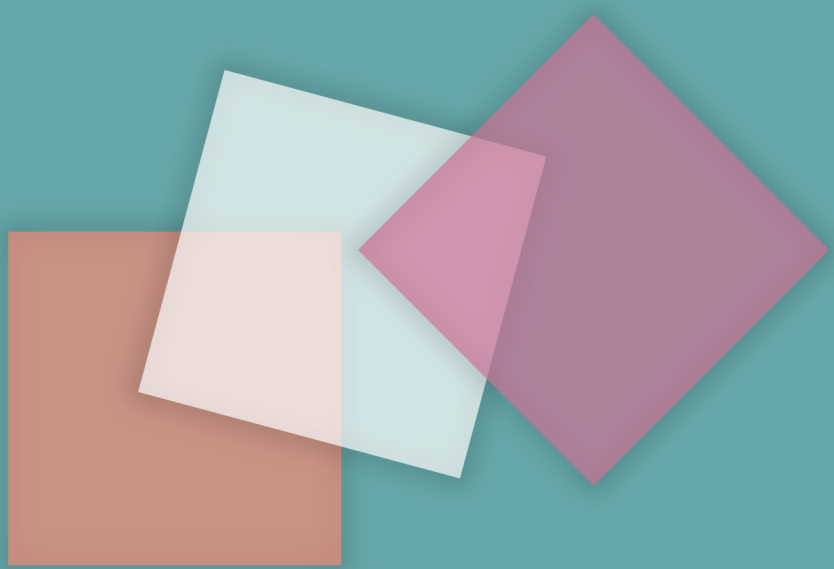

Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Volume -IV, Issue-I, July 2022

Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal

Half Yearly Publication of Government Brajalal College

Editor

Professor Sharif Atiquzzaman Principal, Government Brajalal College

Review Committee

Professor Dr. Khandakar Hamidul Islam	Head, Department of Islamic Histroy & Culture
Professor Dr. Khandakar Ahsanul Kabir	Head, Department of Physics
Dr. Md. Mizanur Rahman	Head, Associate Professor, Department of Social Work
Dr. Hosne Ara	Associate Professor, Department of Zoology
Shankar Kumar Mallick	Associate Professor, Department of Bangla
Roxana Khanam	Associate Professor, Department of English
Dr. Emanul Haque	Associate Professor, Department of Bangla Goenka College of Commerce & Business Administration, Kolkata, India
Amal Kumar Gain	Assistant Professor, Department of History
Rami Chakraborty	Assistant Professor, Department of Bangla Assam University, India
Dr. Md. Sarwar Hossain	Assistant Professor, Department of Mathematics

Mailing Address

Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna-9200, Bangladesh
Phone : 0088-02477702944 email : infoblcollege@gmail.com
Website : www.blcollege.edu.bd

Printed by

Rabi Printing Press
27, Samsur Rahman Road, Khulna-9100, Bangladesh

© **Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh**

ISSN : 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022

Contents

বাংলা অংশ

- বিশ শতকের নির্বাচিত কবির কবিতায় নারীর নিজস্ব ভাষার বহুমাত্রিকতা
  সহেলী সামন্ত 07-20
- বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস বিতর্ক
  ড. সুদেষ্ণা বণিক 21-29
- অমর মিত্রের *ধুলোগ্রাম* : বাস্তুহীনের বিকল্প 'জামতলি'
  শ্রাবন্তী মজুমদার 30-38
- একক মাতৃত্ব এবং সেলিনা হোসেনের দুটি গল্প
  ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী 39-50
- নোয়াম চমস্কির অন্বয়তত্ত্ব ভাবনার কয়েকটি দিক ও বাংলা বাক্য
  ড. বিপ্লব দত্ত 51-62
- বাউল দর্শনে লালনের মানবতাবাদ : একটি পর্যালোচনা
  প্রেমানন্দ মণ্ডল 63-74
- পূর্ণেন্দুর মাধবী : প্রসঙ্গ কবিতা
  অমিত মণ্ডল 75-82
- চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যভাবনা বনাম চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যপ্রেম
  শেলী দত্ত 83-105

English Section

- Impacts of Active Learning on Students' Academic Performance at Undergraduate Level Zoology Classes
  Dr. S. M. Ali Ashraf 109-125
- On Some Characteristics of the Joint Distribution of Sample Variances
  M. Hafidz Omar and Anwar H. Joarder 126-139
- Study of Nanocrystallization Kinetics in $Fe_{73.5}Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ Finemet Type Alloy by Differential Thermal Analysis and Using Different Models
  Pritish Kumar Roy and Dr. Shibendra Shekher Sikder 140-155
- The Possibility of Participating Honour's Level Students in Insurance Sector as a Part of Financial Inclusion : A Practical Study
  Sonjit Shingha 156-171
- Marginalisation of Women on Caste
  A Subaltern Study of *Chandalika* and *Draupadi*
  Sharif Atiquzzaman 172-179

Government Brajalal College
Khulna
Bangladesh

BL College Journal

ISSN : 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV Issue-I
July 2022

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal
Half Yearly Publication of Government Brajalal College
July 2022

Published by

Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh

Disclaimer

The opinions expressed in the articles published in this journal are the opinions of the authors. The members of the review committee, the editor or the publisher of the *BL College Journal* are in no way responsible for the opinions expressed by the authors or the conclusions deduced by them.

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022

Government
Brajalal College
Khulna
Bangladesh

BL College Journal

ISSN : 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV Issue-I
July 2022

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Contents

বাংলা অংশ

- বিশ শতকের নির্বাচিত কবির কবিতায় নারীর নিজস্ব ভাষার বহুমাত্রিকতা
  সহেলী সামন্ত 07-20
- বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস বিতর্ক
  ড. সুদেষ্ণা বণিক 21-29
- অমর মিত্রের *ধুলোগ্রাম* : বাস্তুহীনের বিকল্প 'জামতলি'
  শ্রাবন্তী মজুমদার 30-38
- একক মাতৃত্ব এবং সেলিনা হোসেনের দুটি গল্প
  ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী 39-50
- নোয়াম চমস্কির অন্বয়তত্ত্ব ভাবনার কয়েকটি দিক ও বাংলা বাক্য
  ড. বিপ্লব দত্ত 51-62
- বাউল দর্শনে লালনের মানবতাবাদ : একটি পর্যালোচনা
  প্রেমানন্দ মণ্ডল 63-74
- পূর্ণেন্দুর মাধবী : প্রসঙ্গ কবিতা
  অমিত মণ্ডল 75-82
- চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যভাবনা বনাম চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যপ্রেম
  শেলী দত্ত 83-105

Volume -IV, Issue-I, July 2022

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 07-20

বিশ শতকের নির্বাচিত কবির কবিতায় নারীর নিজস্ব ভাষার বহুমাত্রিকতা

সহেলী সামন্ত

সহেলী সামন্ত
পিএইচডি গবেষক
বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: saheli.samanta2016@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সমাজে নারীর অবস্থান, তার নিজস্ব জগৎ তৈরি করে, তৈরি করে তার নিজস্ব ভাষা (Women's Dialect)। পুরুষের চোখে নারীর কল্পনা নয়, নিজের ভাষায় নারীর নিজের বক্তব্য তুলে ধরার পর্ব শুরু হয়েছে। সেই ভাষা একটি নতুন পথ নির্মাণ করেছে। এই ভাষায় যেমন নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বঞ্চনার কথা ব্যক্ত হয় তেমন বিচিত্র অভিমুখও চিত্রিত হয়। Laura Mulvey 1975 সালে 'Male Gaze Theory'র কথা বলেন। বাংলা কবিতায় এই Theory ভাঙার পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল বহু আগেই। এই প্রবন্ধে বিশ শতকের নির্বাচিত চারজন কবি কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন, কেতকী কুশারী ডাইসন ও গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভাব ও ভাষা দ্বারা, নারীর নিজস্ব ভাষার বিচিত্র স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। কবিতা সিংহের কবিতার ভাষা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার, নবনীতা দেবসেনের কবিতাভাষা সংহত, কেতকী কুশারীর কবিতাভাষা আপাত সরল কিন্তু তীব্র অনুভূতিতে ঋদ্ধ, গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাভাষা সংস্কৃতঘেঁষা প্রজ্ঞা ও মননের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। নারীর নিজের ভাষা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। বর্তমান প্রবন্ধে নির্বাচিত কবির কবিতাভাষা ও ভাবনার মধ্য দিয়ে নারীভাষার বহুমাত্রিক স্বরূপকে তুলে ধরা হয়েছে।

মূলশব্দ

নারীর নিজস্ব ভাষা, স্বরূপ ও বহুমাত্রিকতা, নির্বাচিত কবির কবিতা

ভূমিকা

বর্তমানে সমাজে প্রচলিত ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল নারীর ভাষা (Women's Dialect)। নারীর ভাষা তৈরি হয় তার সামাজিক অবস্থান থেকেই। এ জগৎ তার নিজস্ব সম্পদ। নারীর ভাষা তাই আলোচনার দাবী রাখে। সমৃদ্ধ এই ভাষাভাণ্ডারটি বিচিত্র অনুভূতিতে ঋদ্ধ। পিতৃতন্ত্রের নির্ধারিত প্রচলিত পথরেখার বাইরে

বেরিয়ে এই নতুন ভাষাপথটি নির্মিত হয়েছে। এই ভাষার মধ্যেও আবার রয়েছে বিভিন্নতা। নির্বাচিত কবির কবিতার ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়ে নারীর নিজস্ব ভাষার ভিন্ন পরিসরকে খুঁজে দেখার প্রচেষ্টা আছে।

পদ্ধতি

প্রবন্ধটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণাত্মক। এখানে বিশ্লেষণধর্মী ও তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসাবে বিভিন্ন আকর গ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

১.

নারী যে ভাষায় তার একান্ত নিজের মনের ভাব নিজের মতো ব্যক্ত করে তাকেই বলা হয় নারীর নিজস্ব-ভাষা। সমাজে নারীর অবস্থান তার স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণ করে। নারীর নিজস্ব এমন কিছু অনুভূতি, জিজ্ঞাসা বা সমস্যা আছে যা পুরুষের থেকে আলাদা। যার প্রতিক্রিয়া পড়ে তার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আচরণে এবং তার প্রতিফলন দেখা যায় তার নিজস্ব ভাষায়। *Women's Dialect In Bengali* (1928) বইতে সুকুমার সেন বলেছেন-"Even from the earliest days in the history of mankind, women have a special environment of their own. Men and women have different spheres of occupation. This is true of every country and of every people.....

But though the languages of modern civilized peoples have no sex dialect proper, yet almost all of them preserve some characteristic idioms which are entirely, or almost entirely, confined to womenfolk …..

The origin of the different sex dialects or idioms lies in different psychologies of man and woman."[১]

অর্থাৎ- ক) অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় নারীর একটি বিশেষ পরিসর ছিল, কর্মক্ষেত্রেও ভিন্নতা ছিল পুরুষের তুলনায়। এটি সব দেশ, কাল ও সময়ের নিরিখে সত্যি। খ) যদিও বর্তমান সময়ে আলাদাভাবে কোনো মহিলা বা পুরুষের লিঙ্গভাষা নেই, কিছু বিশেষ চরিত্র আজও রক্ষিত আছে নারীর কথ্যভাষায়। এবং গ) নারী ও পুরুষের লিঙ্গভাষার তারতম্য হয় মূলত ভিন্নধরনের মানসিকতা থেকে।

এই বইতে তিনি নারীর ভাষার কতগুলি প্রধান চরিত্রের কথাকেও উল্লেখ করেছেন–

ক) নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল (conservative) এবং প্রাচীন (archaic)।

খ) নারীর ভাষার মধ্যে যতখানি নিন্দার বিষয়বস্তু থাকে ততখানি কিন্তু যথাযথ শব্দ থাকে না, অতিকথন দোষে দুষ্ট হয়। পুরুষের তুলনায় নারীর ভাষা বেশি ভাবপ্রবণ (more emotional)।

গ) নারীর ভাষার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন শ্রুতিমাধুর্যকে (Euphemism)। নারীর ভাষার মধ্যে একটা গোপনীয়তা বা লাজুক বৈশিষ্ট্য থাকে যাকে সে তার ভাষায় লালিত করে।

ঘ) নারীর ভাষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন (superstitious)। যদিও বর্তমানকালে সেই কুসংস্কার থেকে নারীরা বেরিয়ে আসছেন।

ঙ) পুরুষদের তুলনায় নারীর ভাষার শব্দসংখ্যা সীমিত (limited vocabulary)। পুরুষের ভাষায় অনেক নতুনত্ব আছে কিন্তু নারীর ভাষা প্রাচীনতায় পূর্ণ (Old vocabulary)।

চ) নারীর ভাষায় নিন্দা (Pejorative terms), বিদ্রূপ (smart taunts) এবং উপহাস (saucy ridicule) বেশি গুরুত্ব পায়।

দীর্ঘদিনের গবেষণার পর সুকুমার সেন নারীর ভাষার কতগুলি প্রধান চরিত্রের কথা বললেন, এর থেকে আমাদের নারীর ভাষার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেছেন ভিন্ন লিঙ্গভাষার কারণ হল, ভিন্ন মানসিকতা বা 'different psychology'।

এই ভিন্ন মানসিকতা তৈরি হয় কিভাবে? তার ব্যাখ্যা পাই *Language And Woman's Place* (1975) Robin Tolmach Lakoff এর বইতে - "I think, that women experience linguistic discrimination in two ways, in the way they are taught to use language, and in the way general language use treats them. Both tend, as we shall see, to relegate women to certain subservient functions : that of sex object, or servant ; and therefore certain lexical items mean one thing applied to men, another to women, a difference that can not be predicted except with reference to the different roles the sexes play in society." [২]

ভাষাগত বৈষম্যের দুটি পথ - প্রথমত, নারী তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যেভাবে ভাষাকে ব্যবহার করে এবং দ্বিতীয়ত, সমাজে নারী যেভাবে লালিত হয় সেই অবস্থানও ভাষা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই নারীর ভাষা প্রসঙ্গে এই দুটি দিকই বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

দুটি ধারণা আমরা পেলাম-একটি বাংলায় নারীদের ভাষা সম্পর্কিত দীর্ঘ গবেষণার ফল এবং অপরটি আমেরিকার নারীদের ভাষার উপর লিঙ্গের প্রভাব বিষয়ক প্রস্তাব থেকে গৃহীত। তবে দুটি ভাবনা থেকে নারীর নিজস্ব ভাষার স্বরূপ জানা গেল। বাংলা কবিতায় নারী ভাষার বিচিত্র রূপ আছে, নারীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর বহু আগেই শোনা গিয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর রামী, সপ্তদশ শতাব্দীর চন্দ্রাবতী হয়ে উনিশ শতকে একাধিক মহিলা কবির কথা জানতে পারি - কৃষ্ণকুমারী চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা। এছাড়াও পাই গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, কুসুমকুমারী দাশ প্রমুখেরা। গীতিকবিতার যুগ শেষ করে কবিতার যুগে ধীরে ধীরে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত কবি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার হাত ধরে আবির্ভাব রাজলক্ষ্মী দেবীর। এতদিনের প্রচলিত পুরুষ নির্মিত ভাষা, ভাব, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে নিজস্ব ভাষা নির্মাণ পর্ব শুরু হল। এর বহুবছর পরে ১৯৭৫ সালে ব্রিটিশ নারীবাদী সিনেমা তাত্ত্বিক Laura Malvey তাঁর *Visual Pleasure And Narrative Cinema* বইতে 'Male gaze' কথাটিকে ব্যবহার করেছেন। যেখানে তিনি লিঙ্গগত বৈষম্য বিষয়ক দুটি পৃথক শ্রেণির কথা বলেন- 'Active Male' এবং

'Passive Female'। নারীকে নিষ্ক্রিয়, পুরুষের কল্পনার বিষয় হিসাবেই এতদিন ভাবা হত। এই 'Male gaze' ভাঙার পথ তৈরি হয়ে যায় বহু আগে থেকেই। নারী তার নিজস্ব ভাবনায় নিজস্ব ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। পূর্ববর্তী মহিলা কবিদের কলমে উঠে এসেছিল অন্তঃপুর জীবনের রুদ্ধশ্বাস, শোকগাথা, আনন্দ, বিষাদ ও প্রেমানুভূতির সহজ স্বীকারোক্তি। রাজলক্ষ্মী দেবী প্রথম বাংলা কবিতায় সেই নারীর স্বকীয় ভাষার নির্মাতা, যার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল কবিতা সিংহের হাতে। তারপর ধীরে ধীরে একাধিক কবির কলমে এই ভাষা ভিন্নমাত্রা লাভ করছে, এই ভাষা নতুন ও বর্ণময়।

২.

ক) কবিতা সিংহের কবিতা

বিশ শতকের পাঁচের দশকের একজন অন্যতম কবি কবিতা সিংহ। তাঁর কবিতার কেন্দ্রবিন্দু, নারী। যিনি কবিতা শুরু করলেন 'না' দিয়ে–

> "না, আমি হব না মোম
> আমাকে জ্বালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না।
> হবো না শিমুল শস্য সোনালী নরম
> বালিশের কবোষ্ণ গরম।" [৩]

এতদিন নারী ছিল কবির কল্পনার বিষয় বা subject, সেই নারী আজ নিজে কথা বলছে, প্রত্যাখ্যান করছে প্রচলিত কাঠামোটিকে। সে নিজে তার সৃজনী সত্তাকে আশ্রয় করে চেনাপথ থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব পথ নির্মাণ করছে।

সদ্য পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া ভারতবর্ষ, বিপর্যস্ত জনজীবনের সত্তার গভীরে যখন চলছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, স্বাধীনচেতা নারীরা তখন ঘরের চৌহদ্দি থেকে পা রাখছে কাজের জগতে, আর্থিক সংকট যার অন্যতম কারণ। এমন সময় বাংলা কবিতায় মূর্ত বিদ্রোহিনী কবিতা সিংহের আবির্ভাব।

'না', কেবল একটি উচ্চারণ নয়, প্রতিবাদ, ফিরে দাঁড়ানোর ধ্বনি। সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে পরবর্তীকালের একাধিক কবির কবিতায়। আসলে এই প্রত্যাখ্যানের সুর ভিন্নমাত্রায়, ভিন্নসুরে ভিন্ন কবির মানসলোকের অন্তর্গত ফসল হয়ে চিত্রিত হয়েছে। কবিতা সিংহের নিজের কবিতাতেই 'না' ভিন্নমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েক প্রজন্ম বাহিত বঞ্চনার নির্যাস, সমাজে নারীর অবস্থানগত বৈষম্য, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সাম্য সমাজের প্রত্যাশা, বোধের সর্বোচ্চ মাত্রাকে স্পর্শ করেছে তাঁর কবিতা।

কবিতা সিংহের চিত্রিত নারীসত্তাটি ঠিক কেমন?

> "অজস্র ছুরিকাঘাত তবু সে রানির মতো স্থির
> দুহাত বুকেতে চিকে, রক্ত ধারা হাজারো ফিনিক
> গুপ্তঘাতকের মুখ, বিষাক্ত আকর্ণ টান তীর
> তবু তার পিঠ নয়, সারা বুক বিদ্ধ করে দিক।"[৪]

যখন কবিতা সিংহ লিখছেন, তখনও পর্যন্ত মহিলার কবিতা লেখা ভালো চোখে দেখা হত না বা গ্রহণযোগ্যতাতেও বহু সমস্যা ছিল। ঈর্ষা, নিন্দা, সমালোচনা সবকিছুই দেখতে হয়েছে, তবুও থেমে থাকেননি, চোখে চোখ রেখে সাহসের সঙ্গে কথা বলে গেছেন। নারীর দুঃখ, বঞ্চনার ইতিহাসকে সোচ্চারে কবিতায় প্রকাশ করেছেন। চেনা পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়িয়ে নারী ধীরে ধীরে 'সব হিসেবের বাইরে' চলে যায়–

"জ্বলন্ত রমণী যায় নাগালের, শুশ্রূষার সম্পূর্ণ বাহিরে।

বুকের উপরে তার রক্ত শোষে ঐতিহ্যের জোঁক
অকালে নিহত তার মাতাময়ী রোগ রেখে গেছে
ক্রুদ্ধ রক্তচাপ ওঠে, অগ্নি বমন ওঠে, রক্তকণা বাহিত ফোয়ারা
বুকের তলায় তার মাথা কোটে জননীর বহ্নি কর্কট,
সেই দুঃখ, সেই রোগ, সেই নীল অঘোর-বঞ্চনা
সংসার সমাজ থেকে নিয়ে যায় খসায়ে তাহাকে

অনলবর্ষিণী যায়, তীব্র অশ্বে শুশ্রূষার, নাগালের, সম্পূর্ণ বাহিরে।"[৫]

কবিতা সিংহের কবিতার ভাষা এমনই ধারালো। অকালে মৃত পূর্বনারীরা তাঁর রক্তে আলোড়ন তোলে, তাঁর কবিতার ভাষাকে শানিত করে। শুধু পরিবার নয় সমাজেও এমন অগাধ উদাহরণ ছিল, যার উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন কবি। ক্রমাগত 'অদ্ভুত হীনতা' থেকে 'চরিত্রের দিকে' উপনীত হচ্ছে তাঁর নারীসত্তাটি। আত্মনির্মাণের পর্বে পৌঁছে গেছে সে, এই যাত্রাপথের Transformation বা রূপান্তরটিকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন–

"কার সঙ্গে কথা বলো? আমি ত কবেই চলে গেছি!
যে ভাবে নারীরা যায় শব্দহীন চালচিত্র ছিঁড়ে
দেহ থেকে খসায়ে শিঞ্জিনী, ধ্বনিমায়া
হাট করে চলে যায় ভ্রূমধ্য টিপের লাল খিড়কি দরোজা
যে ভাবে নারীরা যায় অদ্ভুত হীনতা থেকে চরিত্রের দিকে।

সঙ্গবিহীন একা, নিজের আঁতুড়ে
আপন মৃত্তিকা ছেনে নিজের নির্মাণে।" [৬]

কবিতা সিংহের কবিতাভাষার তীব্রতা লক্ষ করি বেশ কয়েকটি কবিতায়– 'স্বয়ংক্রিয়' কবিতায় ১৯৬৬ সালের কুমারী মালতী মিত্রের সেকেন্ড হ্যান্ড 'পুরুষ বিকল্প' বা 'বিকল্প পুরুষ' কেনার কথা বলেছেন–

"একশো চুম্বন পাবে এই লাল স্যুইচ জ্বালালে
চারশত তোষামোদ কবিতার উদ্ধৃতি সমেত
আলিঙ্গন / যৌনক্রিয়া / মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকা
খয়ের গোলাপী নীল
এই সব বিবিধ বোতামে।"[৭]

পুরুষের ব্যবহারে অতিষ্ট নারী 'বিকল্প পুরুষ' এর কথা ভাবছে। মানুষ নয়, যন্ত্রের কাছে ভরসা রাখছে সে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি নারীর প্রত্যাশিত সমস্ত আবদার পূরণ করে দেবে। ১৯৬৬ সালে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কবিতার ভাষা উচ্চারণ করতে পারেন কবিতা সিংহ। কিংবা, 'এস্‌টাব্লিশমেন্ট' কবিতায় anti-establishment বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করেছেন–

"তখন নিজেকে এক সম্রাজ্ঞীর মতো মনে করে
মনে হয়, তোমাকে নিক্ষেপ করি দাসীদের আহ্লাদী সভায়!
কিম্ভূত রগড় দেখি।" [৮]

পুরুষকে দাসীসভায় নিক্ষেপ করার চিন্তা দ্বারা এভাবে বিপরীত ভাবনার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে পিতৃতন্ত্রকে (Patriarchy) সজোরে আঘাত করেছেন।

খ) নবনীতা দেবসেনের কবিতা

বিশ শতকের পাঁচের দশকের অন্যতম কবি নবনীতা দেবসেন। তাঁর কবিতা ভাষায় একটা স্বাভাবিকতা আছে। সেই স্বাভাবিকতার মধ্যেও তিনি স্পষ্টভাষায় নারী-পুরুষের প্রকৃত অবস্থানের কথাকে ব্যক্ত করেছেন। প্রেম ও প্রেমহীনতার বেদনা ভিন্নভাবে কবিতা হয়ে এসেছে। ১৯৬৪ সালের ৯ মে লিখছেন 'ছুটি' কবিতাটি। যে নারীসত্তাটি তার সর্বস্ব দেয় প্রেমের জন্য, তার প্রাপ্তি কি থাকে? ছুটি বা প্রত্যাখ্যান। প্রেমে উন্মুখ সত্তাটি যখন প্রিয় মানুষের অন্তর থেকে ছুটি পায় তখনও কোনো তীক্ষ্ণ বাক্যমালা নেই, অন্তর্গত বেদনায়, অভিমানে পরিস্ফুট। নবনীতা দেবসেনের কবিতায় বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সংযত শব্দমালায়। 'পুষ্পিত প্রহার' কবিতায় বলেছেন–

"তুমি মেরেছিলে ব'লে আজ আমার ফুলন্ত বাগান।
প্রতিটি আঘাত কাঁপে কণ্টকিত কেতকীর ঝাড়ে
গোলোক চাঁপায় ঝরে সকালের অশ্রুজল যত
শোণিতাক্ত কৃষ্ণচূড়া জ্ব'লে ওঠে বসন্তবাহারে।

কোনোখানে লেখা নেই সেদিনের বিস্মৃত বানান
সমস্ত বেদনা এক পুষ্পময় প্রহারে সংহত।" [৯]

তাঁর কাছে 'সমস্ত বাস্তব / একটি তরঙ্গতৃপ্ত সমুদ্রের স্তব'। অন্তর্গত একাকী সত্তার প্রকাশেও একটা আড়াল রাখছেন। নিজের জীবনের দুঃখকথাকে একেবারে উদোম করেননি।

'দিগ্বিজয়ের রূপকথা' কবিতায় কবি 'আশীর্বাদ দুটি সরঞ্জাম' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন– 'বিশ্বাস' ও 'ভালোবাসা' কে। তবে তাঁর শেষপর্বের কবিতাগুলোতে আছে একাধিক নারীসত্তা। 'ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নম্' কবিতায় কুন্তীর প্রত্যাশার মধ্যে নিহিত আছে প্রতিবাদ। যে কুন্তী একদিন লোকলজ্জার ভয়ে সন্তান বিসর্জন দিয়েছিল। আজ আর সে ভয় পায় না, বরং পুত্র কামনা করে সূর্যদেবের কাছে। নবনীতা দেবসেনের নারীসত্তাটিও ঠিক আজকের কুন্তীর মতোই পরিণত। কিংবা ১৯৭১ সালে 'স্বামীর জন্য টাট্‌কা স্যালাড' কবিতাটি শ্রীমতী জারমেইন গ্রীয়রকে

উদ্দেশ্য করে লেখা। এখানেও আছে তীব্র শ্লেষ। পল দু ফেউ কে বিষমুক্ত করে সতেজ জীবনীশক্তি দিয়ে বাঁচিয়ে ১৯৬৮ সালে বিয়ে করলেও, স্থায়ী হয়নি বিয়ে, মাত্র তিন সপ্তাহ টিকে ছিল। বিশ্বাসভঙ্গই একমাত্র প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু গ্রীয়র থামলেন না ১৯৭০ সালে জন্ম নিল তাঁর বিখ্যাত বই- *The Female Unuch* যা সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ভালোবাসার আর এক আয়না তুলে ধরেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের কুসুম এর কথা দিয়ে, বা 'পুতনার প্রতি' কবিতায়ও উঠে আসে তাঁর প্রতিবাদী অক্ষরমালা। পুতনা কংসের ভাড়াটে দানবী, যার দ্বারা শিশুকৃষ্ণকে হত্যার পরিকল্পনা ছিল। যে তার বিষদুগ্ধ দ্বারা কৃষ্ণকে হত্যা করতে পারেনি বরং নিজের প্রাণ দিল। পুতনা 'Evil Spirit' এর মিথ হল। কবির প্রশ্ন শিশুকৃষ্ণের বিষমাখা দাঁত তো কম দায়ী নয়। নশ্বরী দানবী পুতনারা ব্যবহৃত হয়ে প্রাণ দেয় আর শিশুকৃষ্ণ বিষমাখা দাঁতেও 'মৃত্যুহীন দেবতা' রূপে পূজিত হয়। তাহলে সমাজে পুতনাদের প্রকৃত অবস্থান ঠিক কোথায়?

২০০১ সালে লেখা 'নাজমা', তাঁর অন্যতম একটি বিখ্যাত কবিতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সদ্যস্বামীহারা নাজমার দেহে আগামীর ভ্রূণ। দলাপাকানো মাংসপিণ্ড হয়ে স্বামী যখন ফিরে আসে তখনও সরস্বতী বোনরা স্বপ্ন দেখায়–

"নাজমা, তোমার নির্জলা চোখ, জানি-
কিন্তু এবার বুক ভেসে যাক দুধে
নতুন মানুষ আসছে তোমার কোলে

আমরা ওকে অন্য জগৎ দেব" [১০]

নাজমারা হয়তো এই 'অন্য জগৎ' এর প্রত্যাশায় পুনরায় বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

একটি 'ধর্ষণরাত্রির স্মৃতি'কে সামনে রেখে নারী ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির আকাশপাতাল তফাৎকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেও ছাড়েন না নবনীতা দেবসেন–

"পুরুষ : ওইদিন সন্ধ্যারাতে কোকিলের স্বর
নারী : ওইদিন চন্দ্রহীন রাত্রি দ্বিপ্রহর

পুরুষ : শাল পিয়ালের বনে পরী নেমেছিলো
নারী : সুন্দরীকাঠের বনে ব্যাঘ্র এসেছিলো

পুরুষ : জ্যোৎস্নামাখা বসন্ত বাতাসে
নারী : রক্তাক্ত উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে।।" [১১]

যে রাতটি পুরুষটির কাছে বসন্তের বাতাসমাখা সুন্দর আবহ, নারীটির কাছে সেই রাত এক অভিশপ্ত অমাবস্যা হয়ে আসে। কবি নবনীতা এইভাবে দ্বৈত ভাবনার অন্তর্গত বুনোটে চিত্রিত করে দেন পুরুষ ও নারীর প্রকৃত অবস্থানটিকে। তাঁর কবিতার শব্দমালা যথেষ্ট শক্তিশালী। আপাত স্নিগ্ধতার মোড়কে অনুভবের প্রগাঢ় কথামালা অনন্ত স্ফুলিঙ্গে সমান্বিত হয়ে আছে।

গ) কেতকী কুশারী ডাইসনের কবিতা

বিশ শতকের ছয়ের দশক থেকে কেতকী কুশারী ডাইসনের লেখা কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করলেও পড়াশোনা করেন অক্সফোর্ডে এবং বিবাহসূত্রে তিনি ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। তবে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখেন। তাঁর কবিতা বাংলা কবিতার জগতে একটি ভিন্ন মাত্রা আনে। তাঁর কবিতায় আমরা পাই প্রকৃতি ও বৃক্ষের প্রতি তীব্র সহানুভূতির প্রগাঢ় স্পন্দন, বিশ্ববন্দিত নানান বার্তা, নারীসত্তার বিচিত্র কারুকাজ - তিনি ধিক্কার জানান, ব্যঙ্গ করেন, প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেন, কোথাও বিব্রত হন, অনুপ্রেরণা পান। তবে তাঁর কবিতার নারী বিশ্বখ্যাতির আসনে অবস্থিত। ভাষার সারল্যে, অনুভূতির সুগভীর অনুরণনে তাঁর কবিতাগুলি চিত্রিত হয়েছে। আবার কবিতার ভাষায় উঠে আসে বিভিন্ন ভাবনা - ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে প্রয়াসী আবার কোথাও আছে পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা। কোনো কবিতায় আছে শৈশবের মেহেরপুরের স্মৃতি, শিকড়ের টান খোদিত হয় কবিতার অক্ষরমালায়। 'পিছুটান' কবিতায় বলেন–

> "আজ মনে পড়ে
> শীর্ণা ভৈরবীর তীরে ছোট মহকুমা, ছোট বাড়িখানি।
> দেওয়াল সিমেন্ট-ওঠা, কোথাও মলিন।
> ভোরের শিশিরে ভেজা নরম সবুজ মাঠে দোপাটির ঝরা পাপড়ি,
> রাশি রাশি কাঠমল্লিকা,
> লাল লঙ্কার চারা চিকণ পাতার ভারে ঢাকা।" [১২]

সেই স্মৃতি যখন প্রবল হয় তখন অন্তর্গত অনুভবের সংবেদন দ্বারা তিনি দেশকে দেখেন। তাঁর কবিতায় নারীসত্তা কখনও নালন্দার আরোগ্যভবনের প্রাচীরের নীচে থাকা নিঃস্ব জনপদ থেকে উঠে এসেছে। 'নালন্দার পথে' কবিতায় আছে সেই অস্থিসার, অবগুণ্ঠনবতী নারী - যে ছোট একটি পুষ্করিণীর প্রান্তে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে অনেক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, তার চোখদুটি কোটর নির্গত এবং সাদা নিশ্চল পাথরের মতো। এই মুখটি কবিকে তাড়িত করে, তিনি বলেন–

> "..... অন্ত্রের অভ্যন্তরটা কিরকম ঘুলিয়ে
> ওঠে, আর গৌতমের গৃহত্যাগ স্মরণে আসে। যখনই এ পথে যাই, ভাবি,
> এখন বোধ হয় সে থাকবে না; কিন্তু প্রত্যেকবারই তাকে দেখা গেছে।" [১৩]

দূর-দূরান্তর থেকে জ্ঞানার্থীরা আসেন নালন্দায় জ্ঞানলাভ করার জন্য কিন্তু কবি বলেছেন 'আমার অন্তঃসলিল চৈতন্যের সহস্র সংশয় ও জিজ্ঞাসা' নির্বান্ধব ঐ মানবীটির বিপন্ন অস্তিত্বের দিকে ছুটে যায়। গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক। বৌদ্ধরা তাঁকে দিব্য শিক্ষক মনে করেন, যিনি নিজের অন্তর্দৃষ্টির কথা সকলকে জানিয়ে চেতন সত্তার পুনর্জন্ম ও দুঃখের সমাপ্তি ঘটাতে সাহায্য করেছেন। কবি যখন নালন্দার পথে ঐ অসহায় নারীকে দেখেন তখন তাঁর মনে হয়, গৌতম বুদ্ধ যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা স্বচ্ছ ক'রে বুঝিয়ে যেতে পারেন নি - 'কিছু আবিল জলরাশি রয়ে গেছে।' ঐ নারীটির তো দুঃখের সমাপ্তি হয় নি। এইভাবে কবি কেতকী, নিজের অন্তর্দৃষ্টির ছোঁয়ায় বাস্তব থেকে তুলে আনেন ভাবনার বিষয়। নিজস্ব মনন ও প্রজ্ঞার দীপ্তিতে যা আলোকিত হয় কবিতা রূপে।

১৯৮০ সালে 'সবীজ পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঘর' কবিতাটি লেখেন তিনি। দুর্গাপুরের গান্ধীমোড়ে পর-পর দু-দিন এক যুবতী ভিখারিনিকে দেখেছিলেন, যে বিড়ি খেতে খেতে গভীরভাবে কোনো বিষয় ভাবছিল। সেই চাহনি কবি কেতকীকে ভাবায়, কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করায়। তিনি বলেন–

"আচ্ছা, আমার কি কোনো কালে কোনো ঘর ছিলো
সদরে বা অন্দরে ?"[১৪]

একটি দৃশ্য, এতো বড়ো একটা প্রশ্ন তৈরি করে। এই লেখার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে Adeline Verginia Woolf একজন ইংরেজ লেখিকা তাঁর *A Room Of One's Own* লিখেছিলেন (১৯২৯)। কবিতা সিংহ ১৯৭৭, ১৯ ফেব্রুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছেন 'আমাদের ঘর চাই'। সত্যিই নারীর নিজের ঘর কি আছে কোথাও? এই গভীর জিজ্ঞাসা আছে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এক সভায় সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন সৃজনশীল নারীর নিজস্ব ঘর প্রয়োজন। কবিতা সিংহ তীব্র বাক্যবাণে একাধিক কারণ দেখিয়ে বললেন 'আমাদের ঘর চাই'। আর কেতকী এক তরুণী যুবতী ভিখারিনির চোখ দিয়ে সমাজের দিকে তাকালেন এবং পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন নারীর নিজস্ব কোনো ঘর কোনো কালেই ছিল না।

কিংবা পাউডারের টিনের বাক্সে একটি মেয়ের মুখ তাঁকে বিব্রত করে। বিজ্ঞাপিত নারীদেহ সম্পর্কে যে ধারণা আছে সেই ধারণাটিকে সজোরে ধাক্কা দিলেন। যে মেয়েটির মুখ এখানে দেখানো হল সে তার সর্বস্ব দেয় নি, সেও খোলা চোখে এই পৃথিবীটাকে দেখছে। প্রয়োজনবোধে সে নিজেকে প্রকাশ করছে। এই জায়গায় কবি কেতকীর মোক্ষম জবাব আছে। কেবল মেয়েটি object নয়, সস্তার 'spice girl' নয়, বিপণনের সামগ্রী নয়, তারও মস্তিষ্ক আছে সেও পৃথিবীকে দেখে। কবি কেতকীর কবিতা লেখার এটি একটি বিশেষ রীতি। কোনো একটি সাধারণ বিষয়বস্তুকে নিজের প্রজ্ঞার স্পর্শে সোনা করে তোলেন, একটি Text তৈরি করেন। 'একটি খবর প'ড়ে' কবিতায় বাংলাদেশের বন্যায় ভেসে আসা একটি কিশোরীর মৃতদেহকে দেখে, তার সঙ্গে নিজের ভাবনাকে সমান্বিত করে নারীর অবস্থানকে চিত্রিত করেন। বেঁচে থেকে যে নারীর নিজের কোনো ঘর থাকে না, মৃত্যুর পরেও সে মাটি পেল না। কবি বলেন–

"পাণ্ডুর তোমার মুখটি, অকলঙ্ক -
নালফুল,
ছিন্নমূল, ভেলাসর্বস্ব,
অজাত বিশ্বের
ভ্রূণ, ভ্রাম্যমাণ,
অস্তিত্বের অন্বেষণে
সহোদরা।"[১৫]

এই কিশোরীটি যেমন ছিন্নমূল, তার পায়ের নীচের মাটি নেই সে আজ অস্তিত্বের সংকটে আছে। ঠিক কবিও নিজের সত্তাকে সমান্বিত করে বিদেশের মাটিতে থেকে একই রকম নিজের অস্তিত্বের অন্বেষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই 'সহোদরা' বলেছেন মেয়েটিকে। এ তো নারীসত্তার প্রকৃত অস্তিত্বের প্রশ্নকেও তোলে। সমাজে নারীর

প্রকৃত অবস্থান কোথায়? কোথায় তার 'মাটি'? সেও তো 'ছিন্নমূল', 'ভ্রাম্যমাণ', 'অজাত বিশ্বের ভ্রূণ' ধারণকারী, 'নালফুলে'র মতো। যে সত্তাটি শিকড়ের টানে মাটি খোঁজে প্রতিনিয়ত। এভাবে চেতনার গভীরে নাড়া দেয় কেতকীর কবিতার ভাষা। বাইবেলের প্রথম মানব-মানবী আদম-ইভের কাহিনির নতুন ব্যাখ্যা করলেন কবি কেতকী–

"অদৃষ্টের নব আদম,
বিস্মৃত সুকৃতের সাধন,
চুরমার পানপাত্র
জোড়া-দেওয়া তিল তিল ক'রে;
আজও তার হাতে আমার
দেওয়া হয়নি সে-আপেল
যা লাল হয় আমার জঙ্গলে
আর ঝ'রে পড়ে।"[১৬]

বাইবেলে পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী আদম ইভের কথা আছে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল আপেলের রূপকে যৌনতার স্পর্শে আদম ও ইভের স্বর্গচ্যুত হয়ে দুঃখময় মানবজীবন লাভ করার কাহিনি আমরা জানি। আদম ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি। ইভ, আদমের পাঁজর থেকে তৈরি, দ্বিতীয় নির্মাণ। ইভের যৌন কামনায় এই পতন। এই কাহিনির নব নির্মাণ করলেন কবি কেতকী, তিনি তাঁর ইভকে দিয়ে সেই ভুল করালেন না। ইভের যৌনআকর্ষণকে বাঁচিয়ে রাখলেন। ইভের কান্না বেঁচে থাকে আজীবন। তাঁর ইভ যৌনতার সুখ আদমের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে না। আর স্বর্গকে অপবিত্র করার ভয় নেই। একলা ইভ বাঁচতে পারে। কেতকী আলোকপাত করেন অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকেও। ভারতবর্ষের নিজস্ব ঐতিহ্য তাঁতের শাড়ি। নিজস্ব গৌরবকে ভুলে বিদেশী বহুমূল্য বস্ত্রে মজে থাকা ভারতের কথা বলেন 'ফিরিঙ্গি বণিকদের প্রেতাত্মাদের জবানবন্দি' কবিতায়। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে আরও ভয়ংকর সমস্যার চিত্র। সমুদ্রের জলে তেলের ভয়ানক প্রভাব, কবিতার নাম 'বার্তা'। এই কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কেতকীর পরিবেশের প্রতিও সংবেদী চিত্তের প্রতিভাস ফুটে ওঠে।

ঘ) গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

বিশ শতকের সাতের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি গীতা চট্টোপাধ্যায়। প্রচারবিমুখ মানুষটির কবিসত্তা সত্যিই বিরল প্রতিভামুখী। তিনি নিজের 'কবিতাসংগ্রহ' এর 'ভূর্জপত্রে' কবিতা সম্পর্কে বলেছেন– "আমার কাছে কিন্তু কবিতাই গোবিন্দ গোবিন্দই কবিতা। ভগবদ্ গীতার ভাষায় 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং / মন্যতে নাধিকং ততঃ'। যা পেলে আর কিছুই পাবার নেই আমার কাছে তা কবিতা।"[১৭]

১৯৭৫ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে লিখেছেন 'মনসার সর্পসজ্জা' কবিতাটি। যেখানে মনসার সর্পসাজের সঙ্গে কবিতার স্বরূপের মিল খোঁজেন। মনসা কশ্যপ মুনির মানসজাত, স্বয়ম্ভু, শিবদুহিতা, জরৎকারুর পত্নী, আস্তিকের মাতা। তার কণ্ঠমূলে সাপের সুতলি, শ্বেতনাগ পাহারা দেয়, কপালে অনন্তনাগের মুকুট, বেতনাগ নাভি বেষ্টন করে আছে, পায়ে মকরনাগ, মেরুদণ্ডে হেমন্তনাগ ইত্যাদি। দেবী মনসা বিষহরণ করে তাঁর অমৃতনেত্রে জগৎ কল্যাণ করেন। নিজস্ব গোপনকথা, দুঃখ, কষ্ট, লজ্জাগুলোই তো কবির অন্তর্লোকের জাদুকাঠির ছোঁয়ায়

মানসজাত গরলমুক্ত হয়ে আন্তরিক শুভবোধের উৎস, কবিতা হয়ে ওঠে। এই সর্পগুলি আসলে কেবল মনসার সাজ নয়, অন্তর্লোক বিশুদ্ধিকরণও ঘটে এদের দ্বারা। শব্দ থেকে রূপকল্প, সংকেত, ইমেজ, বোধের চারুতায় কবিতার জন্ম। মনসার সাজ শিল্পময় ও গুরুত্বপূর্ণ, কবিতাও শিল্প সমৃদ্ধ।

"দর্পণে নিজস্ব কথা, লজ্জা শঙ্কা গোপনতা, গরল উজাড় করে স্নেহে
হেসে ওঠে মনসার মতো শিল্পকারুকৃতি সেই সর্পভরণা কবিতা -
বিষনয়নের তীর যার বুকে বেঁধে, শব্দ-জর্জরিত সে-নষ্ট কবিকে,
বাঁচায় অমৃত-নেত্রে বিষতন্ত্রময়ী দেবী সর্বাত্মিকা প্রসারিণী দেহে।"[১৮]

কবিসত্তা কখনও বিপাশা নদীর তীরের গায়ক হয়ে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় খোঁজেন সেই নারী সত্তাকে। এই গায়ক 'বিস্মিত কুমারী', 'স্বতন্ত্র কুমারী', 'নিঃশব্দ কুমারী সত্তার প্রয়াসী। সন্ধ্যাই কুমারীর বেশে 'সন্ধ্যার সংগীত' রচনা করে যায়। প্রকৃতি ও নারী যেন এক অভিন্ন সত্তা। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘ। এরপর থেকে সারা পৃথিবীতে এই দিনটি পালিত হয় নারীর সমঅধিকার আদায়ের প্রত্যয়কে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে। সারা বিশ্ব যখন ১৯৭৫ সালটিকে সাড়ম্বরে পালন করছে, সেই বছরই কবি গীতা চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ' এর মতো কবিতা। তাঁর কবিতার নারী দিনের শেষে ভরাকলসি জল নিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত হলেও সেই চিহ্নকে গোপন করে আত্মঅনুরাগে, তার চোখে তখনও নতুন আলোক লাগেনি। সে তখনও 'পুরানো বাংলার মেয়ে' যার 'একদিন ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ'। কিংবা 'কর্তার ঘোড়া দেখে রাসসুন্দরী' কবিতায় উঠোনে কর্তার মহিমময় ঘোড়ার সামনে আসার সাহসটুকুও সঞ্চিত হয়নি তাঁর–

"নষ্ট মধ্যাহ্নের বেলা রাশি রাশি ধানে যায় ভেসে
কর্তার প্রতিভূ ঘোড়া আঙিনার দুয়ার আটকিয়ে
দাঁড়িয়েছে সব ঢেকে তেরোশো পাঁচের বাংলাদেশে।"[১৯]

রাসসুন্দরী দেবী প্রথম মহিলা যিনি আত্মজীবনী লেখেন 'আমার জীবন' নামে। বিশ্বের দরবারে নারীর অগ্রগতি হলেও বাংলার নারীর অবস্থানের খুব একটা অগ্রগতি হয়নি, তখনও পুরুষতন্ত্রের শক্তি তার দুয়ার আটকে দাঁড়িয়ে আছে, তার থেকে তখনও সে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

একটি অগ্রন্থিত কবিতা 'লিব্ আন্দোলনের বিপক্ষে ঈশ্বরের পদপ্রান্তে' কবিতায় পাই কবির মূল্যবান মন্তব্য। The Women's Liberation Movement (WLM) কেই লিব্ আন্দোলন বলা হয়, যা Radical Feminism এর অন্তর্গত, ১৯৬০ - ১৯৮০ পর্যন্ত চলেছিল। রাজনীতি, বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর সমমর্যাদার দাবীতে সোচ্চার হয়ে লিব্ আন্দোলনের জন্ম হয়। গীতা চট্টোপাধ্যায় ১১.১১.১৯৭১ সালে লিব্ আন্দোলনের বিপক্ষে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন জানান–

"নিজেকে কী তুমি ভাবো, নতজানু যখন পুরুষ
পদপ্রান্তে আত্মহারা এনে রাখতে চেয়েছে চুম্বন ?

তখন কি মহীয়সী দেবীর মতন আলৌকিক
চালচিত্রে বন্দী হলে মূর্তমহিমার আলম্বন ?

তখন কি করুণার দানপাত্র হাতে ধীরস্থির
অভিনয় করে গেছ দয়াবতী প্রাচীন রাজ্ঞীর ?"[২০]

আসলে কবি সমান মর্যাদার প্রত্যাশী। তাই 'নতজানু পুরুষ' বা 'অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মতো অহংকারী ' নারীসত্তার ও বিপক্ষে। নারী-পুরুষের পাশাপাশি অবস্থান ও যুগলবন্দিতেই সুন্দর সমাজের জন্ম - এই তাঁর গভীর প্রত্যাশা। জীবনের শেষ দিকের কবিতাগুলিতে আবার কবির সুরে খানিকটা বদল এসেছে। 'মনুসংহিতা'র ২/২১৩ শ্লোকটিতে আছে– 'স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্' অর্থাৎ 'ইহলোকে পুরুষকে দূষিত করাই নারীর স্বভাব'। চাঁদ অনেক কলঙ্ক মেখেও অপূর্ব নেশা লাগায়, কস্তুরী অপূর্ব গন্ধ দেয়। নারীকে দোষারোপ করে দূরে সরালে পড়ে থাকে 'শুধু এক বিষাদ বিজন' 'বুকভর্তি পরবাস'। নারী তার আপন স্বভাবে অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় ভরে দেয়। কবি এই শ্লোকটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এক পূর্ণতার দৃষ্টিতে। নারীর পিতৃতন্ত্র নির্দিষ্ট এই আপাত অপূর্ণতার পরেও তার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কাহিনিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 'বেহুলা জোয়ার' কবিতায়। কালনাগিনীর বিষে চাঁদ সদাগরের পুত্র এবং বেহুলার স্বামী লখিন্দরের মৃত্যু হয়েছে সাঁতালি পর্বতে। লখিন্দরের মৃতদেহকে কলার মান্দাসে নিয়ে ভেসে যায় বেহুলা, দেবতাদের মুগ্ধ করে প্রাণ ফিরে পায় স্বামীর। মনসামঙ্গলের এই কাহিনির নবব্যাখ্যা পাই এ কবিতায়। বিষজর্জরিত লখিন্দরের দেহটিকে কবি কল্পনা করেন 'শতাব্দীর সাপে কাটা দেহ' হিসাবে। ত্রিপূর্ণি, ভীষণ ক্ষারজলের নদী। বেহুলা লখিন্দরকে নিয়ে এই নদীর জলেই ভেসে গিয়েছিল। এই নদীপ্রবাহ হল সময়ের প্রবাহ আর শতাব্দীর ঘুণেধরা ক্ষত বিক্ষত দেহ হল মৃত লখিন্দর। বিশ্বাসহীনতা, সন্দেহ, আশঙ্কা প্রভৃতি ক্ষয়ীভূত মূল্যবোধে লাঞ্ছিত শতাব্দী, মৃতদেহের মতো। বেহুলা শত বাধা এড়িয়েও তার মান্দাস ভাসায় জীবনের প্রত্যাশায়। কবি এই বিশ্বাসকেই 'জোয়ার' বলেছেন। দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের ফলেই বেহুলা জীবন আনে মৃতদেহে। আমাদের হারানো বিশ্বাস আর প্রত্যয় ফিরে পেলে আবার জেগে উঠবে শতাব্দী। মনের মধ্যেকার বিকার দূর হলেই নতুন প্রত্যাশার জন্ম হবে।

এইভাবে ভিন্ন কবির ভাষায় উদ্ভাসিত হয়েছে নারীভাষার বিচিত্র অভিমুখ।

৩.

কবিতার শব্দ প্রত্যেক কবির কাছে পৃথকভাবে আসে। কবিতা সিংহ নিজে আত্মসমালোচনা করেছেন নিজের শব্দপ্রয়োগের জন্য, তিনি বলেন–

"বন্ধুরা, শত্রুরা, ভাইসব !
আপনারা আমাকে কেউ দয়া করে নিহত করুন।
কারণ শব্দের সেই অক্ষর মন্দির আমি ম্লেচ্ছ করেছি।"[২১]

কবিতায় রূঢ় শব্দ প্রয়োগের জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী।
নবনীতা দেবসেনের কাছে শব্দ অভিমানী, তিনি বলেন -

"শব্দেরা দাঁড়িয়ে থাকে
ঠিক যেন আকাশের গায়ে

সূর্যাস্তের অসম্ভব বর্ণাঢ্য বিনয়
অসংলগ্ন, অধরা, একাকী -"[২২]

তাঁর কাছে কবিতার ভাষা 'স্বাগত দেবদূতে'র মতো, বেশি মনোযোগ চায়। কেতকী কুশারী ডাইসন বলছেন তাঁর কাছে নিজের লেখাগুলি মিশ্র অনুভূতির ফসল–

"..... ঐ দ্যাখো, মিশে যাচ্ছে
জলে জল, শব্দের সমুদ্রে
তোমার কথা, আমার কথা,
তোমার কবিতা, আমার কবিতা,
আমাদের ভালোবাসারা।"[২৩]

বিভিন্ন কবির ভাবনা মিশে গিয়ে তাঁর কবিতার ভাষা এক অনন্ত 'শব্দসমুদ্র' তৈরি করে। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এই ভাষা একদম ভিন্নভাবে আসে। তিনি বলেন–

"নরম নক্ষত্র নামে স্বর্গ থেকে আত্মার মতন
বইয়ের মলাট থেকে শব্দ রেশমি ঝালরে লুটোয়
জন্মশিরে টইটুম্বুর দশ-দশটা আলতাগোলা বাটি
কবিতা লেখার আগে শব্দ করে কবিকে চুম্বন।"[২৪]

অন্তর্লোক বিধৌত করে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ আত্মার মতন তাঁর কাছে শব্দ আসে।

অর্থাৎ একটি বিষয় - কবিতার শব্দ, পৃথক চারজন কবির কাছে কিভাবে সেই শব্দ আসে ও ব্যবহৃত হয় সেকথা রইল। নারীভাষার মধ্যে নারীর নিজের কথা থাকলেও তা বহুমাত্রায় ব্যবহৃত হয় এবং সমৃদ্ধ এক ভাষা পরিসর নির্মাণ করে।

উপসংহার

১৯৭৫ সালে Hélène Cixous, 'Écriture féminine' (women's writing) এর কথা বলেছেন। ১৯৭৯ সালে Elaine Showalter 'Gynocriticism' (Study of Women's writing) এর কথা বলেছেন। এর অনেক আগেই বাংলা কবিতায় নারীর নিজস্ব ভাষাপথ রচনার পর্ব শুরু হয়েছিল। কারও ভাষার তীব্রতা বেশি, কারও ভাষার অন্তর্লীন সুরে বাজে রাগিণী, কেউ বা সরলভাষায় বুনে যান বিশ্বের জলছবি, কেউ বা প্রজ্ঞায় সম্পৃক্ত করেন তাঁর কবিতার ভাষাকে। আবার ভাবনার বহিঃপ্রকাশেও আছে বিচিত্র বিচ্ছুরণ। সব মিলিয়েই সমৃদ্ধ এই নারীভাষার ভাণ্ডার। নির্বাচিত চারজন কবির কবিতার মধ্য দিয়ে এই ভাষার অতিসংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হল। একাধিক কবি অনালোচিত থাকল এখানে। এই পথটি সুবিস্তৃত হচ্ছে ক্রমাগত, যা আগামী দিনের আলোচ্য হতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. Sukumar Sen, *Women's Dialect In Bengali, Calcutta University* 1928, JIJNASA Publishing Department, Calcutta - 700009, P. 1r

২. Robin Tolmach Lakoff, *Language And Woman's Place (Text and commentaries)*, Mary Bucholtz (Edited by), 2004, Oxford University Press, New York - 10016, P.39,40

৩. কবিতা সিংহ, 'না', *কবিতাসংগ্রহ ১*, সুমিতকুমার বড়ুয়া (সম্পাদনা), নভেম্বর ২০১৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৫১

৪. প্রাগুক্ত, 'সম্রাজ্ঞী', পৃ. ৬৫

৫. প্রাগুক্ত, 'জ্বলন্ত রমণী চলে যায়', পৃ. ৯৭

৬. প্রাগুক্ত, 'আমি ত কবেই চলে গেছি', পৃ. ৯৩

৭. প্রাগুক্ত, 'স্বয়ংক্রিয়', পৃ. ৮৫

৮. প্রাগুক্ত, 'এস্টাব্লিশমেন্ট', পৃ. ১২৬

৯. নবনীতা দেবসেন, 'পুষ্পিত প্রহার', *নবনীতা দেবসেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ষষ্ঠ সংস্করণ - অগ্রহায়ণ ১৪২৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৪২

১০. প্রাগুক্ত, 'নাজমা', পৃ. ১৬৭

১১. প্রাগুক্ত, 'ধর্ষণরাত্রির স্মৃতি', পৃ. ১৭৭

১২. কেতকী কুশারী ডাইসন, 'পিছুটান', *কবিতাসমগ্র ১*, প্রথম সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ২০১৫, সিগনেট প্রেস, কলকাতা - ০৯, পৃ. ৩

১৩. প্রাগুক্ত, 'নালন্দার পথে', পৃ. ১২৫

১৪. প্রাগুক্ত, 'ঘর', পৃ. ১১৩

১৫. প্রাগুক্ত, 'একটি খবর পড়ে', পৃ. ২৪৩

১৬. প্রাগুক্ত, 'ঈভের বিলাপ', পৃ. ২৭৬

১৭. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *কবিতাসংগ্রহ*, জানুয়ারি ২০১৬, আদম, নদীয়া - ৭৪১১০১, পৃ. ভূর্জপত্র

১৮. প্রাগুক্ত, 'মনসার সর্পসজ্জা', পৃ. ১৫৭

১৯. প্রাগুক্ত, 'কর্তার ঘোড়া দেখে রাসসুন্দরী', পৃ. ১৬০

২০. প্রাগুক্ত, 'লিব্ আন্দোলনের বিপক্ষে ঈশ্বরের পদপ্রান্তে', পৃ. ৩১২

২১. কবিতা সিংহ, 'অসমাপ্ত কবিতা', *কবিতাসংগ্রহ ১*, সুমিতকুমার বড়ুয়া (সম্পাদনা), নভেম্বর ২০১৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৮১

২২. নবনীতা দেবসেন, 'হায় শব্দ', *নবনীতা দেবসেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ষষ্ঠ সংস্করণ - অগ্রহায়ণ ১৪২৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৫১

২৩. কেতকী কুশারী ডাইসন, 'একেকসময়', *কবিতাসমগ্র ১*, প্রথম সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ২০১৫, সিগনেট প্রেস, কলকাতা - ০৯, পৃ. ২১০

২৪. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'কবিকে তখন শব্দ', *কবিতাসংগ্রহ*, জানুয়ারি ২০১৬, আদম, নদীয়া - ৭৪১১০১, পৃ. ২০১

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 21-29

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস বিতর্ক

ড. সুদেষ্ণা বণিক

সারসংক্ষেপ

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাসের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য-পূর্ববর্তী সময় থেকেই রাধাকৃষ্ণের লীলা সংক্রান্ত পদ রচনায় ও এই সমস্ত পদে প্রেম ও ভক্তির সংমিশ্রণে দিব্যভাবের প্রকাশ ঘটানোয় চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব অতুলনীয়। স্বকীয় কাব্য প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে চণ্ডীদাস বাংলা পদাবলী সাহিত্যে ও আপামর বাঙালি মানসে এক অনন্যসাধারণ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। চণ্ডীদাসের পদাবলী স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকেও অপার্থিব আনন্দে আপ্লুত করত। তাই পদাবলী সাহিত্যের এই মহান স্রষ্টা যুগের পর যুগ ব্যাপী বাঙালি সুধী সমাজের আলোচ্য ব্যক্তি ও জনমানসের হৃদয়ের কবি হিসেবে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

তবে বৈষ্ণব সাহিত্যে এই 'চণ্ডীদাস' নামের অন্তরালে একাধিক বা বহু ব্যক্তির অস্তিত্ব বর্তমান। প্রাক্ চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে 'চণ্ডীদাস' নামের একাধিক কবি থাকায় পদাবলী সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা দুষ্কর। যদিও চৈতন্যোত্তর কালের 'চণ্ডীদাস' নামধারী কবিরা কেউ 'দীন', কেউ 'সহজিয়া' উপাধি ব্যবহার করেছেন বলে তাঁদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু মূল সমস্যা হল প্রাক্ চৈতন্য যুগের চণ্ডীদাস, যিনি তাঁর রচনাশৈলী দ্বারা মহাপ্রভুকেও ভাবাবেশে আচ্ছন্ন করতেন, তাঁর পরিচয় উদ্ধার করে তাঁকে চিহ্নিত করা। আলোচ্য গবেষণা পত্রের মূল উদ্দেশ্য হল বৈষ্ণব পদাবলীর সর্বাধিক সম্মানিত ও আদৃত পদকার চণ্ডীদাস সম্পর্কে পূর্বাপর গবেষণা ও আলোচনার নিরিখে একটি সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

ড. সুদেষ্ণা বণিক
পিএইচডি (কণ্ঠসঙ্গীত, কীর্তন)
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: banik_sudeshna13@.yahoo.com

মূলশব্দ

কীর্তন, পদাবলী, মহাজন, পদকর্তা

ভূমিকা

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ পদ রচয়িতাদের বলা হয় মহাজন। যেকোনো পদ রচনায় উদ্দিষ্ট তথা প্রধান বিষয় যদি হন ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীমতি রাধারানী অথবা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, তবে অন্য প্রধান

ব্যক্তি হলেন স্বয়ং পদকর্তা তথা মহাজন যিনি ভণিতায় অর্থাৎ পদের শেষাংশে নিজের নামটি উল্লেখ করেন। আজও পদাবলী কীর্তন পরিবেশনকালে পদকর্তার নামোচ্চারণের সময় গায়ক ও বাদকগণ মাথা নত করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে কয়েকজন পদকর্তা তথা মহাজনকে বিশেষ মান্যতা দেয়া হয়। এর প্রধান কারণ তাঁদের অবিস্মরণীয় রচনাশৈলী, অপার্থিব ভক্তিভাব, অপূর্ব শব্দচয়ন ও ইষ্টের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ ইত্যাদি। আরও একটি বিষয় এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে থাকে, আর সেটি হল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেগ। এটি বিশেষত চৈতন্য পূর্ববর্তী মহাজনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর এই প্রসঙ্গে যাঁদের নাম উল্লেখ্য তাঁরা হলেন কবি জয়দেব গোস্বামী, বিদ্যাপতি ঠাকুর এবং চণ্ডীদাস। আমাদের বর্তমান গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেন এই চণ্ডীদাস যাঁর পদ শ্রবণ করে মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন।

পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণামূলক প্রবন্ধে পূর্বতন গবেষণা গ্রন্থসমূহ থেকে বিভিন্ন মতবাদ বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে একটি নতুন মত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। এখানে মূলত বর্ণনামূলক পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে।

বিশ্লেষণ

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখা মানুষ মাত্রেই জানেন যে এখানে পদকর্তা চণ্ডীদাস বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আবার আমরা এটাও জানি যে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এই 'চণ্ডীদাস' নামে একাধিক বা বহু ব্যক্তি রয়েছেন। তবে চৈতন্যোত্তর যুগে 'চণ্ডীদাস' নামধারী কবিরা নিজেদের নামের পূর্বে বিভিন্ন উপাধি ব্যবহার করেছেন বলে তাঁদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু মূল সমস্যা হয় প্রাক্ চৈতন্য যুগের চণ্ডীদাসকে নিয়ে যিনি তাঁর রচনার মাধুর্যে মহাপ্রভুকে ভাবাবেগে আচ্ছন্ন করতেন। এই চণ্ডীদাস এক ছিলেন না একাধিক ব্যক্তি, সেটা নিরূপণ করাই আমাদের বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য।

যদিও এই বিষয়ে বিশিষ্ট গুণীরা তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন আপন আপন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে, তবুও প্রামাণ্য অভাবহেতু তাঁরা কেউই সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। আমরা সেইসব মতবাদের একটা সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করে ও বিভিন্ন ঘটনার সম্ভাবনার দিক তুলে ধরে এই সমস্যার এক সাধারণ যুক্তিনির্ভর আনুমানিক সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

চণ্ডীদাস রচিত পদসমূহ সম্পর্কে বিশিষ্ট বাংলা ভাষাবিদ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড)' গ্রন্থে বলেছেন, "...চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙালির কাছে পরম ভক্তি, আরাম ও আনন্দময় শিল্পরসে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদে বাঙালি বিস্মিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে সে মনের প্রশান্তি, স্নিগ্ধতা ও আত্মনিবেদনের একনিষ্ঠতা খুঁজিয়া পাইয়াছে; চণ্ডীদাসের পদাবলী তাই শুধু পদাবলী মাত্র নহে, সারস্বত বৈশিষ্ট্যই ইহার একমাত্র ফলশ্রুতি নহে...।"[১] বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক শ্রী দীনেশচন্দ্রের

একটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন, "চণ্ডীদাসের ভাবসম্মেলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়। ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধহয় অন্যায় হইবে না। সেগুলির মতো প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্মপুস্তকেও বিরল।"[২] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরেক পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি'-তে বলেছেন, "চণ্ডীদাস কবিতাপস। এত অনাবরণ, অনির্বাণ, আত্মবান কবি আর কে?.....এত শান্ত, সুস্থির, শিশিরবিন্দুর সুকুমারতায় স্নিগ্ধ পদকার আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। চণ্ডীদাসের পদে করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ার অমর প্রেমের দীপশিখা।"[৩]

চণ্ডীদাস সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের মহাজ্ঞানী গবেষকদের এমন আলোচনা তথা বিশ্লেষণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে বাংলা পদাবলী সাহিত্যে তাঁর গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটা। তাই তো যুগের পর যুগ ধরে চণ্ডীদাস সম্পর্কে পাঠককুলের প্রচণ্ড কৌতূহল বিদ্যমান। এই মহান কবির প্রকৃত জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে তাঁকে নিয়ে অজস্র কল্পকাহিনী ও গল্পগাথা গড়ে উঠেছে। 'চণ্ডীদাস' নামের মাহাত্ম্যে প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীতে তাঁরই মত মহত্ত্ব ও অমরত্ব অর্জনের লক্ষ্যে বহু কবি এই নাম ধারণ করে বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। ফলে বিভিন্ন পদাবলীর ভণিতা তথা শেষাংশে বড়ু, দ্বিজ, দীন ইত্যাদি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। একইভাবে তাঁর জীবন কাহিনীর ক্ষেত্রেও বহু কথিত তথা কল্পিত ঘটনার এমন মিশ্রণ ঘটেছে যে এর থেকে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব।

চণ্ডীদাসের পদাবলী আপামর বঙ্গ সমাজে এতটাই জনপ্রিয় যে তাঁর সম্পর্কে সমালোচকদের মুগ্ধতাও অবিসংবাদিত। কিন্তু এই মুগ্ধতা হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয় যখন ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) বনবিষ্ণুপুরের নিকটস্থ কাঁকিল্যা নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস রচিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। এই পুঁথির আবিষ্কর্তা শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মহাপণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। তিনি এবং প্রসিদ্ধ লিপিতত্ত্ব বিশারদ ও ঐতিহাসিক শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় উক্ত পুঁথির লিপি বিচার ও বিশ্লেষণ করে একে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন বলে মত প্রকাশ করেন। এই মতের ভিত্তিতেই তাঁরা উল্লিখিত গ্রন্থের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসকেই আদিতম চণ্ডীদাস বলে স্বীকৃতি দেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পূর্বোক্ত গ্রন্থটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম নিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। আর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই পাঠক ও বোদ্ধামহলে তীব্র বিস্ময় ও বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। কারণ এই গ্রন্থের ভাব ও ভাষা পূর্ব-প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর প্রায় বিপরীত। এই প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "...বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্বে আবির্ভূত হইয়া ভাগবত অবলম্বনে প্রচুর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বসহ রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক এক বিরাট আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই লীলার বিন্যাস ও পর্যায় মোটামুটি পুরাণ-অনুসারী; কবি 'গীতগোবিন্দে'র দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং কোনো কোনো স্থলে স্থানীয় লোকসংস্কারকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। অলংকারশাস্ত্র, পৌরাণিক কাহিনী, সংস্কৃত ভাষা ইত্যাদিতে তাঁহার সবিশেষ নিপুণতা ছিল। অবশ্য তাঁহার রুচি আধুনিককালের পাঠকের প্রীতিকর হইবে না। বিশেষত যাঁহারা পদাবলীর চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের ভাবরসে অভিষিক্ত, তাঁহারা এই কাব্যে

জুগুপ্সা ও রসাভাস লক্ষ্য করিয়া বিষণ্ন হইবেন। সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষণী'র টীকায় "শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ" উক্তিতে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডকে নির্দেশ করা হইয়াছে কিনা সুদৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে তাহা বলা যায় না। চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের এই আখ্যানকাব্য আস্বাদন করিতেন, অথবা করিতেন না, তাহাও জোর করিয়া বলা মুশকিল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের কিছু কিছু পদে প্রাণঢালা বেদনার সুর যে নাই, তাহা নহে...সে সমস্ত পদে চৈতন্যদেবের বিরহতাপিত চিত্ত কথঞ্চিত শান্তিলাভ করিতে পারিত। কিন্তু কাব্যপরিকল্পনায়, কৃষ্ণচরিত্রাঙ্কনে ও বৃন্দাবনখণ্ডের পূর্ববর্তী খণ্ডসমূহে কাহ্ন ও রাধাচন্দ্রাবলীর ব্যবহার, উক্তি ও আচরণে সংগতি রক্ষিত হয় নাই, অলংকারশাস্ত্রমতে এই সমস্ত বর্ণনার অনেক স্থলেই রসের ব্যতিক্রম হইয়াছে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যাইতেছে যে, রসাভাসযুক্ত কাব্য শুনিলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন। এইজন্য মহাপ্রভুকে কোনো রচনা শুনাইবার পূর্বে স্বরূপ-দামোদর তাহা পাঠ করিয়া দেখিতেন, তাহাতে কোনও প্রকার রসের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে কিনা। চৈতন্যদেবের মনোভাব বিচার করিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত রাধার প্রতি কৃষ্ণের বলপ্রকাশ এবং স্থূল দেহাসক্তির অমার্জিত বর্ণনায় মহাপ্রভুর বিরহলীন চিত্তের প্রদাহ বাড়িত বৈ কমতো না। বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা ও বাকরীতির মধ্যে একটা বলিষ্ঠ, স্থূল ও অমার্জিত স্বাভাবিক গ্রাম্যতা আছে, যাহার বিচিত্র রস বিস্ময়কর, শিল্পকৌশলও নিন্দনীয় নহে; কিন্তু ঠিক এই উদ্দাম দেহসম্ভোগজনিত অনাবৃত আকাঙ্ক্ষার উত্তপ্ত ফেনোচ্ছ্বাস মহাপ্রভু কতটা সহিতে পারিতেন, তাহাও চিন্তার বিষয়।"[৪]

আবার পূর্বেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠা চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "ইহার ভাব ও ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে সাত্ত্বিক প্রেম আছে, মদনজ্বালা নাই।"[৫]

কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনার মতই এর স্বপক্ষ-সমালোচনাও বিরল নয়। মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আদিতম নিদর্শন হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা ও বাচনভঙ্গির স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন একাধিক জ্ঞানীজন। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কীর্তন বিশেষজ্ঞ ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অগ্রগণ্য। তিনি সর্বাগ্রে অধিকারভেদের প্রশ্ন তুলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমস্তরকম বিরুদ্ধ সমালোচনাকে নস্যাৎ করেছেন। উপরন্তু তিনি তাঁর 'বীরভূমি বিবরণ' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাস পদাবলীর পদসমূহকে তুলনা করে দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রমাণ করেছেন এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন পদই সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়ে প্রচলিত ও জনপ্রিয় চণ্ডীদাস-পদাবলীতে রূপান্তরিত হয়েছে। অতএব, মহাপ্রভু ভাবোন্মাদ অবস্থায় এই বড়ু চণ্ডীদাসের পদ শ্রবণেই শান্তি পেতেন।

মধ্যযুগের ভাষা ও সাহিত্যরীতির নিরিখে এই কথা অনায়াসে বলা যায় যে সেইসময় সংস্কৃত সাহিত্যে আদিরসের সহজ ও সাবলীল বর্ণনাই ছিল প্রচলিত রীতি। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে যে কোনো আদি রসাত্মক বর্ণনাই আমাদের কাছে দূষণীয় মনে হলেও সেই যুগে এ বিষয়ে কবি, পাঠক ও সমালোচকেরা উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এর কারণ বোধহয় যুগভেদে ও স্থানভেদে জনরুচির বিবর্তন। ঠিক এই কারণেই মধ্যযুগের 'কবিসার্বভৌম'[৬] বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ সূচক পদসমূহ তাঁর নিজ রাজ্য মিথিলায় অবহেলিত ও

অনাদৃত হয়েছিল নিছক শৃঙ্গার রসাত্মক পদ বা গান হিসেবে। অথচ বাঙালি বৈষ্ণব ভক্ত ও মহাজনেরা সেইসব পদ নিজেদের হৃদয়ের মণিকোঠায় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। আবার আদি রসাত্মক কাব্যের নিরিখে বিচার করতে গেলে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-ও সে দোষ থেকে মুক্ত নয়। অথচ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতির পদসমূহে ও গীতগোবিন্দের পদে বিশুদ্ধ ভক্তি ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ খুঁজে পেয়েছেন। তাই 'অশ্লীল আদি রসের ভাঁড়ারি' বলে শুধুমাত্র বড়ু চণ্ডীদাসকেই আখ্যায়িত করা বা তাঁকে ব্রাত্য করা বোধহয় খুব একটা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সংগীত গবেষক শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন, "শৃঙ্গারবহুল গীতগোবিন্দ শৃঙ্গাররসকে অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠতর রসলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মানব-হৃদয়ের চিরন্তন দুঃখ এবং চিরন্তন প্রাপ্তি এই দুটিকেই উদ্ঘাটিত করে প্রেমের একটা শাশ্বত রূপকে তুলে ধরেছেন। এতখানি আত্মসম্বরণ, এতখানি আত্মসমর্পণ, এত আনন্দ, এত দুঃখ- কোনোটাই গীতগোবিন্দের পরিকল্পনায় নেই। জয়দেবের পরিকল্পনায় ছিল সম্পূর্ণ সম্ভোগ আর বড়ু চণ্ডীদাসের পরিকল্পনায় ছিল সম্ভোগকে অতিক্রম করে আরও বড়ো পাওয়ার আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি বিরহ-খণ্ডের অবতারণা করেছেন। তথাপি গীতগোবিন্দ পরমসমাদরে শত শত বৎসর ধরে গীত হয়ে আসছে আর বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে।..... স্বয়ং শ্রীচৈতন্য জয়দেবকে প্রচার করে গেছেন সমগ্র দক্ষিণ ভারতে। কিন্ত প্রাদেশিক ভাষায় রচিত একজন গ্রাম্য কবির কাব্য এতটা পৃষ্ঠপোষকত্বের দাবি করতে পারে না এবং বাংলা ভাষায় এতটা কোমলকান্ত পদাবলীর সৃষ্টিও তিনি করতে পারেননি- বোধহয়, করা সম্ভবও ছিল না। এই কারণেই হয়তো সংস্কৃতের অনুরাগী শ্রীচৈতন্য ছন্দোবদ্ধ পদাবলী ছেড়ে বাংলা এই কাব্যটির প্রতি আকৃষ্ট হননি; হলে হয়তো গীতগোবিন্দের মতো এই গীতগাথাটিও স্মরণীয় হয়ে থাকত।"[৭] তবে একই সাথে তিনি এই আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন যে, এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটি হয়তো মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছয়নি। অর্থাৎ চৈতন্য-জীবনীকাব্যকে সঠিক বলে ধরলে চৈতন্য-পূর্ববর্তী আরো একজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। বহু জ্ঞানীজন মহাপ্রভুর প্রিয় চণ্ডীদাস পদাবলীর প্রসঙ্গে আর একজন চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাসের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন 'আদি চণ্ডীদাস' তথা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামে।

আবার ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়েছেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, শ্রী দীনেশচন্দ্র, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু, শ্রী বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রী নীলরতন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জ্ঞানীজন। এঁরা অধিকাংশই একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ঠিকই কিন্তু প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসকেই এক এবং অদ্বিতীয় বলে মেনেছেন। এর কারণ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে' ও 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুনঁতো বসী'৮, এই দুটি পদের সাথে 'রাধাবিরহ' পর্বের চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদের সাদৃশ্যকে দায়ী করা যায়। শুধু তাই নয়, সনাতন গোস্বামী বিরচিত 'বৈষ্ণবতোষণী'র টীকায় উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'দানখণ্ড' ও 'নৌকাখণ্ডের' উল্লেখও- 'শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।'[৯] তাঁদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে। "তাছাড়া, বড়ু চণ্ডীদাসের রচনারীতি যে চৈতন্য-পূর্ব যুগের ভাবধারাকেই সমর্থন করে, সেটাও বোধহয় একটা কারণ।"[১০]

শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের মত এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, "কৃষ্ণকীর্তনের আগেও জানা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাসের

নাম অনন্ত, তিনি 'বড়ু' উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং বাশুলী দেবীর আজ্ঞায় পদ রচনা করিতেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদেই বহু পূর্বে তাঁহার অনন্ত নাম পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার 'বড়ু' উপাধি ও বাশুলীর আদেশ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের সকলেই অবশ্য জ্ঞাত আছেন। সুতরাং কবি চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা যে একই অভিন্ন ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই।"[১১] আবার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন, "চণ্ডীদাস কি দুইজন ছিলেন? দুইজনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু? তাহা তো হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন বাঙলা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে।... আমার মতে কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস তাহা অস্বীকারের হেতু নাই, সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল। সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে একালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।"[১২]

ড হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংকলন'-এর ভূমিকায় লিখেছেন,

"আমরা এপর্যন্ত দুইজন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। একজন শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস, অন্যজন শ্রীচৈতন্য পরবর্তী দীন চণ্ডীদাস। একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই এই দুইজন কবির পদ পৃথক করা যায়। কিন্তু বড়ু ও দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন, 'চণ্ডীদাস' এই নামের অন্তরালে যে অন্য কবিদের পদ চলিতেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলিকে চিনিয়া লওয়া একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভাব ও রূপের পরিবর্তনে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, এমন পদেরও অভাব নেই। এই সমস্ত বিষয় আলোচনাপূর্বক আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ যথাসম্ভব পৃথকরূপে চিহ্নিত করিয়াছি।... বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানিকে আমরা প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া মনে করি। এইজন্য চণ্ডীদাস পদাবলীর উপযুক্ত শ্রেণীবিভাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকেই কষ্টিপাথর রূপে গ্রহণ করিয়াছি।"[১৩]

কিন্তু একথাও সত্যি যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে বাঙালি বৈষ্ণব সমাজে ভক্তিবাদের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। জয়দেব গোস্বামী কৃত 'গীতগোবিন্দ'-এর পূর্বে বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ লীলার কোনো লিখিত নিদর্শন নেই। এই প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য, "আমি আগেও বলেছি, এখনও এই মতে দৃঢ় আস্থাশীল যে, বিবাহ-সম্পর্ক-বহির্ভূত রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়লীলা (যেখানে রাধাকে কৃষ্ণের মাতুলানী বলা হয়েছে, সেই tradition এখনও চলেছে) প্রাকৃত চেতনা ও প্রাকৃত-কাব্যসাহিত্য থেকে অর্বাচীন পুরাণে প্রবেশ করেছে। তবে বাংলাদেশে যেসমস্ত পুরাতন লেখন ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে শুধু এইটুকু অনুমান করা যেতে পারে, খ্রীঃ ৭ম-৮ম শতাব্দী থেকে পূর্বভারতে পুরাণে ও লোকসাহিত্যে কৃষ্ণলীলা সুপরিচিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিষ্ণু-লক্ষ্মী সংক্রান্ত কাব্যকাহিনী লোককল্পনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, বরং ক্রমে ক্রমে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা জনচিত্তকে গ্রাস করে। তবে এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে, জয়দেব প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার কবিরাও রাধাঠাকুরানীর প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। মুসলমান অভিযানের প্রথম যুগ (১৩শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে) থেকে ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত

গৌড়ে রাধাকৃষ্ণ-লীলা ঠিক কোন্ রীতি গ্রহণ করেছিল, তার জন্য প্রধানত মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রহণ করতে হবে। তবে শ্রীচৈতন্যের পূর্বে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সমাজে বিষ্ণু-লক্ষ্মী ও কৃষ্ণ-গোপীলীলার কথা এবং নিম্নতর সমাজে রাধাকৃষ্ণের গোপপল্লীর অনাবৃত অসংযত কামরঙ্গ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।... বিদ্যাপতির গান ও বড়ু চণ্ডীদাসের আখ্যানকাব্যে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে, অবশ্য কৃষ্ণের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছেন রাসরাসেশ্বরী শ্রীরাধা। সুতরাং একথা মনে করা যেতে পারে ১৫শ শতাব্দীর আগে থেকেই বাংলা গান ও কাব্যকাহিনীতে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে।"[১৪] কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব এইসমস্ত কৃষ্ণলীলা বা রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত কাব্যকাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেন। তাঁর প্রভাবেই রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক প্রণয়লীলা ভক্ত-ভগবানের লীলায় পর্যবসিত হয়। তাই চৈতন্য-সমসাময়িক কবি ও মহাজনেরা ও পরবর্তীতে চৈতন্যোত্তর ভক্ত-কবিরা রাধাকৃষ্ণ লীলাকে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির রসে সিক্ত করে তোলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি অন্যতম পার্থক্য হল, পাশ্চাত্য সভ্যতা লেখনী নির্ভর, আর ভারতীয় সভ্যতা শ্রুতি নির্ভর। এইজন্যই পাশ্চাত্য সমাজ, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির একটি লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় যার ফলে ওদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও পরিমার্জনের একটা স্পষ্ট চিত্রের দেখা মেলে। কিন্তু ভারতীয় সমাজে সেই বৈদিক যুগ থেকেই শ্রুতি-নির্ভরতা তথা গুরু-শিষ্য পরম্পরা প্রচলিত বলে এখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইতিহাস অনুপস্থিত। এই কারণেই অধিকাংশ ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনকাল ও কর্মকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট সময় ও পারম্পর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমান-নির্ভর বর্ণনার ওপর ভরসা করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, মুঘল সম্রাট আকবরের সভার অন্যতম নবরত্ন তানসেনের সঙ্গে প্রসিদ্ধ সংগীত গুণী বৈজু বাওরার যে কথিত সাংগীতিক লড়াইয়ের কথা প্রচলিত আছে, তার প্রামাণিকতা নিয়েই সন্দেহের অবকাশ বর্তমান। কারণ, ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনা বিশ্লেষণে বৈজুবাওরা ও তানসেনের বয়সের যে পার্থক্য যুক্তিসঙ্গত বলে মানা যায়, তাতে এই দুই মহাজ্ঞানী সংগীতজ্ঞের মুখোমুখি হওয়া এক কথায় অসম্ভব। অথচ যুগ যুগ ধরে লোকমুখে প্রচলিত হওয়ার ফলে এই কাহিনী অতিশ্রুত এবং অধিকাংশ মানুষের আস্থাভাজন। একইভাবে ভারতীয় ইতিহাস খুঁজলে এমন আরও অনেক অসঙ্গতি ও অবিশ্বাস্য ঘটনা পাওয়া যাবে যা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের প্রামাণ্য-অভাবহেতু অযৌক্তিক অথচ বহুশ্রুত ও প্রচলিত।

চণ্ডীদাস সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথেও প্রধান অন্তরায় এই প্রামাণ্য-অভাব। চণ্ডীদাস নামের আড়ালে যেসব কবিরা বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন তাঁদের কারো ক্ষেত্রেই দিন-কাল-সময়ের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রেও তাঁরা বিস্তারিত কোনো বিবরণ দেননি। তাই, দ্বিজ-আদি-বড়ু-দীন-সহজিয়া প্রভৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ইতিহাস সংরক্ষণে বাঙালির চির উদাসীনতাই এই মহান পদকর্তার মূল পরিচয় বা তাঁর কাজের সাযুজ্য রক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' অনুযায়ী মহাপ্রভু রসাভাসযুক্ত কাব্য প্রবলভাবে অপছন্দ করতেন এবং একাধিক জ্ঞানী ব্যক্তির মতানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পরিকল্পনায়, কৃষ্ণ-চরিত্র সৃজনে এবং বৃন্দাবন খণ্ডের আগের

খণ্ডগুলোতে রাধা-কৃষ্ণের উক্তি, আচরণ ও ব্যবহারে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় যা অলংকার শাস্ত্রানুসারে রসাভাসের নামান্তর। তবে মহাপ্রভুকে কোনো রচনা শোনানোর আগে যেহেতু তাঁর ঘনিষ্ঠ পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর তা পড়ে দেখতেন, তাই এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে তাঁরা মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রসাভাসযুক্ত পদসমূহ বাদ দিয়ে শুধু বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের প্রাণঢালা বেদনার সুরযুক্ত পদসমূহই শুনিয়েছেন যা মহাপ্রভুর বিরহকাতর চিত্তকে শান্ত করেছে।

আবার শাক্তসাধক ও কবি কমলাকান্তের রচিত গীতসমূহ ও পদাবলী প্রসঙ্গে আমরা জানতে পারি যে কবির রচিত মূল কবিতা ও গান মুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণের সময়ে সংগ্রাহক ও সম্পাদক কর্তৃক বারবার পরিমার্জিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "……সুতরাং প্রচলিত মুদ্রিত পদাবলীতে যে মূল কমলাকান্তীয় ভাষার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কমলাকান্তের পদাবলীর ভাষা রামপ্রসাদ অপেক্ষা মার্জিত, তাহার একটা কারণ- পদাবলীর সম্পাদকের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পাঠসংস্কার বা পরিবর্তন।"[১৫] অতএব এই অনুমানও হয়তো নিতান্তই অযৌক্তিক নয় যে চণ্ডীদাসের পদাবলীও পরবর্তীতে সংগ্রাহক তথা লিপিকরদের দ্বারা পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছিল যা আপামর বাঙালি জনমানসকে ভক্তিস্রোতে প্লাবিত করেছিল।

যদিও চণ্ডীদাস সমস্যা বহু প্রাচীন এবং অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী এই গ্রন্থীর জট ছাড়াতে চেষ্টা করেও সম্পূর্ণভাবে সফল হননি। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা মধ্যপন্থার অবলম্বন করে চৈতন্য-পূর্ববর্তী দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু যথাযথ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাস বলে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারকে স্বীকৃতি দিলেও বোধহয় তা অযৌক্তিক হবে না।

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ৩৮৬

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯৭

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪০০

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ২৭৫

৭. বাংলার সংগীত (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)- শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র, সম্পাদনা ড. প্রদীপকুমার ঘোষ, বাংলা সংগীত মেলা কমিটি, কোল- ২০, ২০০৬, পৃষ্ঠা ৭৭

৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ২০০৬-০৭, পৃ. ৩৯৯

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

১০. সঙ্গীতে বাংলা কীর্তনের প্রয়োগরীতি: দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গান, সুদেষ্ণা বণিক, নক্ষত্র প্রকাশন, এ-১৫, নেতাজী সমবায় আবাস, নারায়ণতলা (প:), প্রফুল্লকানন, কলকাতা- ১০১, ২৬ জানুয়ারী, ২০১৫, পৃ. ৮০

১১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ২০০৬-০৭, পৃ. ৩৯৫

১২. পূর্বোক্ত

১৩. পূর্বোক্ত

১৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ২১৭-২১৮

১৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ: ২০০৯-১০, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 30-38

অমর মিত্রের ধুলোগ্রাম : বাস্তুহীনের বিকল্প 'জামতলি'

শ্রাবন্তী মজুমদার

শ্রাবন্তী মজুমদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: shrabanmegh@gmail.com

সারসংক্ষেপ

স্মৃতি এবং পুনর্বাসনের মধ্যে দিয়ে যে সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল অমর মিত্র মূলত সেই ধারার লেখক। ছেড়ে যাওয়া প্রতিবেশী-পরিজনের কষ্ট, অবদমিত আবেগ ও ছিন্নমূল হওয়ার বেদনায় লেখা স্মৃতিকথা দিয়েই পার্টিশন সাহিত্যের সূচনা। অমর মিত্র মূলত এই ধারারই লেখক। তাঁর কাছে দেশভাগ মানেই সব শেষ হয়ে যাওয়া নয় বরং দেশভাগের ৭৪ বছর পেরিয়ে এসেও এই আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কেন না এটা প্রমাণিত যে ১৯৪৭ সালেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি, তিনটি প্রজন্মের পরেও দেশভাগ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই বেদনা, এই দহন শিকড়সন্ধানী করে তুলবে। দেশভাগ যেমন একটি বেদনাদায়ক ঘটনা পাশাপাশি এই বিষয়ে নিমজ্জিত হয়ে আলোচনার পরিসরও কম বেদনাদায়ক নয়। সেই বিচ্ছেদ বেদনার বিস্মৃতি রাশি হয়েই অমর মিত্রের কাছে দেশভাগ বা দেশত্যাগের মানবিক ট্রাজেডি অনিবার্যভাবেই উঠে এসেছে যার নির্মম সাক্ষ্য বহন করে চলেছে খণ্ডিত বাংলার চলমান সাহিত্য। তাঁর ধুলোগ্রাম উপন্যাস যেন সার্বিকভাবে ধারণ করে আছে দুই পারের ইতিহাসকে। ছেড়ে আসার যন্ত্রণা এবং আবার নতুন করে গড়ে তোলার সংকল্পের মধ্যে দিয়েই দৃঢ় হয়ে উঠেছে এর কাহিনি। ১৯৪৭ -এর দেশভাগ এবং ১৯৪৮ -এর শেষ দিকে খুলনার দাঙ্গার ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী এসে ভিড় করে। বেসামাল পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে চেয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ -এ নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি ঠিক হয় এবং তাতে বলা হয় ৩১-শে ডিসেম্বরের মধ্যে উদ্বাস্তুরা যদি ফিরে যায় তবে পূর্ববঙ্গ সরকার তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু এই প্রস্তাবও শৃঙ্খলা দিতে পারেনি বরং বিক্ষোভের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। অগণিত বাস্তুত্যাগী মানুষদের বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়েই পুনর্বাসন বা সম্পত্তি একচেঞ্জের খেলা চলে যার কোনোটাই পরিপূরক ছিল না। কিছু মানুষ তাদের নিজেদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিজেরাই হাতে তুলে নিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল উদ্বাস্তু কলোনি। এই কলোনিগুলিকে কেন্দ্র করে এবং অবশ্যই কলোনিবাসীদের অধিকার ও অধিকৃত জমির আইনি স্বীকৃতির দাবিতে এপার-ওপারের বাঙালির যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রতিহিংসা, আবেগ- বিহ্বলতা কাজ করেছে তারই এক জীবন্ত ভাষ্য ধরা রয়েছে অমর মিত্রের ধুলোগ্রাম উপন্যাস।

মূলশব্দ

দেশভাগ, উদ্বাস্তু, কলোনী, আত্মপরিচয়ের সংকট, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস

ভূমিকা

দেশভাগোত্তর কালে জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়া এক দেশত্যাগী পরিবারের সন্তান অমর মিত্র। তাঁর জন্ম ১৯৫১-তে, দেশভাগের তিন বছর পরে। তিনি না দেশভাগ দেখেছেন না তিনি দাঙ্গার সাক্ষী। শৈশব থেকে বড় হতে হতে মায়ের মুখে হারানো গ্রাম, হারানো নদী, হারানো স্বজনের কথা শুনতে শুনতে তিনি বিভাজিত বেদনাকে ধারণ করেছেন। তাই অমর মিত্রের লেখায় দেশভাগ এসেছে মূলত স্মৃতির সূত্রে। অমর মিত্র নিজে এ প্রসঙ্গে যা জানান–

> 'ভালমন্দ দুই শুনেছি। কারো মুখে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার কথা যেমন শুনেছি, তেমনি বাড়ির অসাম্প্রদায়িক চেহারাও দেখেছি। ভাল-মন্দ দুই দেখতে দেখতে, ওপারে সব খুইয়ে আসা পরিবারের এপারে ভেসে এসে ভেসে যাওয়া দেখতে দেখতে, মানুষের বেদনার কথা অনুভব করতে করতে আমার নিজের ভিতরে হারিয়ে যাওয়া দেশ যেন মহাবৃক্ষের ছায়া ফেলে রেখেছে।'[১]

১৯৯৩ সালে কাঁটাতার উপন্যাসের মধ্যে দিয়েই মূলত অমর মিত্রের দেশভাগ সংক্রান্ত রচনার সূত্রপাত হয়। স্বদেশ থেকে উৎখাত কিছু মানুষের সংকট এবং টিকে থাকার লড়াইয়ের সমন্বয়ে উপন্যাসটি বিস্তৃতি লাভ করলেও বোঝা যায় তা একান্তই আত্মজনের ইতিবৃত্তে আবদ্ধ থেকে গেছে। *কাঁটাতার* (১৯৯৫) রচনার পর বেশ কিছু বছর অমর মিত্র দেশভাগের রচনা থেকে দূরে ছিলেন। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দেশভাগ সম্পর্কিত রচনাগুলি তিনি লিখেছেন মূলত ২০০০ থেকে ২০১৫ এই সময়সীমার মধ্যে। বিভাজনের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েই তাঁর লেখনী নতুন করে দেশ চিনিয়ে দেয়। তাঁর অধিকাংশ লেখাতেই এক বিমূর্ত কনসেপ্ট হিসেবে উঠে আসে 'দেশ' নামক শব্দটি। ছেড়ে যাওয়ার মর্মবেদনা দ্বারাই কি নির্মিত হতে পারে দেশ না কি নতুন বাসস্থান যেখানে নির্মিত হয় সেটাই হয়ে ওঠে দেশ এই দ্বান্দ্বিকতা থেকেই উঠে এসেছে অমর মিত্রের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছোটগল্প এবং উপন্যাস তো বটেই। মূলত আখ্যানের মধ্যে দিয়ে শিকড়ের অনুসন্ধান করেছেন লেখক। তাঁর এই ধারার প্রবেশদ্বার বলা যেতে পারে *ধুলোগ্রাম* (২০০১) উপন্যাসটিকে। ছেড়ে আসার যন্ত্রণা এবং আবার নতুন করে গড়ে তোলার সংকল্পের মধ্যে দিয়েই দৃঢ় হয়ে উঠেছে এর কাহিনি।

ধুলোগ্রাম এমনই এক বাস্তুচ্যুত পরিবারের আখ্যান যারা অগণিত উদ্বাস্তু মানুষের মতো দেশ ছেড়ে আসেনি, দাঙ্গা বা হানাহানি তাদের মারাত্মক ভাবে ছুঁতে পারেনি। হয়তো ক্ষোভে, আবেগে কিছুটা নিপীড়িত হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেছিল এবং এই স্থানান্তরের সঙ্গেও ছিল সম্পত্তি এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ফলে এই পরিবারের কাছে দেশভাগ মানে যতটা যন্ত্রণা তার চেয়ে আবেগ বেশি। বরং পূর্ববাংলার সাতক্ষীরার এই সম্ভ্রান্ত পরিবার একটি নদীর ব্যবধানে পশ্চিমবাংলায় এসে যথেষ্ট সমাদর পায়। আর্থিক সঙ্গতি, স্বচ্ছল জীবনযাত্রা, শিক্ষা এবং পারিবারিক সম্ভ্রমের কারণে এই পরিবারের কাউকেই 'রিফ্যুজি' বলে তিরস্কার করা হয় না। এই একান্নবর্তী পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য শুভ। তার বাবা-কাকা সবাই চাকুরে। কিশোর শুভ তার ঠাকুমার মুখে পূর্ববাংলার

গল্প শুনে অবকাশ যাপন করে। এই পরিবারের একমাত্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছাড়া কেউই খুব একটা ভাবিত হয় না দেশভাগ নিয়ে। কিন্তু শুভদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনিতে ঠিক এর বিপরীত ছবি। তারা আর্থিক ভাবে পিছিয়ে তো বটেই সঙ্গে প্রতিনিয়ত তারা ছিন্নমূল, উদ্বৃত্ত, 'রিফ্যুজি' বলে লাঞ্ছিত হয়। পূর্ব বাংলার 'আমতলি' গ্রাম থেকে আসা এই মানুষগুলি এপারেও বিকল্প এক 'আমতলি' গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। উদ্বাস্তু কলোনিতে গিয়ে শুভ তার কালোঠাম্মার মুখে ফেলে আসা দেশ গাঁয়ের গল্পকে যেন চাক্ষুষ করতে পারে। উপন্যাসটি এভাবেই একটি পরিবার এবং একটি উদ্বাস্তু পাড়ার সামাজিক ও ব্যবহারিক অবস্থানের টানাপোড়েনে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবাংলার স্থায়ী অধিবাসীদের কাছে উদ্বাস্তু হেনস্থার দিকটি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে তেমনি উঠে এসেছে ভাষাগত বিরোধ। এই কেন্দ্রীয় চরিত্র শুভ শেষে বাবার কর্মসূত্রের কারণে বসিরহাট ছেড়ে মাকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছে দূর বাঁকুড়ায়, তার দেশভাগের গল্প শোনা অভ্যেসে ধীরে ধীরে এক বৃহত্তর জগতে গিয়ে মিশেছে।

বিশ্লেষণ

দেশভাগের প্রথম পনেরটি বছরের সময়কাল এই উপন্যাসটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। দেশভাগের চার বছর পরে জন্মানো শুভ জ্ঞানত জানে না তারা কি হারিয়েছে। ওপারে যে তাদের সবকিছু ছিল সেটা যেমন তার কাছে রূপকথার জন্ম দেয় ঠিকই সঙ্গে রোমাঞ্চও আনে। শুভ তার মা প্রতিমা দেবীর কাছে শোনে–

> 'ওপারের মানুষ তারা। সব বিক্রিবাটা করে এপারে না এসে উপায় ছিল না। দাঙ্গা লেগেছিল চতুর্দিকে, কিন্তু তাদের গ্রাম ছিল ব্যতিক্রম। মা বলে ধুলোগাঁর মানুষ নাকি জানতই না দেশভাগ হয়ে গেছে। না হিন্দু না মুসলমান। জেনেছে ক'দিন বাদে। জানার পর গ্রাম জুড়ে কান্নার রোল উঠেছিল। মা বলে, সেই কান্না এখনও যেন মায়ের কানে লেগে আছে। তবু ওপারে থাকা যেত ভবিষ্যৎ ভেবে সব আস্তে আস্তে চলে আসছে।'[২]

কিশোর শুভ ভাবে তাহলে কী ছিল সেই ভবিষ্যৎ যা স্বদেশে পূরণ সম্ভব নয়, কী বা সে দেশত্যাগের মহিমা যা স্বপ্নের হাতছানি দেয়। আসলে এসব কিছুই ধোপে টেকে না। অমর মিত্র আসলে বোঝাতে চান ভূমিহীনেরা এভাবেই বারবার বিশ্বাসভঙ্গের মধ্যে দিয়ে বাস্তু বদলানোর অভ্যাসকে রপ্ত করে। মানুষের অস্তিত্বে মিশে থাকা সেই স্থানান্তরের রীতি কী তাই অমর মিত্রের লেখনীতে প্রকট হয়ে ওঠে! পাঠককে এই প্রশ্ন বিদ্ধ করে। শুভর ঠাকুরদা অবনীমোহনও নানা গল্প সম্ভারের নিক্তিতে দেশভাগকে মাপেন। অবনীমোহন বিশ্বাস করেন দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা একদিন মুছে যাবে, তারা পুনরায় ধুলোগ্রামে প্রত্যাবর্তন করবেন। অবনীমোহনের গল্পের পরিধিও ঠিক এটুকুই। কিন্তু এখান থেকেই শুরু হয়ে যায় এই আখ্যান– পিতৃপুরুষদের কথা বেয়ে বেয়ে এবং সেই পশ্চাদপসরণ দ্বারাই গড়ে তোলে দেশকাল ভাবনা। ঠাকুর্দা এবং কালোঠাম্মার এই গল্পকথাকে বেদনার উওরাধিকারের মতো ধারণ করে শুভ। অবনীমোহন বারান্দায় দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে তাকিয়ে তার ভিটেমাটি খোঁজার মধ্যে আসলে নিজেকে খুঁজে চলেন। তার আক্ষেপ একটুর জন্য খুলনা জেলা ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে। অন্যদিকে প্রতি সন্ধ্যেবেলায় নাতি-নাতনিদের কাছে ছেড়ে আসা দেশের গল্প বলে যায় শুভর কালোঠাম্মা। সে গল্পে শুধু বাস্তুত্যাগী মানুষগুলিই নয়, বরং সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠে অধর প্রামানিকের মৃত স্ত্রী বিদ্যেবতীর প্রেতাত্মা। পারিবারিক বিন্যাস, শুভ, আমতলা কলোনি-এসব কিছুই স্মৃতি হাতড়ানো সম্বল, যা

লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নেয় একটি জাতির অন্তর্বেদনার করুণ আলেখ্য।

বসিরহাটের ওপারের সাতক্ষীরার, কপোতাক্ষের তীরের গ্রাম আমতলির অধিবাসীরা উদ্বাস্তু হয়ে এপারে এসে চেয়েছে একটি বিকল্প আমতলি গড়ে তুলতে। এর মধ্যে তারা যে শিকড় খুঁজে নিতে চায় তা আসলে অমর মিত্রের একটি বাসনা, তিনি মনে মনে চান হয়তো অন্তত যা দিয়ে দেশভাগ ও বাস্তুহীনতাকে ভুলে থাকা যায়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শুভর মধ্যেই আত্মগোপন করে থাকেন অমর মিত্র স্বয়ং। আমতলার মানুষেরা তাদের প্রিয় নদী, জমি, বাস্তু, বাগান সব রেখে এসেছে কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে জন্মগ্রামের স্মৃতি। সেই স্মৃতি বয়ে তারা সীমান্ত পার করেও একটি রিফ্যুজি কলোনিকে 'আমতলি' নামে ডেকে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছে। তাদের সেই প্রয়াস বিদ্রূপে অবহেলায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। রিফ্যুজি এবং রিফ্যুজি পাড়া– এই শব্দ যুগলকে মুছে ফেলতে চেয়েছে কয়েকজন সর্বহারা মানুষ। রিফ্যুজি শব্দটির মধ্যে যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য তা শুভ বোঝে কিন্তু একটা সময়ে সেও মনে-প্রাণে আমতলিবাসীর একজন হয়ে ওঠে। সে সহ্য করতে পারে না তাদের অপমান বরং উপলব্ধি করে আমতলির ছিন্নমূল মানুষগুলির মতো তারাও রিফ্যুজি। আমতলির মানুষকে বারবার রিফ্যুজি বলে অপমান করার ভিতরে ওপার থেকে আসা সব মানুষের প্রতি অবহেলা দেখানোর যে অভিসন্ধি রয়েছে তা শুভকে পীড়িত করে। দিদি জুঁইয়ের সঙ্গে সে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে–

> 'জুঁই বলল, রিফ্যুজি পাড়া যেতি হবে না, গিয়ে বাঁদর হবি, গালাগালি শিখবি। আমরাও তো রিফ্যুজি। জুঁই অবাক হয়ে যায় শুভর মুখে এই কথা শুনে, কী বললি আমরা রিফ্যুজি? তাই তো, তুই তো রিফ্যুজি, আমি বরং এ পারে হয়েছি, ইন্ডিয়ার লোক, ভারতের লোক, যারা যেখেনে জন্মায় তারা সেখেনের লোক হয়। জুঁইয়ের আত্মসম্মানে লেগেছে ঝাঁপিয়ে পড়ল শুভর উপর, কলোনির লোক যা বলে তাই শিখছিস তুই, ওরা রিফ্যুজি বলে সবাই তা হবে?'[৩]

এই পরিবারটি সমাজের উচ্চবর্ণেরই শুধু নয়, তাদের পাকা ঘর এমনকী তার কাকা নীলরতনবাবু যে তহসিলদার, বা তার বাবা কলকাতায় সরকারি চাকরি করেন সর্বোপরি ক্ষমতাবান বলে তাদের রিফ্যুজি বলে অবহেলা করায় যে একটা ঝুঁকি আছে সেটা শুভর বুঝতে অসুবিধা হয়নি। শুভ প্রথম দিকে তার কালোঠাম্মার কাতর অনুরোধে আমতলি গেলেও পরে সে নিজের ভিতরেই অনুভব করেছে অজানা-অব্যক্ত এক আকর্ষণ। তাই এপারের দেশীয় মানুষদের মনে আমতলির মানুষের প্রতি যে ঘৃণা উৎসারিত হয়েছে তা থেকে সে নিজেকে বিযুক্ত বলে ভাবতে পারে না। শুভর এই ব্যথা, মনে মনে উচ্ছিন্ন মানুষগুলির দোসর হয়ে ওঠার অব্যক্ত অনুভূতি আর কেবল তার একার থাকে না, তা সর্বজনের বেদনায় ব্যাপ্তি লাভ করে। এক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই দেশহারা মানুষের অভিমান এবং ক্ষোভকে তুলে ধরেন লেখক–

> 'ব্যক্তির শোক নয়, এই শোক সর্বজনের। এপারে যারা এসেছে তাদের শোক, ওপারে যারা রয়ে গেছে তাদেরও। দুর্গাপুজো করা মানুষের শোক, মসজিদে নামাজ পড়া মানুষের শোক। দাঙ্গার ভয়ে প্রাণ হাতে করে চলে আসার সময় কেউ আশ্রয় নিয়েছিল ইয়ার আলির বাড়ি, কেউ ইয়াকুবের ঘরে। কিন্তু দেশ তো ছেড়েছে ধর্মের কারণে, তাই দেশ হারানোর শোকে ওইসব ঘটনাগুলো তুচ্ছ হয়ে গেছে, ব্যক্তির ঔদার্য সমষ্টির স্বার্থকে রক্ষা করতে পারে না বলে মনে মনে রাগও আছে। সেই রাগ, আমতলির হারানোর অপমানকে ভুলতে

> আমতলির মানুষ এই ব্রহ্মপুরের প্রান্তে গড়ে তুলেছে আমতলি। তাদের অভিমান মুসলমানের উপর, তাদের রাগ দেশনেতৃত্বের উপর। মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, কায়েদ-ই-আজম, মহম্মদ আলি জিন্নার উপর। এদের উপর শোধ নিতেই যেন এই আমতলির পত্তন। তারা সামান্য মানুষ, কেউ তাঁত টেনে জীবিকা নির্বাহ করত, কেউ কপোতাক্ষয় মাছ ধরে, কেউ হাঁড়ি কলসি তৈরি করে, জমিতে লাঙল ঠেলে ভাতের জোগাড় করত, তারা ইতিহাস জানে না। জানে এই সত্য যে দেশটাকে দু-খণ্ড করে দিয়েছে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, ব্রিটিশ মদত দিয়ে গেছে। যারা দেশ ভেঙেছে তারা তাদের চেয়ে অনেক শক্তি ধরে, তারা সামান্য বল নিয়ে পাল্লা দেওয়া আরম্ভ করেছে।'[৪]

পারিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে শুভর আরেকটি আইডেন্টিটি সে ব্রহ্মপুর উচ্চশিক্ষা নিকেতনের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র-শুভময় বসু। তার স্কুলজীবন, শিক্ষক, সহপাঠীদের সঙ্গে কাটানো সময়ের প্রেক্ষিতে যে জগৎ সে দেখতে পায় সেখানে হিন্দু-মুসলমান বা অন্যান্য নিম্নবর্গীয়ের পারস্পারিক অবস্থান বুঝিয়ে দেয় দেশভাগের মতোই মানুষের মানসিকতার বিভাজনও সমান ভয়ঙ্কর।

অমর মিত্র বোধহয় তাঁর ধুলোগ্রাম উপন্যাসটি স্তর পরম্পরার মাধ্যমে ধরে রাখতে চান একটি দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসকে। দেশভাগ বা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেই যে জীবন অতিবাহিত হয়ে গেল তার ভয়াবহ ক্ষতগুলিকে মুদ্রিত করার প্রয়াসই হয়তো তাঁকে এই আখ্যান সম্প্রসারণে রসদ যুগিয়েছে। 'আমতলি' পত্তন তাই একটা প্রতীকী হয়ে থেকে যায়–

প্রথমত : আমতলি পত্তন সে যে দেশেই হোক না কেন সেটাই মানুষের একটি প্রবৃত্তি। মানুষ যে আদিকাল থেকে যাযাবর বৃত্তির গণ্ডী ভেঙ্গে বাস্তু গড়ে থিতু হতে চেয়েছে তা ইতিহাস পরম্পরার মধ্যেই ধরা রয়েছে। ফলে কপোতাক্ষ তীরের একদল মানুষ উর্বরা ভূমিতে ঘর বেঁধে, জন্ম-মৃত্যু-অভিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। তাদের হৃদয়ের গহীনে আমতলি দৃঢ়ভাবে প্রথিত হয়ে গেছে। কিন্তু দেশভাগ তাদের সেই শিকড়কে উপড়ে দিয়েছে। আবার অন্ন এবং বাসস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে আমতলিবৃন্দ। আদিকালের সেই বিস্মৃত অভ্যাস দেশভাগের অভিঘাতের মধ্যে দিয়ে ফিরে এসেছে মানবজাতির এক ক্ষুদ্র অংশের কাছে। শোকে আকুল যূথবদ্ধ মানুষগুলি সব ছেড়ে ভাঙা পরিবার নিয়ে সীমান্তমুখী হয়েছে। তারা চলতে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে একদা দূর অতীতে যে আমতলি তাদের যাযাবর বৃত্তি ভুলিয়েছিল সেই আমতলিকেই বাঁচাতে তারা পার হয়েছে দেশ, বিদ্ধ হয়েছে কাঁটাতারে।

দ্বিতীয়ত : নারী এবং পুরুষের মধ্যে দেশভাগ কীভাবে এসেছে, কত মর্মান্তিক ভাবে তার ছায়া ফেলেছে সেদিকে আলোকপাত করেছেন অমর মিত্র। তিনি *ধুলোগ্রাম* উপন্যাসে বলছেন–

> 'পুরুষরা সীমান্ত পার হতে হতে তাদের পরিবার পরিজনের হাত ধরে শাপান্ত করছিল সেইসব মহাজনদের, যারা তাদের গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। তারা ঝুঁকে পড়ে কাঁদছিল, তারা আমতলিতে জন্মাত, আমতলিতে বাঁচত, আমতলির নদীতে, মাটিতে শ্রম করে অন্নের ভাবনা দূর করত। তারা তাদের হাত পা পেশী নিয়ে কোন নদীতে, কোন মাটিতে যাবে? মানুষের বাসভূমির তো নিজস্বতা চাই।'[৫]

আসলে এক্ষেত্রে পুরুষের ক্রন্দন ছিল পেটের খিদে আর মাথার উপর এক টুকরো আচ্ছাদনের জন্য আর নারীর ক্রন্দনে এসব কিছুর সঙ্গে আরো ছিল আব্রু রক্ষার লড়াই। আমতলিকে কেন্দ্র করেই লেখক নারীর রোদনকে ব্যক্ত করেছেন। নারীদের শোকের আকুলতায় আমতলি ব্যতীত পাশাপাশি গ্রাম জনপদও উঠে এসেছে কারণ তারা কেউ হয়ত সংসার করতে এসেছে আমতলিতে বা আমতলি ছেড়ে অন্য গ্রামে পাড়ি দিয়েছে। ফলে সেইসব যুবতী, বৃদ্ধাদের যে নদী যে গ্রাম এক সময় সুখে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পিতৃগৃহে বা পতিগৃহে তারাই আবার সর্বহারা হয়ে পাড়ি দিয়েছে অন্যদেশে। অথবা অধিকাংশ নারী হয়তো ধর্ষিতা হয়েই ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। নারীর বেদনাই কি তাহলে অমর মিত্রকে অধিক তাড়িত করেছে? সে প্রশ্ন থেকেই যায়–

> 'তারা সন্তানধারণ করে বলে গৃহ-গ্রাম-নদী যাত্রাপথ সব যে সন্তানের মতো ধরে রেখেছিল বুকের অন্তস্তলে। সব হারিয়ে তারা পার হয়ে এসেছিল সীমান্ত। হাঁটতে হাঁটতে, নতুন মাটির দিকে যাত্রা করার সময়ে তারা কেঁদেছিল কখনও পতিগৃহের আমগাছটির জন্য, কখনও পিতৃগৃহের ধবলী গাইটির জন্য। হয়তো বা কেঁদেছিল পিতৃগৃহে ফেরার সময় বেত্রবতী বা কপোতাক্ষ তীরে অপরাহ্ন বেলায় নমাজ পড়তে বসা বৃদ্ধের জন্যও তাদের কাছে ব্রহ্মপুরের এই আমতলি আগের আমতলির ছায়া মাত্র।'[৬]

যেভাবে জয় গোস্বামীকে লিখে যেতে হয় 'নন্দর মা' কবিতা তেমনি অমর মিত্রকেও লিখে যেতে হয় কালোঠাম্মাদের অন্তহীন পালিয়ে বেড়ানোর কথা। শুধু তাই নয় বিধবা এবং মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষেরাও বিশেষভাবে উঠে আসে অমর মিত্রের লেখায়। কালোঠাম্মার সই হরিমতি এবং তার পাগল ছেলেকে কিভাবে পূর্ববঙ্গের ধুলোগ্রাম থেকে এনে আমতলিতে ঠাঁই দেওয়ানো যায় সেই প্রয়াস একটি চিঠির আকারে উঠে এসেছে। হরিমতির উদ্দেশ্যে কালোঠাম্মার লেখা এই চিঠিখানি উপন্যাসকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়–

> 'স্নেহের হরিমতি, পত্রদ্বারা কুশল জানিয়ো, তোমাকে আমরা পাকিস্তানে ফেলিয়া আসিয়াছি না, না, আমরা তো নয়, আমরা হবে কেন? ফেলে এসেছে তো ওর ভাসুর দেওর, তবু আমরাই লিখতে হবে, তারা ফেলে আসুক, আমরা তো ডাকতে পারতাম পাগল ছেলে আর তার বুড়ি বিধবা মারে ফেলে রেখে চলে এল সবাই, সবাই যেন পাথরের মতো, বলে নাকি পাগলকে ওপারে ফেলে রেখে তার মাকে চলে আসতে। মানুষ কী নিষ্ঠুর রে, মানুষ পারে এসব!'[৭]

নারীদের কাছে দেশভাগ কতটা গভীর ছিল অমর মিত্র সে কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। শুধু অমর মিত্রই না, অন্যান্য সাহিত্যিকদের থেকেও আমরা জেনেছি দেশভাগ নারীকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। উর্বশী বুটালিয়া তাঁর *The Other Side Of Silence* বইটিতে রিফ্যুজি নারীর নীরবতার বিষয়ে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন- 'Words would suddenly fail speech as memory encountered something too painful, often frightening to allow it to entire speech.'[৮] লক্ষ করা যায় যে যখনই তিনি মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন লক্ষ করেছেন তারা নিশ্চুপ থাকতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। দুঃস্বপ্নময় অভিজ্ঞতা যেন তাদের মূক ও বধির করে তুলেছে। মনের গভীরে এই ক্ষত এতটাই প্রভাব ফেলেছে যে তারা কেউ মুখ খুলতে চায়নি, বা কেউ শুরু করলেও কথা বলতে বলতে স্মৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করে হঠাৎ নীরব হয়ে গেছে। অমর মিত্রের ঠাকুমা নিজে দেশভাগের অভিমানে এপারে এসে কখনো দুর্গাপুজোয় মেতে উঠতে পারেননি সে কথা তিনি তাঁর

স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন। তিনি পিতামহীর বেদনাকে গভীর ভাবে অনুভব করেছেন। সেই অনুভূতি দিয়েই যেন ধুলোগ্রাম উপন্যাসের দেশত্যাগী কালোঠাম্মা চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন লেখক। কালোঠাম্মার কাছে গল্প মানেই স্মৃতিচারণ। আসলে কালোঠাম্মার বিষয়টা একই, শুধু পরিবেশনের গুণে তা স্তর পরম্পরায় বিন্যস্ত হয়েছে। তবে কালোঠাম্মা সর্বাধিক যে গল্পটি পরিবেশন করে তা বিদ্যেভূতকে নিয়ে, যার সত্যিকারের কোনো অস্তিত্বই নেই। তাহলে অস্তিত্বহীন স্মৃতিকেও কী অমর মিত্র যাপন করতে চান! লেখকের মনোজগৎ নিঃসৃত স্মৃতিরা একে একে দানা বাঁধে, আর তা দিয়েই দেশভাগের বেদনাকে বহুমাত্রিকতায় তুলে ধরেন। ফলে কালোঠাম্মার গল্পগুলিও 'ঠাকুমার ঝুলি'র পরম্পরা বহন করতে থাকে এবং তা সঞ্চারিত হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

দেশভাগের মতো বড় বিষয়ই শুধু নয়, সামাজিক রাষ্ট্রিক যে কোনো সংকটে নারীকেই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হতে হয় সেটাই অমর মিত্রকে পীড়িত করেছে। বালিকা, যুবতী, বধূ, বিধবা এবং মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন মানুষদের নিয়ে যে প্রান্তীয় জগৎ এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে তা দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে দেশমাতৃকার লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত রচনা করে। আর তাই পূর্ব পাকিস্তানের ধুলোগ্রাম, আমতলি থেকে দেশচ্যুত মানুষেরা পশ্চিমবঙ্গের ইছামতী সংলগ্ন বসিরহাট অঞ্চলে গড়ে তোলে বিকল্প এক আমতলি। যে আমতলি এদেশীয়দের কাছে নিতান্ত রিফ্যুজি পাড়া নামে ব্যঙ্গবিদ্রূপে পর্যবসিত হয়। 'রিফ্যুজি' এবং 'বাঙাল'- এই শব্দ যুগল ক্রমশ অমার্জিত হতে হতে নিতান্ত গালাগালিতে পরিণত হবার মধ্যে যে বেদনা লুকিয়ে থাকে তা সমগ্র বঙ্গভূমি এবং বাংলা ভাষাকে কালিমালিপ্ত করে। ধুলোগ্রাম উপন্যাসের ধুলোবালিময় সাধারণ মানুষেরা তাদের মৌখিক ভাষা আর চিরকালীন নদীপ্রীতি নিয়ে উদ্বাস্তু হয়। তাদের সঙ্গে গ্রাম, পাড়া, রাস্তা, খেতসহ পেরিয়ে আসে পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা গৃহবধূ বিদ্যেবতীর ভূত নিজে–

> 'কালোঠাম্মা ওই কাহিনী বলে না সন্ধ্যেয়। এখন তার মুখে শুধু অধর পরামানিকের বউ-এর গল্প। যে গল্পের টানে অন্ধকারে পরামানিকের বউ বোধহয় বর্ডার পার হয়ে, ইছামতী নদী পার হয়ে, বাঁশবন বিলবাওড় পেরিয়ে কালোঠাম্মার খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। বউ উঠোনে দাঁড়িয়ে যেন ফিসফিস করে, চলি এলে পিসি, আমার যে মনখারাপ করে খুউব, আমি কাদের নে থাকব পিসি, তুমি ছাড়া যে কেউ ছেল না আমার।'[৯]

পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না বিদ্যেবতীর ভূত আসলে একটি পিছুটান। এই পিছুটান আপামর বাংলা ভাষাভাষী মানুষের। যত মানুষ ওপার থেকে এপারে এসেছিল হয়তো তার তুলনায় এপার থেকে ওপারে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কমই ছিল। কিন্তু তাদের অনুভূতিমালা দ্বারা নির্মিত বাস্তুযন্ত্রণা, একটি বাংলাকে ভেঙ্গে দু-টুকরো করার বেদনা রাষ্ট্রনেতাদের বিচলিত করেনি। তাই ওপার বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ওতপ্রোত সম্পর্কের সম্প্রীতিটুকুকে বারবার দুটি ভূখণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরেন লেখক। যুদ্ধ নয়, ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপ্রেরণা থেকেই হয়তো অমর মিত্র দেশভাগকে উপস্থাপন করতে চান।

কালোঠাম্মার গল্প বস্তুত অমর মিত্রের মনোজগতের বিনির্মাণ। প্রৌঢ়া এই নারীর দেশত্যাগের কষ্ট আসলে লেখকেরই অর্জিত। ইছামতীর ওপারের ধুলোগ্রাম থেকে এপারের ব্রহ্মপুরের মধ্যবর্তী দূরত্ব মোটে পনেরোটি মাইল হলেও তা পেরোতে কখনো কখনো জীবনও দিয়ে দিতে হয়। উপন্যাসে ওই দূরত্বটুকুই এসেছে রূপক হয়ে। কালোঠাম্মার মতো বুড়ো পশুপতি দাস দেশভাগ এবং বয়সের ভারে ন্যুব্জ। তারই উদ্যোগে ব্রহ্মপুরের

রিফ্যুজি কলোনি আমতলি নামে আখ্যা পায়। অথচ বিস্তর বাধা পোহাতে হয় তাকে। এদেশীয় স্থায়ী মানুষেরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেই নয়, চূর্ণ-বিচূর্ণ আঘাতে সেই স্বপ্ন ভেঙে দিতে প্রস্তুত। রিফ্যুজিকে যারা অশ্রাব্য, তাচ্ছিল্য, ঘৃণায় পর্যবসিত করতে চেয়েছে তাদের সম্মিলিত অবজ্ঞার সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ পশুপতি বোঝাতে চেয়েছে তারা ভিখিরি বা চোর নয়, সর্বস্ব হারানোর অতল ব্যথায় লীন হতে হতে তারা শুধু রিফ্যুজিপাড়াকে আমতলিতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে।

অন্যদিকে সম্ভ্রান্ত অবনীমোহন ভেবেছে কলকাতা, নোয়াখালী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় রায়োট হয়েছে কিন্তু তাদের ধুলোগ্রামে তো হয়নি, তবুও কেন সে গ্রাম ছেড়ে আসতে হল। এই প্রসঙ্গটি শুভর ঠাকুরদা অবনীমোহনকেও বারবার প্রশ্নময় করে তুলেছে। শুভর বাবা রামরতন ন্যায়পরায়ণ বলেই তাকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কপোতাক্ষ, কালিহাতি, ব্রহ্মপুর ছেড়ে বাঁকুড়ায় বদলি হয়েছে। তার যে ভাঙন তা ছিল আজন্মকালের। স্বাধীনতার বয়স যখন মাত্র সতের বছর তার মধ্যে বুঝেছেন এর চেয়ে ব্রিটিশ শাসন ভালো ছিল, তারা যতই সম্পদ নিয়ে যাক না কেন তারা বিচার করত। তারা জোচ্চোরকে প্রশ্রয় দেয়নি। রামরতনের এই মোহভঙ্গ আসলে স্বাধীনতার ফাঁকগুলিকে বুঝিয়ে দেয়। রামরতনের মনে হয়েছে দেশভাগ পরবর্তী এই অর্জিত স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশি, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার অতি লোভের কারণে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। উত্তর প্রজন্মের শুভ ভেবেছে এই যাযাবর বৃত্তিই জীবন। স্কুলের দিবাকর স্যারের কাছে শোনা নটিলাস নামের ডুবোজাহাজ নিয়ে বর্ডার পেরিয়ে দূর-দূরান্তে পাড়ি দিতে চেয়েছে সে। আসলে এরা প্রত্যেকেই আত্মানুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকের জাতিগত সংকটকে মোচন করতে চেয়েছে। এভাবেই ছেড়ে আসার যন্ত্রণা এবং আবার নতুন করে গড়ে তোলার সংকল্পের মধ্যে দিয়েই রচিত হয়েছে অমর মিত্রের এই উপন্যাস। উপন্যাসে তিনটি প্রজন্ম তাদের নিজস্ব ভাবনা এবং পরিসরের মধ্যে থেকেই দেশভাগকে বুঝতে চেয়েছে। কালোঠাম্মার গল্প বলা জগৎ, পশুপতির আমতলি গড়ে তোলার স্বপ্ন, অবনীভূষণের স্মৃতি রোমন্থন- এসব কিছু পার্টিশন উত্তর ভাবনা জাত। তাই তারা সবাই সেখানেই ব্রহ্মপুর-আমতলিতেই থেকে যায়। আর রামরতন তার নিষ্ঠার দ্বারা যে জগতের সন্ধান পায় সেই কর্মময় জীবনে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে বসিয়ে চলে যায় আমতলি ব্রহ্মপুর ছেড়ে। এবং শুভ কালোঠাম্মার অপরিসমাপ্ত গল্প হৃদয়ে ধারণ করে পৌঁছে যেতে চায় পার্টিশনের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভে।

উপসংহার

একজন সাহিত্যিকের কাজই হল সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে নিরন্তর অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া, যে অনুসন্ধানে বেঁচে থাকে তাঁর সত্তা। দেশভাগ অমর মিত্রের সত্তার সঙ্গে নিবিষ্ট হয়ে আছে। দেশভাগ তিনি দেখেননি, তবে তিনি দেখেছেন স্বাধীনতা। নামপরিচয়হীন অসহায়, বঞ্চিত মানুষগুলি যেভাবে প্রতিনিয়ত একটি দেশ খুঁজে বেড়ায় সেভাবে অমর মিত্রও হারানো দেশ হারানো শিকড়ের সন্ধানে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। আর তাই তিনি আজও দেশ এবং মানচিত্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব-চিহ্ন নিয়ে ভাবিত হন, স্বদেশ অনুসন্ধানে নেমে রচনা করে চলেন একের পর এক নির্বাসিতের আখ্যান। আর অমর মিত্র নিজে যেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের অন্দরে অবগাহন করে ছুঁয়ে যেতে চান এই মর্মবিষাদ।

তথ্যসূত্র

১। অমর মিত্র, *ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৬, পৃ. ১৭৮

২। অমর মিত্র, *হারানো দেশ হারানো মানুষ*, সোপান পাবলিকেশান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ৪০

৩। ঐ, পৃ. ৬১, ৬২

৪। ঐ, পৃ. ৫৪

৫। ঐ, পৃ. ৬২

৬। ঐ, পৃ. ৬৩

৭। ঐ, পৃ. ১৭২

৮। Urvashi Vutalia, *The Silence Of Other Side,* Penguin books india, 1998, Gurgaon, Pp. 24

৯। অমর মিত্র, *হারানো দেশ হারানো মানুষ*, সোপান পাবলিকেশান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ২৪১

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 39-50

একক মাতৃত্ব এবং সেলিনা হোসেনের দুটি গল্প

ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী

ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী
কলেজ শিক্ষক
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উলুবেড়িয়া কলেজ
উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: robikobitito89@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ওপার বাংলার বরিষ্ঠ কথাকার সেলিনা হোসেন, সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে, দীর্ঘকাল ধরে তাঁর জনপ্রিয়তাও অব্যাহত। সমাজ-রাজনীতি এবং অর্থনীতির বহুমাত্রিক সমস্যা-সম্ভবনা ঠাঁই পেয়েছে তাঁর কথাভুবনে। একইভাবে সেলিনা হোসেনের কথানদীর বাঁকে বাঁকে নারীভাবনাতেও যুক্ত হয়েছে নিত্য নতুন ভাবনা; ব্যক্তিত্বে ও বৈভবে নারীর বহুমাত্রিকতা ধরা পড়েছে সেখানে। আর আধুনিক মানবতাবাদের বিশিষ্ট একটি পর্যায় যে মানবী-ভাবনা, সে সম্পর্কে গভীর সচেতন তিনি। বহতা সমাজের পট-পরিবর্তন ও নারীভাবনার বিবর্তন সম্পর্কে সচেতন থেকেই কথাবিশ্বে মেয়েদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সমাজের বিবিধ শ্রেণির নারী বাস্তবতার সঙ্গে সেলিনা হোসেনের গল্পবিশ্বে জায়গা করে নিয়েছে, আবার প্রকাশ করেছে নিজেদের অনন্যতাও। তেমন বিশ শতকের একেবারে প্রান্তে এসে তিনি গল্পে এনেছেন একক মাতৃত্বের মত বিষয়কে, যা আজও সমাজের প্রতিটি স্তরে নির্দ্বিধায় গৃহীত হয়নি। অথচ তিনি একেবারে গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছেন গল্পে; এখানে আলোচনা করা হয়েছে লেখিকার দুটি গল্প- 'মতিজানের মেয়েরা' এবং 'পারুলের মা হওয়া'। আসলে দুই গ্রামীণ রমণীর এই বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্তের পিছনে আছে বধূ নির্যাতন ও উপেক্ষিত নারীর করুণ ইতিহাস; পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী আবহমান কাল ধরে যে যাপন-যন্ত্রণা ভোগ করে এসেছে, আলোচ্য গল্পগুলি তার বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদই জানায় না, উত্তরণের পথও দেখায়।

মূলশব্দ

সেলিনা হোসেন, ছোটগল্প, নারীভাবনা, নারী নির্যাতন, একক মাতৃত্ব, প্রতিবাদ

ভূমিকা

মহাভারতের কুন্তী- যাঁর মাতৃসত্তা ভারতীর সংস্কৃতিতে বহু চর্চিত একটি বিষয়। মহাভারতকে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রতিভা বসু তাঁর মহাভারতের মহারণ্যে গ্রন্থে কুন্তী চরিত্রের দিকে আলোকপাত করেছেন

এইভাবে–

> 'পতিবিয়োগে কুন্তী কাঁদেননি। কাঁদলেন, যখন সর্বসমক্ষে মৃতদেহ দুটি ভস্মে পরিণত হলো। এবং তিনি নির্দোষ বলে পরিগণিত হলেন। রচয়িতা আমাদের জানিয়ে দিলেন কুন্তীর ক্রন্দনে বনের পশুপাখিও ব্যথিত হয়ে পড়েছিলো। অথচ অকস্মাৎ দু-দুজন মানুষ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, স্বতঃই যখন মানুষের বক্ষ থেকে পাঁজরভাঙা ক্রন্দন উত্থিত হয় হয়, তখন তিনি নিঃশব্দ। কেন? এই জিজ্ঞাসারও কি কোনো জবাব আমরা পেয়েছি?'[১]

এই নীরবতার মধ্যেই হয়ত আছে কুন্তীর সন্তানধারণের প্রকৃত রহস্য। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এ কর্ণ তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন 'অর্জুনজননী' বলে; সেই কর্ণকেই সমাজ নিন্দার ভয়ে একদিন রাজনন্দিনী পৃথা কুমারী অবস্থায় গোপনে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের পথে। আবার তাঁরই অনবধানে মুখনিঃসৃত বাক্যের সত্যতা বজায় রাখতে অর্জুন-বিজিতা দ্রৌপদীকে একই সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের ঘরনী হতে হয়েছিল। তবে শুধু দ্রৌপদীর দাম্পত্যই নয়, সন্তানধারণের ক্ষেত্রে গতানুগতিক যে নিয়মনীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাও কুন্তীর ললাট লিখনে অনুপস্থিত। তাই স্বামী পাণ্ডুর সন্তানের জন্মদানে অক্ষমতা এবং 'লিগ্যাসি' রক্ষার একান্ত বাসনায় কুন্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম দিতে হয়। এক্ষেত্রে দুর্বাশার আশীর্বাদ হয়েছে কুন্তীর সহায়ক। তবে বিবাহ পরবর্তীকালে সন্তান উৎপাদনের জন্য সঙ্গী নির্বাচনের দায়িত্ব তিনি স্বামীর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে নৃসিংপ্রসাদ ভাদুড়ী লিখেছিলেন–

> 'পাণ্ডুর কাছে কুন্তীর এই চরম আত্মনিবেদন এবং শরণাগতি যেমন তাঁর প্রথম যৌবনের গ্লানিটুকু ধুয়ে মুছে দেই, অন্যদিকে তেমনই দেবতা-পুরুষকে নিজে নির্বাচন করার স্বাধিকার ত্যাগ করে সমস্ত ভার পাণ্ডুর ওপর দিয়ে স্বামীর প্রতি একান্ত নিষ্ঠাও তিনি দেখাতে পেরেছেন। নিজের অনীপ্সিত সন্তানটির কথাও যে তিনি বলেননি- তাও পাণ্ডুর প্রতি নিষ্ঠাবশতই। পাণ্ডু যদি দুঃখ পান। স্বামীর সম্মতি ছাড়া একাই তিনি উৎকৃষ্ট সন্তানের জননী হতে পারেন- এই স্বাধিকার যদি পাণ্ডুকে আহত করে- তাই কন্যাবস্থায় তাঁর পুত্রজন্মের কথাও উল্লেখ করেননি এবং এখনও তিনি নিজের ইচ্ছায় কাজ করছেন না, করেছেন পাণ্ডুর ইচ্ছায়, তাঁরই নির্বাচনে।'[২]

এখানে অবশ্য কুন্তীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অবকাশ কতখানি ছিল, তা অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ রাখে। কারণ একটি প্রজন্ম পিছিয়ে গেলেই দেখা যায় সেখানে সত্যবতী ও ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে অম্বিকা ও অম্বালিকাকে ব্যাসের ঔরসে ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম দিতে হয়েছে, সেখানে কাশী-রাজকন্যা তথা হস্তিনাপুরের বিধবা রাজবধূদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় পায়নি। আর এই একুশ শতকে ঈলিনা বণিক তাঁর 'কুন্তীকথা' প্রবন্ধে লেখেন–

> 'আসলে পরিবার ব্যবস্থা এক ধরনের সম্পত্তির অধিকার সঞ্জাত। বিবাহ প্রথায় নারী হয়ে যায় পুরুষের সম্পত্তির অংশ। পুরুষ তার পদবী দিয়ে নারীর নাম, পদবি গ্রাস বা অধিকার করতে চায়। সন্তানরা হয় পুরুষের সন্তান। কারণ তারা পুরুষের পদবি পায় উত্তরাধিকার সূত্রে। স্থাবর সম্পত্তি, ক্ষেত খামার, গবাদি পশুরই মতো বিবাহিত নারীও হয়ে যায় পুরুষের সম্পত্তি, তার অধিকৃত। তাই নারীর অধিকার নেই অন্য পুরুষের বীর্য গ্রহণ করে অন্য পুরুষের ঔরসজাত সন্তান ধারণ করার। নারী বাধ্য কেবলমাত্র বিবাহিত স্বামীরই

> ঔরসজাত সন্তান ধারণ করতে। এই প্রথা চলে আসছে প্রাচীন যুগ থেকে। পরিবার ব্যবস্থা আরম্ভ যে সময়ে। মহাভারতের যুগে কুন্তীকেও পাণ্ডুর মালিকানা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল।'[৩]

বিশ-একুশের বিশিষ্ট কথাকার সেলিনা হোসেনের 'মতিজানের মেয়েরা' এবং 'পারুলের মা হওয়া'- দুটি গল্পেই লেখিকা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মাঝেও নারীর একক মাতৃত্ব এবং মেয়েদের যৌনস্বাধীনতার দিকটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গল্পদুটিতে যে নারীদের আশ্রয় করে এমন বৈপ্লবিক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তাঁরা কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত বা উচ্চবিত্ত সমাজের নারী নয়। অতি সাধারণ গ্রামীণ নারীদের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিবাদের স্বর তিনি শুনিয়েছেন, তা পাঠকের কাছে শুধু অভিনবই নয়, নারীচেতনার গতিপ্রকৃতি এবং সময়ের বাঁকবদল সম্পর্কে সচেতন করে দেয় পাঠককে।

বিশ্লেষণ

সেলিনা হোসেনের সাহিত্য সাধনা ভীষণভাবে 'প্রাণিত' হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা। তাঁর ইতিহাস চেতনা ও ঐতিহ্যপ্রিয়তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সমগ্র সাহিত্যভুবনে। প্রাগাধুনিক সাহিত্যের বিনির্মাণ থেকে কবিজীবনের নবপাঠ সমৃদ্ধ করেছে সেলিনা হোসেনের কথাবিশ্বকে। এসবের পাশাপাশি নারীভাবনায় সমকালীন সাহিত্যের এক অগ্রগণ্য সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, কারণ- 'নারীকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচয়ে না দেখে তিনি দেখেছেন সামাজিক জেন্ডার দৃষ্টিকোণে। ফলে তাঁর নারীরা হতে পেরেছে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত ও স্বাধীন নির্বাচনক্ষম।'[৪] এই সূত্র ধরেই বিশ্বজিৎ ঘোষ আরও জানাচ্ছেন–

> 'সেলিনা হোসেন তাঁর গল্পে প্রত্যাশা করেছেন নারীর অনেকান্ত উত্থান- তবে সে উত্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিনির্ভর। সামাজিক নির্ভর না হয়ে ব্যক্তিনির্ভর হওয়ার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর নারীরা পরিণতিতে হয়ে পড়ে স্তব্ধ, নির্বাক কিংবা মৌন। তবে ছোটগল্পে নারী অভিজ্ঞতার রূপায়নে সেলিনার সিদ্ধি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'মতিজানের মেয়েরা' সংকলনভুক্ত গল্পগুলোর কথা স্মরণ করা যায়।'[৫]

যেহেতু গল্প-সংকলনের নাম *মতিজানের মেয়েরা* সেহেতু গল্পটির গুরুত্ব সংকলনে এবং লেখিকার মনে বিশেষ জায়গা নিয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি দেশে-বিদেশে 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পটি যে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল, সেকথা লেখিকা নিজেও উল্লেখ করেছেন। গল্পগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৯৫, অর্থাৎ বিশ শতকের শেষ পর্বে গল্পটি লিখেছিলেন সেলিনা হোসেন।

অন্যান্য মেয়েদের মতো আশা-স্বপ্ন নিয়ে সংসার করতে এসেছিল মতিজান। শ্বশুরবাড়ির সংসার তেমন জমাটি নয়। মাথার ওপরে আছে বিধবা শাশুড়ি, ছেলের জন্মের দেড় বছরের মধ্যেই বিধবা হয়েছিল গুলনুর। কারোর সাহায্য ছাড়াই স্বামীর ভিটেমাটি আগলে একাই ছেলে আবুলকে বড় করেছে। সংসারে নিজের আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে সওদা সচেতন সে। সংসারে শাশুড়ির আধিপত্যের বিষয়টি খুব নতুন কিছু নয়। হাসান আজিজুল হকের আগুনপাখি উপন্যাসে নামহীনা কথকের শাশুড়িকেও এভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছিল; তিনি ছিলেন একাধিক সন্তানের জননী, পুত্রবধূর কথায়–

> '...যা করবার, যা বলবার, গিন্নি করবে, গিন্নি বলবে। আর সি কি যে সে গিন্নি! এটুকুন মানুষ, শাদা শাড়িতে

> কপাল পর্যন্ত ঢাকা, শরীলের কোথাও এতটুকু ধুলোবালি লেগে নাই। এত পোস্কার থেকে কেমন করে মানুষ তাই ভাবতাম। মুখে একটি-দুটি কথা, ভালোবেসেও নয়, মন্দবেসেও নয়। আর না-পচন্দ কুনো কিছু করলে দু-একটি বাক্যি যা বলত তা যেন কল্‌জে ছ্যাঁদা করে দিত। এইটোতেই ভয় লাগত বেশি। তবে বিচের ছিল বটে। একটি অন্যায় কাজ লয়, অন্যায্য কথা নয়। কুনো কিছু নিয়ে দুই দুই করা লয়। একেবারে সুক্ষ্ম ষোলো আনা ন্যায্য বিচের।'[৬]

এই 'ন্যায্য বিচের'-এর সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান মতিজানের শাশুড়ি গুলনুরের। এই জাঁদরেল মহিলার সংসারে শুধু মতিজান নয়, গুলনুরের নিজের ছেলে আবুলও 'বাড়তি মানুষ'। যথারীতি একমাত্র পুত্রবধূর ওপর নির্মম নির্যাতন চালায় গুলনুর। মনে পড়ে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' ছোটগল্পের কথা, সেখানে রায়বাহাদুরের পুত্রবধূ নিরুপমার শ্বশুরবাড়িতে খাওয়াপরার অযত্নের প্রসঙ্গ তুললে শাশুড়ির প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দিত–

> 'বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নেই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।'[৭]

অর্থাৎ নিরুপমার বাবা রামসুন্দর মিত্র রায়বাহাদুরের চাহিদা মতো পণ মেটাতে সমর্থ ছিলেন না, যার ফলশ্রুতি মেয়ের অকালমৃত্যু। পরবর্তীকালে সবুজপত্র পর্বে, রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনার একটি বিশেষ পর্যায়ে হৈমন্তীর বাবা গৌরীশংকরের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক পরিচয় পেয়ে তাঁর শ্বশুরমশাইয়ের আচরণও ছিল অনুরূপ। সেখানে কথক তথা হৈমন্তীর স্বামী নিজের পত্নীর মৃত্যুসংবাদ না দিতে পারলেও পুনর্বিবাহের জন্য মায়ের পাত্রীর সন্ধান হৈমন্তীর করুণ পরিণতি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে দেন। এভাবে শুধু যুগ নয়, পেরিয়ে যায় শতকও। যৌতুক হিসেবে সাইকেল আর ঘড়ি দিতে না পারার জন্য গুলনুর শুধু মতিজানের বাপ-ভাইকে গালমন্দ করেই ছাড়েনি, নিজের পুত্রবধূকে ভাত খেতে না দিয়ে পোষা জন্তুর মতো ঘরের খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে, সন্ধের সময় ডোবার ধারে নিয়ে গিয়ে মতিজানের মুখ গুঁজে দেয় ঘাসে- 'হামি আর তুমহাক ভাত খ্যাওয়াবার প্যারমো না। খ্যা, খ্যা, ঘাস খ্যা।' আর এই দেখে মায়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে রসুল চলে যায় গঞ্জে তার 'বাঁধা-মেয়ে' রসুইয়ের কাছে।

২০১৬ সালে প্রকাশ পেয়েছিল তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাস প্রেতযোনি; বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেই আখ্যানে অভিজাত পরিবারের মেয়ে নীপা স্বেচ্ছায় ঢালিবাড়ির বউ হয়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। তার স্বামী মনোজ, সঙ্গমের নামে রাতের পর রাত নিজের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে যায়, বিপত্নীক ভাসুর গভীর রাতে হানা দেয় ভাইয়ের স্ত্রীর বিছানায়, শাশুড়ি নিজের ভাসুরপোর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত, বড়-জা পূর্ণিমাকে নীপার বিয়ের আগেই ঠেলে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুর দিকে, নীপার একমাত্র সন্তানকেও কেড়ে নিয়েছিল তার শাশুড়ি। আর এসবের প্রতিবাদ করতে গেলেই তার পিঠে পড়ে শাশুড়ির নির্মম চাবুক–

> 'তার কান্না শুনে ছুটে আসবে সে সাহস কারও নেই। শাসুউ-ন শাসুউ-ন শাসুউ-ন বাতাসে ছড়ি কাটার শব্দে কী ঘটছে তা আন্দাজ করা যাচ্ছিল। শাসন শাসন শাসন! নিজের যথেচ্ছাচার ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গেলে এমন শাসন রাখতেই হয়। এভাবে চুপ করিয়ে দিতে হয় প্রতিবাদের কণ্ঠ। রাজনৈতিক নেত্রী রাজ্যশাসনের

> নামে করেন, বেশ্যাপাড়ার কর্ত্রী ব্যাবসা কায়েম রাখার জন্য করেন, দজ্জাল শাশুড়ি সংসারে শৃঙ্খলা রক্ষার নামে করেন। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দাঁড়াবে একই রকম।'[৮]

এরকমই এক পটভূমিকায় মতিজানের প্রতি চরম আক্রোশ শাশুড়ি গুলনুরের। যার পরোক্ষ প্রভাব পড়ে মতিজানের চরিত্রেও, সে-ও হয়ে উঠতে চায় 'শক্ত মেয়েমানুষ', তার সামনে প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে একজনই 'যে শক্ত ম্যায়্যামানুষ বলে' গ্রামে পরিচিত- অর্থাৎ শাশুড়ি গুলনুর।

হয়ত মতিজানের জীবন একটু সহজ ছন্দে চলতে পারত, যদি স্বামী আবুলের জীবন-যাপন হত স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানেও তো চরম প্রতিবন্ধকতা। স্বামীর ওপর শাশুড়ির আধিপত্য ছাড়াও আবুল আসক্ত অন্য নারীতে। বেশিরভাগ সময়টা সেই রসুইয়ের ঘরেই কাটায়। আর সংসার সম্পর্কে তার বক্তব্য- 'হামক কিছু কব্যা না। হামি কিছু জানি না। কিছু করব্যার পারম্যো না। মা হামার বুকের মদ্যি পা থ্যুয়া চ্যাপা র্যাখছে।' তার মুখ সর্বদাই ভরে থাকে অশ্লীল গালিগালাজে, যদিও সেগুলি কাকে উদ্দেশ্য করে বলে, তা ঠিক বোঝা যায় না। আবুলকে চিনতে মতিজানের অসুবিধে হয় না- 'উদ্ভ্রান্ত চেহারা, রক্তাভ চোখ, সংসার সম্পর্কে উদাসীন। সংসারের ধার ধারে না। ওর গাঁজার আড্ডা আছে, মাস্তানি আছে, পকেটে টাকা নিয়ে গঞ্জের রসুইয়ের ঘরে ঢুকে পড়ে অনায়াসে। ওর কাছে মা কিছু নয়, বউও কিছু নয়'। সে কারণে 'মাতাল, জুয়াড়ি, পরনারী-আসক্ত স্বামীর জন্য' তার মনে বিশেষ কোনো অনুভূতি জাগে না। বরং নিজের ব্যক্তিত্বকে মজবুত করতে চায় মতিজান শাশুড়ির পতিপক্ষ হয়ে ওঠার জন্য।

মতিজান গ্রামের সাধারণ মেয়ে। বাবা দরিদ্র, তবু নিজের আত্মসম্মানবোধ তার মধ্যে কাজ করে সব সময়ই। বিয়ে করতেও সে চায়নি। দরিদ্র বাবার ভার না হয়ে গ্রামের সমবায়ে রেলি বুয়ার সঙ্গে নকশি কাঁথার কাজ শুরু করেছিল। সেভাবেই কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল স্বাধীন জীবন। কিন্তু 'মানসম্মান' রক্ষার তাগিদে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে বাবা 'মিথ্যুক আর ঠগ' হয়ে গেছেন। আর মতিজানের অবস্থা তো 'মানহারা মানবী'র মতোই। তার বড় ভাই আর বাবা, জামাইয়ের জন্য ঘড়ি আর সাইকেল কেনার ব্যবস্থা করতে চাইলেও সেখানে বাধ সেধেছে স্বয়ং মতিজান-বাপ ভায়ের বদনাম তো হয়েইছে, তাকে গরুর মতো ঘাসও খেতে হয়েছে, মান-সম্মানের অবশিষ্ট আর তো কিছুই নেই- এখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মতিজান। নিজের কষ্টের সঙ্গে মিশে যায় আপনজনদের অপমানও। 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমার বাবা বাড়ি বিক্রি করে রায়বাহাদুরের টাকা মেটাতে চেয়েছিলেন। দাদা মারফৎ সেকথা জানতে পেরে বাবার সম্মুখে প্রতিবাদিনী হয়ে উঠেছিল শান্ত নিরুপমাও–

> 'টাকা যদি দাও তবেই অপমান! তোমার মেয়ের কী কোনো মর্যাদা নেই? আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, এ-টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না।'[৯]

এরকম অপমানের যন্ত্রণা বুকে চেপে সংসারের কাজ করে মতিজানও, 'বুকের ভিতর উপেক্ষা করার শক্তি শক্ত হয়ে যায়'। তাই দুপুরের খাবার খেতে গেলে গুলনুর যখন তাকে বাধা দেয়, সেই বাধাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সানকিতে রাখা ভাত খেয়ে নেয়। এমনভাবে সানকি ধরে, যাতে গুলনুর খাওয়ায় ভাধা দিলে যে সানকি ছুঁড়ে শাশুড়িকে মারতে পারে। এমনকি স্বামীর জন্য রাখা বড় মাছের টুকরোও নিজে নিয়ে নেয়। এভাবেই 'নিজের অধিকার' মতিজান বুঝে নিতে থাকে। শাশুড়ির পরাজয়ে মতিজানের 'বুকের ভেতরে জয়ের মহানন্দা', যেন

'ঘন কুয়াশার আবরণ ছিঁড়ে' বেরিয়ে আসতে চায়।

এসবের পরেও নিজের ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতাকে অতিক্রম করতে পারে না। সংসারে ঊনকোটি-চৌষট্টি কাজ, ছেলেমানুষ বুধের সঙ্গে গল্পগাছা করেও 'ব্যাপক শূন্যতা' গ্রাস করে মতিজানকে। সে জানে তার স্বামী অন্য নারীর ঘরে 'সব লুটছে'। অথচ বিয়ের বছর ঘুরে গেলেও নিজের কোল খালি। মতিজানকে 'বাঁজা মেয়েমানুষ' তকমা দিতে দেরি করে না শাশুড়ি। শাশুড়ির অত্যাচারের যন্ত্রণা অতিক্রম করে গেলেও, মা হতে না পারার বেদনায় ভারি হয়ে ওঠে মতিজানের মন। প্রতিবেশিনীর সমর্থনে ছেলের দ্বিতীয় বিয়ের কথাও শুনিয়ে দেয়। আর মতিজান যখন আবুলের কাছে এই বংশরক্ষার প্রসঙ্গ তোলে, স্বামীর প্রতিক্রিয়া- 'বংশের পোঁদে লাথ্‌থি'। এমন গালি সে দেয়, যে মতিজান 'বেকুব বনে যায়'। গাঁজায় চুর হয়ে থাকা স্বামীকে 'লাথি দিয়ে ফেলে দিতে চায়' সে। মতিজানের এই মানসিকতা প্রথাগত সংস্কার আর নারী-অবদমনের বিরুদ্ধে প্রাহমিক বিদ্রোহ। সেলিনা হোসেন তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে নারী-ভাবনার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন ওয়ালীউল্লাহের *লালসালু* উপন্যাসে জমিলা কিভাবে তার স্বামী মজিদকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই ঘটনাটি। মজিদের বিছানায় সে যায় না, স্নেহশীলা সতীনের কাছেই যে থাকে। মাজারের ভণ্ড পীর তথা চতুর ধর্মব্যবসায়ী স্বামীর গায়ে থুতু দিয়েছিল জামিলা–

> 'মজিদ যেন সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটা কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেই দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।'[১০]

বিশ শতকের মধ্যপর্বে যে 'অস্বাভাবিক' ঘটনা জমিলা ঘটিয়েছিল, প্রায় অর্ধশতক পরে মতিজান এগিয়ে গেছে আরও অনেকখানি। স্বামীর গাঁজার গন্ধেই সে ভিতরে ভিতরে উপলব্ধি করে অন্য পুরুষকে- 'লোকমানের দীর্ঘ, ছিপছিপে শরীরটা ওর হাতের কাছে চলে আসে। ও ছুঁয়ে দেখার জন্য হাত বাড়ায়। এবং সেই শরীরটা ওর মুঠোর মধ্যে পুঁটুলি পাকিয়ে ঢুকে যায়।'

সাহসী হয়ে ওঠে মতিজান। শাশুড়ি গেছে ভাসুরের বাড়ি, বুধে ছেলেটিও নেই কাছাকাছি। নির্জনতার সুযোগে ঝড়ের দুপুরে সে মিলিত হয় লোকমানের সঙ্গে। লোকমানের প্রতি একটি মানসিক টান তার আগেই তৈরি হয়েছিল। তাই নির্জন দুপুরে তাঁরই জন্য রুমালে ফুল তোলে মতিজান। লোকমানের সঙ্গে সঙ্গমে গর্ভবতী হয়ে পড়ে সে- 'একলা ঘরে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া- একলা ঘরে নিজের সঙ্গে উথাল পাথাল। মতিজানের সব বদ্ধ দরজা খুলে যায়।' স্বামী বাঁকা চোখে তাকালেও বিশেষ কিছু ব'লে না বরং পুরানো রসুইকে ছেড়ে সে তখন অন্য নারী নিয়ে ব্যস্ত। শাশুড়ি ছেলের দ্বিতীয় বিয়ে দেবার সুযোগ হারিয়ে থম হয়ে যায়। পরে অবশ্য 'পুরুষ ছাওয়াল'এর দাবি তোলে। শেষ পর্যন্ত বংশরক্ষা হয় না অবশ্য- 'নারীহিংসার দেশে' কন্যা সন্তানের জন্ম দেই মতিজান। গুলনুর নাতনির মুখও দেখেনি। কিন্তু চারিদিকের এই অবহেলা-উপেক্ষার পরেও 'এক অন্তহীন আনন্দের মহানন্দা' মতিজানের 'চারপাশে থই থই করে'। শাশুড়ি যত 'মারমুখী হিংস্র' হয়ে ওঠে, মতিজান মানসিকভাবে আরও পোক্ত হয়– 'শত মেয়ের' জন্ম দেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। শত না হলেও, বছর ঘুরতে

না ঘুরতেই আবারও জন্ম দেই কন্যা সন্তানের, এবং সেই লোকমানের ঔরসেই। শাশুড়ি বংশরক্ষার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ছেলের পুনর্বিবাহের কথা তুললে নেশাগ্রস্ত আবুল ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর চুপ থাকতে পারে না মতিজান, শাশুড়ির মুখে 'বংশের বাত্তি'র কথা শুনে 'খি খি করে হেসে' বলেই ফেলে- 'বংশের বাত্তি? থুঃ - আপনের ছাওয়ালের আশায় থাকলে হামি এই মাইয়া দুইডাও পেত্যাম না।'

নবনীতা দেবসেন তাঁর *ভালোবাসার বারান্দা*-য় লিখেছেন–

> 'বিশ শতকের কলকাতাতে একক মা হয়ে জীবনযাপনে আমার, বা আমার সন্তানদের যে কোনোই সামাজিক অসুবিধা হয়নি এমনটা বলতে পারি না। তখন ব্যাপারটা ওই সীতা-কুন্তীর কাব্যিক ঠিকানাতেই আটকে ছিল, পাশের বাড়ির নবনীতাদের দোরগোড়া অবধি নামেনি। বিদেশ থেকে নিজের শহরে ফিরে এসে অস্থিমজ্জায় টের পেলুম আত্মীয়-বন্ধু সমাজে এই নতুন আমাকে নিয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। দৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্দ্য নেই। টের পেয়ে তখন একের পর এক কয়েকটি অভিজাত ক্লাবে সপরিবারে সদস্য হতে চেষ্টা করেছিলুম। শুনলাম কোনোটিতেই সিঙ্গল মেয়েদের নেওয়া হয় না, সে শিক্ষাজীবী দুই সন্তানের মা হলেও না। স্বামী চাই।'[১১]

নবনীতা দেবসেনের মতো অন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বকে যদি বিবাহবিচ্ছিন্না অবস্থায় দুই কন্যা নিয়ে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তবে গ্রাম সমাজে মতিজানের পরবর্তী পরিণতি আমাদের শঙ্কিত করে। মনে রাখতে হবে নবনীতা দেবসেন সম্পাদিত 'সই' গল্প-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পটি। মায়ের কোলে বসে সেই শিশুদুটির 'জ্বলজ্বলে চোখে' সবার তাকানোর মধ্যে দিয়েই গল্পের সমাপ্তি। সেই উজ্জ্বল-আঁখিদ্বয় যেন উপেক্ষা করছে সমাজের চোখ রাঙানি, একই সঙ্গে নারীর যৌন-স্বাধীনতার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এই মতিজান চরিত্রের নির্মাণ।

'ভাল মেয়ে হল সেই মেয়ে, যার যৌনতা হবে পুরুষের শর্তে' শীর্ষক রচনার উষসী চক্রবর্তী লিখেছেন–

> 'আসলে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে, ভাল মেয়ে হল সেই মেয়ে, যার যৌনতা হবে অন্যের ইচ্ছে অনুযায়ী। পুরুষের শর্তে, পৌরুষের শর্তে। ছেলেরা তাই পাতার পর পাতা মেয়েদের শরীরের বর্ণনা দিলে দোষ হয় না, কিন্তু মেয়েরা যদি 'ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক' লিখে বসে, দোষ হয় খুব, কারণ তাতে পুরুষদের ভালো মেয়ে তৈরির কারখানায় হরতাল হয়।'[১২]

এই প্রথাগত 'ভালো মেয়ে'-র বাইরে এসে মতিজান বা পারুল চরিত্রের নির্মাণ করে মেয়েদের স্বাধিকারের পথে বেশ কয়েক-পা এগিয়ে দিয়েছেন সেলিনা হোসেন। মতিজান অতি সাধারণ দরিদ্র পরিবারের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে তেমনই এক পরিবারে। স্বামী শাশুড়ি নিয়ে সংসার; বিদ্রোহিনী হলেও তার আচরণে কিছু সীমারেখা ছিলই। স্বামীর অবহেলা পেয়ে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, ভালোলাগার পাশাপাশি ভালোবাসা কতখানি ছিল সেখানে, গল্পকার সে দিকে বিশেষ আলোকপাত করেননি। তবে তারই ঔরসে দুই কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিল মতিজান। কিন্তু 'পারুলের মা হওয়া' গল্পে প্রধান চরিত্র স্বামীর কাছে অবহেলিত হয়ে কামনার কালিদহে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আপাতভাবে সেখানে নারীর স্বেচ্ছাচারিতা বড় হয়ে উঠেছে মনে হলেও গভীর বিশ্লেষণে বোঝা যায় স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম এবং সেখানে প্রত্যাখ্যাত হওয়া,

পরিপূরক এই দুটি বিষয়ের সংযোগে পারুলের 'হৃদয়ক্ষত' তাকে 'স্বাধীনভর্তৃকা'য় পরিণত করেছে।

'আমি ও আমার সময়' শীর্ষক রচনায় কথাকার সেলিনা হোসেন লিখেছেন–

> 'ভেবেছিলাম সেই সময়ের কথা লিখবো, যা একান্তই আমার, যাকে আমি ভরিয়ে তুলি দিনরাতের সমুদ্রমন্থনে, যার জন্য আমার প্রতিমুহূর্তে বয়স্ক হওয়া, যা আমার শ্রম ও যন্ত্রণা এবং ইটের ভাটার মতো লাল হয়ে ওঠা আগুনে পোড়ানো সুখ। সব মানুষের বুকের ভেতরেই সময় লুকিয়ে থাকে। সৃষ্টিশীল লেখকেরা তাকে বর্ণাঢ্য করে। এই রং মেলানোর খেলার জন্যই সে অন্যের চাইতে আলাদা। সেজন্য লেখকের নিজের বলে কোনো সময় থাকে না। তা সবার হয়। ভেবে দেখেছি আমিও আমার সময়কে নিজের বলে ধরে রাখতে পারিনি। সেটা অনেকের হয়ে উঠেছে।'[১৩]

এই সময়ের বহুস্বরে কলমকে আরও শাণিত করে বিশের কথাকার সেলিনা হোসেন একুশ শতকের নতুন আখ্যানে সংযোজন করেন নবতর প্রশ্ন, নারীর জীবন-জিজ্ঞাসাকে আশ্রয় করে *নারীর রূপকথা* নামে তার গল্প-সংকলন প্রকাশ পায়, যার অন্তর্ভুক্ত হয় 'পারুলের মা হওয়া' গল্পটিও।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পারুল, সে 'লবন দেশের মেয়ে', সন্দ্বীপের চরে তার বেড়ে ওঠা। সেখান থেকেই তাকে বিয়ে করে এনেছিল নোয়াখালির আব্বাস আলি। তাদের সংসার জীবনে অর্থের অভাব থাকলেও দাম্পত্য জীবনে স্বামীর প্রতি পারুলের কোনো অভিযোগ ছিল না। বরং সংসারকে সুস্থভাবে সচল রাখার জন্য রোজগারের পথে নেমেছিল পারুলও। এই সবই করেছল সে 'জোয়ান-তাগড়া' লোকটাকে ভালোবেসে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্বামী নিরুদ্দেশ। মাস ছয়েক স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছে সে, কানে এসেছে নানা গুজব- কেউ বলেছে আব্বাস সাগরে ডুবেছে, কারোর মুখে শুনেছে লোকটি ঢাকায় আছে। এসব নিয়ে পারুলকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, যার ফলে রাগে তার 'রক্ত চিড়বিড়িয়ে ওঠে'। কিন্তু যখন উপজেলা পরিষদের সামনে আলম চাচার মুখে শোনে যে আব্বাস মনপুরার চরে গিয়ে নতুন সংসার পেতেছে, চাষ-আবাদ করছে তখন 'নারীত্বের অবমাননায়' জ্বলে যায় পারুলের শরীর। যতই 'উজ্জ্বল' মুখে এই ঘটনাটিকে 'খুশির খবর' বলুক, তার 'হাসি'র ভেতরেই চাপা পড়ে থাকে গভীর 'কান্না'।

পারুলের স্বামীপ্রেম আছে, কিন্তু তা ভাবালুতায় ভরা নয়। এমনকি তার শরীরী চাহিদাকেও অস্বীকার করেননি গল্পকার। আব্বাসের চলে যাবার কারণ অনুসন্ধান করে চলে সে- 'মানুষের প্রয়োজন মানুষের কাছে কখন ফুরিয়ে যায়?' উত্তর খুঁজতে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পারুল। সেই প্রতিবাদ নিঃসঙ্গ পারুলের বিভিন্ন আচরণে প্রকাশ পায়- কুঁড়েঘরের বাঁশের খুঁটি ধরে নাড়ে। ফাঁক হয়ে থাকে ঘরের চাল। এ শুধু পারুলের দারিদ্র্য নয়, ভগ্ন দাম্পত্যের প্রতীকও বটে। 'সামাজিকভাবে কবুল্লড়া স্বামী' তাকে ছেড়ে গেছে- সেই স্বামী, যার সন্তান গর্ভে ধারণ করলে সমাজ চোখ রাঙাত না; কিন্তু আব্বাসের উপেক্ষা ক্ষিপ্ত করে তুলেছে পারুলকে- 'টানটান হয়ে যায় ওর শরীর। কেবলই মনে হতে থাকে ওর করোটি শূন্য হয়ে যায় এই ভেবে যে লোকটা কোনও কারণ ছাড়া ওর নারীসত্তাকে উপেক্ষা করেছে। এই অপমান ওকে তীব্রভাবে দহন করছে। ও ওর টানটান শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তীব্র কণ্ঠে গালি ছুঁড়ে দেয় অদৃশ্যে। ও কণ্ঠস্বর এবং ভঙ্গি দিয়ে প্রতিবাদ করে। চাই না এ জীবন। চাই হাসিখুশি-ভোগ-বেপরোয়া সমাজকে লাথিমারা জীবন।' দুদিন পর থেকেই শুরু হয় প্রতিবাদ। উপজেলা

পরিষদের অধীনে রাস্তায় মাটি ফেলার কাজে যোগ দেয় পারুল, বিনিময়ে পাবে গম। তারার মায়ের কথায় প্রথমে বিড়িতে অনিচ্ছুক টান দিলেও পরে নিজেই বিড়ি কেনে। রাতে গম ভাজার সঙ্গে টান দেয় বিড়িতে আর গান ধরে।

আলম চাচার মুখে স্বামীর দ্বিতীয় পরিবারের খবর শুনে তার ক্ষোভ শুধু ধূমপানে প্রশমিত হয়নি। স্থির করে নেয় পারুল নিজের লক্ষ্য। মাত্র দু-মাস পরেই স্বামীহীনা পারুল গর্ভবতী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ স্বামী নয়, অন্য কোনও পুরুষের সন্তান সে গর্ভে ধারণ করেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই উদাহরণ বিরল এমন বলা যায় না। এমনভাবেই তো সুচিত্রা ভট্টাচার্যের *কাছের মানুষ* উপন্যাসে আদিত্যর স্ত্রী ইন্দ্রাণী বিয়ের পর দ্বিতীয়বার গর্ভে ধারণ করেছিল প্রেমিক শুভাশিসের সন্তান। অর্থাৎ তার প্রথম পুত্র সন্তানটি বাপ্পা স্বামীর ঔরসজাত হলেও, কন্যা তিতির শুভাশিসের। 'পাশের ঘরে' ইন্দ্রাণীর অসুস্থ ভাই তনুময়, অন্য ঘরে 'মিলিত হচ্ছে নারীপুরুষ'-

> 'যাকে সে পাগলের মতো চেয়েছিল, তাকে পেল না। যাকে পেয়েছে, তাকে সে এতটুকু চায় না। প্রার্থিত পুরুষ আবার ফিরে এসেছে। এখন সে কী করে? পরদিন আবার গেল। পরদিন আবার। কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে প্রতিবাদের বর্ম। শুভাশিস ইন্দ্রাণীকে ফেলে চলে গেছে, শুভাশিস ছন্দাকে বিয়ে করেছে, এরপর আর তো ইন্দ্রাণীর কামনা থাকার কথা নয়। তবু বাসনা জ্বলে উঠল দাউ দাউ। ... সংযম ভুলে। সংসার ভুলে। রাত্রি দিন এক হয়ে গেল। পরপর দু'রাত ঘরে ফেরা হল না ইন্দ্রাণীর।'[১৪]

দিদির অবৈধ প্রণয়ের মিলনদৃশ্য দেখেও ফেলেছিল তনুময়, তার 'বিস্মিত চোখ' ভরে ছিল ঘৃণায়। তাই ইন্দ্রাণীর তিতিরকে শুধু প্রেমের নয়, 'লোভের ফসল' বলেও মনে হয়েছিল। সেই সন্তানকে গর্ভে হত্যা করতে চেয়েছিল। আবার অন্যরকম স্বপ্নও দেখেছিল–

> 'তিতির যখন পেটে এসে গেল, তখনই যদি সংসারটাকে লাথি মেরে চলে যেতে পারতাম! তুমি, আমি আর আমাদের একমাত্র মেয়ে... তিন জনে মিলে একটা অন্য ধরনের জীবন...'[১৫]

কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, কারণ শুভাশিসের জন্য যেমন ইন্দ্রাণীর 'এক কুঠুরি' ভালোবাসা ছিল, আদিত্যর কুঠুরিও সে খালি রাখেনি। কিন্তু নাগরিক জীবনবৃত্ত বা তার সূক্ষ্ম-মার্জিত চেতনার চেয়ে অনেকখানি দূর অবস্থান নোয়াখালির পারুলের। অন্য পুরুষের ভ্রূণ সে গর্ভে নিলেও ইন্দ্রাণীর মতো প্রেম নয়, পারুলের অন্তরে ছিল প্রতিশোধের তীব্র আগুন। তার ক্ষোভ শুধু এক আব্বাসের বিরুদ্ধেই নয়, প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থার সম্মুখে এক বলিষ্ঠ জেহাদ।

গর্ভবতী পারুল তার সন্তানের পিতৃপরিচয়ও প্রকাশ করতে চায়নি। সে নিজেই তো সন্তানের মা এবং বাবা- সন্তানের পিতৃপরিচয়ের ধার ধারে না। কারণ 'শরীরের দাবি মেটানোর জন্য ওর যাকে পছন্দ হয় তাকেই প্রশ্রয় দেয়। যার সঙ্গ ওর ভালো লাগে সেটা ওর আনন্দ- সন্তানের পিতা নিয়ে ওর মাথা ব্যথা নেই। ও পিতৃত্বের অধিকার দিতেও চায় না। সোজাসুজি বলে দেয়, আঁই হোলাহান মানুষ কউরুম। ভাত দিউম, কাপড় দিউম। বাপ দি করিউম কী?'– এখানেই পারুলের প্রতিশোধেচ্ছা যুক্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। তর্ক করতে গিয়েও 'ক্ষান্ত' হয় অনেকেই। কিন্তু পারুল সমর্থন পায় না, এমনও নয়। যে সব মেয়েরা বাচ্চাসহ স্বামীর কাছ থেকে পরিত্যক্ত

হয়েছে তারা গোপনে বাহবা দিয়েছে পারুলকে। নিজেদের চাপা পড়া প্রতিবাদ যেন প্রকাশ পেয়েছে পারুলের মধ্য দিয়ে- 'ভালা কইচ্ছছ। আমরা ময়মুরুব্বির ডরে কথা কইতাম হারি না। তুই কামের কাম কইচ্ছছ পারুইল্যা। অহন হোদ্দলাগুলা বড় গলায় কথা কইতে হারে না।' এই সমর্থনে পারুলের 'অপমানের জ্বালা'য় কিছুটা 'সান্ত্বনার প্রলেপ' পড়ে। এমনকি সেই সব মেয়ের দল পারুলকে ছেঁড়া শাড়ি, কিছু খাবার উপহার হিসেবে দিয়ে যায়। আর পারুল 'বিভোর' হয়ে থাকে মা হওয়ার স্বপ্নে- 'তাই ওর শরীরে কাম-ইচ্ছা নেই। ও নারী, এখন ও প্রকৃতির কাছে নতজানু। বিশাল প্রকৃতি ওর আপন সত্তাকে গৌরব অহংকারে ভরে দিয়েছে ও সেই সাধনার ধন ঘরে তুলবে।'

এই সন্তান নিজের ঔরসজাত কিনা, সেই খোঁজ গোপনে নিতে আসে পারুলের শয্যাসঙ্গীরা। পারুল অবশ্য সে খবর প্রকাশ করে না। চরম অবহেলায় ফিরিয়ে দেয় তাদের, 'গেদুর বাপ' হিসেবে কাউকেই চিহ্নিত করে না। কারণ পারুল জানে- 'পুরুষ মানুষগুলো পিতৃত্বের কর্তৃত্ব চায়। আর কিছু না, সন্তানকে লালন পালন নয়- ওকে নিজের কাছে নেবে না- প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে স্বীকার করবে না। শুধু জেনে আনন্দ পেতে চায় যে পারুলের গর্ভে তারই সন্তান। হায় পুরুষ মানুষ।' প্রতিশোধ আর প্রতিবাদের মাঝে পারুলের মধ্যে আছে সম্ভ্রমবোধ- সে কিন্তু কোনো কিছুর বিনিময়ে শরীর বিক্রি করে না, সে 'ভোগ' করে শুধুমাত্র নিজের আনন্দে- 'যখন ইচ্ছে হয় তখন'। 'বিচ্ছিন্ন নারীর মুক্তির আনন্দ' প্রসঙ্গে মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর গবেষণা গ্রন্থে লিখেছিলেন–

> 'অসুখী বিয়ের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন নারী যে মুক্তির আনন্দ অনুভব করে, সেটাই নারীর পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদের সবচেয়ে ইতিবাচক ফলাফল। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও এই মুক্তির স্বাদ তাকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। ৮টি পাঠ্যেই আনন্দের প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখা যায়, আমাকে চাই, সাতকাহন, সাদা বেড়াল কালো বেড়াল, শ্যাওলা, ধূলিবাস, রণক্ষেত্র, দিন যায় রাত যায় ও শীর্ষবিন্দুতে।'[১৬]

পারুলের স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে ভিন্ন পটভূমিতে, তার সামাজিক অবস্থানও ভিন্নতর, তবু সম্পর্কের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে জীবনকে নতুনদৃষ্টিতে দেখেছে সে, পারুল বাঁচতে চেয়েছে 'নিজের শর্তে'।

১৯৯২ সালে বাংলাদেশের পটভূমিতেই প্রকাশ পেয়েছিল তসলিমা নাসরিনের *শোধ*, একলা মেয়ের জীবন সংগ্রাম ও প্রতিশোধের উপন্যাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ঝুমুর ভালোবেসে বিয়ে করেছিল হারুনকে, বিয়ের পর স্বামীর ভিন্ন চেহারা দেখেছিল সে। শ্বশুরবাড়িতে সে প্রায় বন্দিনী, এমনকি তার প্রথম সন্তানকে গর্ভেই হত্যা করেছিল স্বামী মিথ্যে সন্দেহে। এতখানি অপমানের পরেও ঝুমুর বিবাহবিচ্ছেদ চায়নি, সমাজে বিবাহবিচ্ছিনাদের পরিণতি তার কাছে খুব ইতিবাচক নয়। স্বামীর অজ্ঞাতে নিচের তলার ভাড়াটে চিত্রকর আফজলের 'প্রচণ্ড পৌরুষ'-এর কাছে নিজেকে সঁপে সন্তান ধারণ করেছে ঝুমুর। হারুন সেই সন্তান আনন্দকেই নিজের সন্তান বলে আঁকড়ে ধরেছে। ঝুমুরের অভিজ্ঞতার সূত্রে নারী জীবনের বহুমাত্রিক সত্যকে তুলে ধরেছেন তসলিমা। উপন্যাসের শেষে ঝুমুরের ভাবনা–

> 'আনন্দের জন্মের জন্য আমার কোনও অপরাধবোধ নেই। আমাকে অপমান করার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। এত নগণ্য তুচ্ছ মানুষ নই আমি যে একজন আমার গালে অযথা চড় কষাবে, আর আমি হজম করব তা, একজন আমাকে ধুলোয় মেশাবে আর আমি তাকে মাথায় তুলে পুজো করব। আনন্দকে যখন বাপ বাপ বলে

হারুন আদর করে আমার ভেতরে তখন সুখের ফোয়ারা ওঠে। সেই যে হারুনের অবিশ্বাসের আগুনে আমি পুড়েছিলাম, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন পুড়েছিলাম, সেই আগুন, আমাকে পোড়ানো আগুন এখন আমি সুখের জলে নেভাই।'[১৭]

মতিজান বা পারুলের অবস্থান ঝুমুরের চেয়ে অনেকখানি আলাদা। কিন্তু স্বামী বা সংসারে তাদের একইভাবে অপমানিত হতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থেকে নিরক্ষর বধূ, সমাজ তাদের কাছে একইভাবে সতীত্বের দাবি জানায়। ঝুমুর প্রতিশোধ নিয়েছে গোপনে, কৌশলে। সে নাগরিক শ্রেণির প্রতিনিধি। অন্যদিকে গ্রামের দরিদ্র বধূ মতিজান বা পারুল, তাদের মনের জ্বালাপোড়া কিংবা প্রতিশোধস্পৃহা ঝুমুরের চেয়ে কম নয়, এবং প্রকাশভঙ্গি আরও স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। ঝুমুরের প্রতিবাদ যেখানে ব্যক্তিগত তৃপ্তি আনে মাত্র, মতিজান বা পারুল সেখানে সমাজে আলোড়ন তোলে। ঝুমুর তার জীবনের সত্যকে আড়াল করেছে, আর এই দুই নারীর কাছে সেই সত্যই তাদের শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে। মতিজান স্বামীকে অস্বীকার করেই সন্তান ধারণ করেছে, আর স্বামী-পরিত্যক্তা পারুল সন্তানকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু অস্বীকার করেছে সেই ব্যাভিচারী পুরুষদের পিতৃত্বকে, তাই পারুল বা মতিজান শুধু একলা-মা কিংবা 'অপরাজিতা'ই নয়, ভিন্ন এক নারীবিশ্বের সৃজনশিল্পী হিসেবেও চিহ্নিত করা যায় তাদের।

সূত্র সংকেত

১. প্রতিভা বসু, *মহাভারতের মহারণ্যে*, বিকল্প, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ৫৩

২. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *কৃষ্ণা কুন্তী কৌন্তেয়*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮, একাদশ মুদ্রণ, ২০১৪, পৃ. ৩৮

৩. ঈলীনা বণিক, 'কুন্তীকথা' (প্রবন্ধ), *রোববার*, *সংবাদ প্রতিদিন*, ২০.০৭.২০০৮, পৃ. ১৬

৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'সেলিনামঙ্গল' (প্রবন্ধ), *প্রথম আলো*, ১৬.০৬.২০১৭ । (অন্তর্জাল)

৫. তদেব

৬. হাসান আজিজুল হক, *আগুনপাখি*, দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ২৯

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দেনাপাওনা', *রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খণ্ড*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, ২০১৪, পৃ. ২২

৮. তিলোত্তমা মজুমদার, *প্রেতযোনি*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৮, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ১২৭

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দেনাপাওনা', *রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খণ্ড*, পশ্চমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, ২০১৪, পৃ. ২৪

১০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *লালসালু*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১০, পৃ. ১২৬

১১. নবনীতা দেবসেন, 'হবে নাকি একটু কুন্তীগিরি', *ভালোবাসার বারান্দা ২য় খণ্ড*, দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ৬৫

১২. উষসী চক্রবর্তী, *মেয়েঘেঁষা লেখারা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ৫১

১৩. সেলিনা হোসেন, 'আমি ও আমার সময়' (প্রবন্ধ)। পরোক্ষ তথ্য সংগৃহীত- তপোধীর ভট্টাচার্য, *কথাপরিসর :*

বাংলাদেশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ১৯৭

১৪. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, *কাছের মানুষ*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮, দ্বাদশ মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ১৬৬

১৫. তদেব, পৃ. ৬২১

১৬. মল্লিকা সেনগুপ্ত, *বিবাহবিচ্ছিন্নার আখ্যান বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রতিভাস প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ১৫৮

১৭. তসলিমা নাসরিন, *শোধ*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ২০০২, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৮, পৃ. ১৩৯

আকর গ্রন্থ

১. সেলিনা হোসেন, 'পারুলের মা হওয়া', *পঞ্চাশটি গল্প*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৪

২. সেলিনা হোসেন, 'মতিজানের মেয়েরা', নবনীতা দেবসেন (সম্পাদনা), *সই*, লালমাটি, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪২২

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 51-62

নোয়াম চমস্কির অন্বয়তত্ত্ব ভাবনার কয়েকটি দিক ও বাংলা বাক্য

ড. বিপ্লব দত্ত

ড. বিপ্লব দত্ত
সহকারী অধ্যাপক
ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: biplab38@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাক্যের ধারণা সংস্কৃত ব্যাকরণে আমরা পাই মূলত স্ফোটবাদী বৈয়াকরণদের ভাবনাচিন্তায়। কিন্তু পাণিনি প্রমুখের আলোচনায় যখন পদনির্মিতির প্রসঙ্গ আসে তখন বাক্যের ধারণা চলেই আসে। কতকগুলি ধ্বনির সমবায়ে গঠিত একটা শব্দ সবসময় পূর্ণ ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই আমরা শব্দগুলিকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কতকগুলি বিভক্তি জুড়ে একটা পদগুচ্ছ এবং একাধিক পদগুচ্ছ জুড়ে একটি বাক্য রচনা করি। একটি বাক্য বলার পর মনের ভাবপ্রকাশ সন্তোষজনক হলে ক্ষণিক বিরতি নিই বা লেখায় একটা যতি চিহ্ন বসিয়ে দিই। সবটাই একটা নির্দিষ্ট অনুশাসন মেনে চলে। যেহেতু আমাদের কাছে দুটি আদর্শ আছে একটি সংস্কৃত ও অন্যটি পাশ্চাত্ত্য (সেটা লাতিন বা ইংরাজি হতে পারে) তাই আমরা কোনটিকে গ্রহণ করবো? কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা এই দুটি পৃথক আদর্শের দ্বারাই কমবেশি প্রভাবিত হয়েছি। যদিও এটি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্যের ব্যাকরণ ভাবনা প্রথাগত ভাবনাচিন্তা ছাড়িয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। এরপর যার কথা বলতেই হয় তিনি নোয়াম চমস্কি, বিশ শতকের ব্যাকরণ ভাবনা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে অনেকগুলি তত্ত্ব তিনি আমাদের সামনে হাজির করেছেন। যে ভাষা আমাদের কাজের ভাষা (সেটা মাতৃভাষাও হতে পারে, কিছুক্ষেত্রে যখন কোনো ভাষা কাজের ভাষা হয়ে উঠতে পারে না তখন সেই ভাষায় আমাদের বাক্য সঞ্জননের দক্ষতা কমে যায়) সেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ দিয়ে যত ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা বাক্য রচনা করতে পারি। উদ্দেশ্য- বিধেয় ভিত্তিক বাক্য বর্ণনা এবং সাংগঠনিক ব্যাকরণে 'যত ইচ্ছা' বাক্যের ব্যাখ্যা সম্ভব নয় বলেই এল সঞ্জননী তত্ত্ব। এই আলোচনায় চমস্কির মাত্র কয়েকটি তত্ত্ব, বিশেষ করে সঞ্জননী তত্ত্বের প্রসঙ্গ এসেছে যেগুলি দিয়ে একটু অন্যভাবে বাংলা বাক্যের আন্বয়িক সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

উদ্দেশ্য, বিধেয়, বাক্যের অব্যবহিত উপাদান, বৈপরীত্য ও প্রতিকল্পন, চমস্কি, ফ্রেজ স্ট্রাকচার রুল, এক্স বার, থীটা রোল

ভূমিকা

পাণিনি[১] ও তাঁর অনুসারী বৈয়াকরণেরা শব্দ-রূপতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন, পদনির্মিতি যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁরা বলেছেন (সুপতিঙন্তম্‌পদম্‌) সুপ্‌ ও তিঙ্‌এই বিভক্তিগুলির সমন্বয়ে পদ নির্মিত হয়। প্রাতিপদিক ও ধাতুর পর এই বিভক্তিগুলি জরুরি হয়ে পড়ে তখনই, যখন বাক্য নির্মাণের প্রসঙ্গ আসে। অর্থাৎ পদনির্মিতির সূত্রাবলী সেই অর্থে বাক্যের বিষয়ও বটে। তাই বলা যেতে পারে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকেরা পদবাদী হলেও বাক্যের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্যদিকে স্ফোটবাদী বৈয়াকরণেরা বাক্যবাদী, তাঁরা পদান্তরের সঙ্গে একটি পদের সম্পর্কের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। বাক্য কী? এর সংজ্ঞা কী হবে? এই নিয়ে নানা মতামত পাওয়া যায়। সব থেকে যে সংজ্ঞাটি প্রচলিত তা বিশ্বনাথ কবিরাজের, তিনি বলেছেন- 'বাক্যংস্যাদযোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়'। অর্থাৎ বাক্যে যোগ্যতা[২] (অর্থগতভাবে সুসঙ্গত বিন্যাস), আকাঙ্ক্ষা[৩] (সহাবস্থানযোগ্য শব্দের ব্যবহার) ও আসত্তি (শব্দসমূহের পারস্পরিক নির্ভরতা) থাকবে। ইংরাজি ভাষায় বাক্যের অনেক সংজ্ঞা পাওয়া যায়, যেমন- ফকনার[৪] বলেছেন- 'বাক্য হচ্ছে শব্দসমবায়, যা এক বা একাধিক বোধের সমবায়ে গঠিত, যা অন্তত একটি পূর্ণভাব জ্ঞাপন করে'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২০০৩: ৩৬২) 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ বাক্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন– 'যে পদ বা শব্দ সমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে বক্তার ভাব সম্পূর্ণ-রূপে প্রকটিত হয়, সেই পদ- বা শব্দ-সমষ্টিকে বাক্য বলে'। সঞ্জননী ব্যাকরণে বাক্যের আলোচনায় ভাষার নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়।

সঞ্জননী তত্ত্বের ধারণাটিকে যিনি ভাষাবিজ্ঞানের জগতে পরিচয় করালেন, তিনি নোয়াম অ্যাব্রাম চমস্কি (Noam Avram Chomsky)। চমস্কি নির্দেশিত অন্বয়ের কাঠামো বুঝে নেওয়ার আগে প্রথাগত ও সাংগঠনিক বাক্যতত্ত্বের সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথাগত বাক্যতত্ত্বে বাক্যের দুই ধরনের উপাদানের কথা বলা হয়, তা হল উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যেমন-'শ্যামল ফুটবল খেলছে' (১)। এই বাক্যে 'শ্যামল' উদ্দেশ্য[৫] 'ফুটবল খেলছে' হল বিধেয়। প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যকে দুইভাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এক গঠনগত শ্রেণি, যেখানে কতগুলি উপবাক্য আছে ও তার বিন্যাস বিচার্য হয়, এই দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার সরল বাক্য জটিলবাক্য ও যৌগিকবাক্য। দুই অর্থগত শ্রেণি। অর্থ অনুসারে বাক্যকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, সেগুলি হল- নির্দেশ-সূচক বাক্য, প্রশ্নবাচক বাক্য, ইচ্ছাসূচক বাক্য, আজ্ঞাসূচক বাক্য, কার্যকারণাত্মক বাক্য, সন্দেহদ্যোতক বাক্য ও বিস্ময়াদিবোধক বাক্য। সরলবাক্যে এক বা একাধিক উদ্দেশ্যপদ থাকলেও বিধেয়পদ একটিই থাকে। যেমন– 'সীতা, কমল, বিমল ও তার বন্ধুরা আজ সিনেমা দেখতে যাবে'(২), এই বাক্যে উদ্দেশ্যপদ একাধিক[৬] হলেও বিধেয়পদ একটি। প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে[৭] সরলবাক্য সম্পর্কে বলা হয়েছে– "এই যুক্তিতে সেই বাক্যকেই সরলবাক্য বলতে হবে যার মধ্যে অসমাপিকান্তক কোনো বাক্য নেই এবং যার সমাপিকাটি একটি অখণ্ড ক্রিয়ারূপে অনুভূত"। তাছাড়া সরলবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়-র প্রসারক ও বিধেয়-র সম্পূরকও থাকতে পারে। জটিলবাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য ও একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য থাকে। যেমন- 'যে প্রচুর পরিশ্রম করে সে খুব বেশি সফল হয়'(৩)। এখানে 'সে খুব বেশি সফল হয়' হল প্রধান খণ্ডবাক্য এবং 'যে প্রচুর পরিশ্রম করে' হল অপ্রধান খণ্ডবাক্য। যৌগিকবাক্যে এক বা একাধিক প্রধান খণ্ডবাক্য অব্যয় সহযোগে যুক্ত হয়। যেমন- 'আমি বেশ ভালোই আছি আর খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি'[৮] (৪)। এই বাক্যে দুটি প্রধান খণ্ডবাক্য 'আর'-এই অব্যয়টি দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি বাক্যের চেহারা নিয়েছে। এই রকম

আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের একটি বাক্য যেমন– 'আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিসঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না' (৫)। এটিও একটি যৌগিক বাক্য।

ব্লুমফিল্ড, হ্যারিস, ফ্রিজ, গ্লিসন, হকেট প্রমুখেরা সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান রূপমূলকে নিম্নতম ভাষা বস্তুরূপে গ্রহণ করে 'বৈপরীত্য'(contrast) ও 'প্রতিকল্পন'(substitution)-এর সাহায্যে বাক্যের বর্ণনা করা হয়[৯]। তাঁরা মূলত বাক্যের অর্থকে অস্বীকার করে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বাক্যের সংগঠনকে বা রৌপ বর্ণনাকে। সংগঠনবাদীরা মূলত এই ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন-

১। রূপমূল ও পদসমূহের বণ্টন[১০]
২। অব্যবহিত উপাদানের বণ্টন

হ্যারিস রূপমূল ও রূপমূল পরম্পরার-র বণ্টনের মাধ্যমে বাক্য বর্ণনা করেছেন এবং ফ্রিজ পদসমূহের বণ্টনের মাধ্যমে বাক্যের বর্ণনা করেছেন। প্রতিকল্পন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রূপমূল শ্রেণি নির্ধারণ করা হয়। যেমন- 'একটি ঘোড়া দৌড়াচ্ছে'(৬)। এই বাক্যে ঘোড়ার বদলে যদি 'ছেলে', 'বিড়াল', 'কুকুর' যাই বলা হোক না কেন বাক্যের চেহারা বদলায় না। অর্থাৎ এই শব্দগুলি একই শ্রেণিভুক্ত হবে। ফ্রিজ বলেছেন বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় শব্দের নিজস্ব অর্থ ও সাংগঠনিক অর্থের সমন্বয়ে। মূলত যে সমস্ত শব্দগুলি একই পরিবেশে ব্যবহৃত হয় তাদের একধরনের গঠক শ্রেণিতে (ফর্ম ক্লাস) বিন্যস্ত করেন। তাঁর মতে এই গঠক শ্রেণি দুই প্রকার- প্রধান ও অপ্রধান। প্রধান শ্রেণিকে সংখ্যার মাধ্যমে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন যা মূলত বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ ও কালবাচক শব্দ। বাক্যে গঠনের (Construction) উপাদানগুলি (Constituent) পারস্পরিক সহাবস্থানে থাকে, এগুলিই অব্যবহিত উপাদান (Immediate Constituent)। একটা বাক্যকে দুটি বা একাধিক অর্থপূর্ণ উপাদানে ভাগ করা যায়। উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিত করার জন্য ধাপে ধাপে দুটি ধারায় ভাগ করতে করতে একক উপাদানে অর্থাৎ শব্দে পৌঁছানো যায়। এবং শেষ স্তরে এসে যা পাওয়া যায় তা হল শব্দ, যাকে চরম উপাদান (Ultimate Constituent) বলা হয়। ব্লুমফিল্ড অব্যবহিত উপাদান-এর কথা প্রথমে বলেছেন যা হ্যারিস, ফ্রিজ প্রমুখেরা গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি আরো গুরুত্ব পেয়েছে চমস্কি প্রমুখ সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানীদের দ্বারা। যেমন 'ওই লম্বা কালো ছেলেটা লোকটাকে মারছিল'(৭), একটি বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে এই বাক্যটির অব্যবহিত উপাদানগুলিকে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

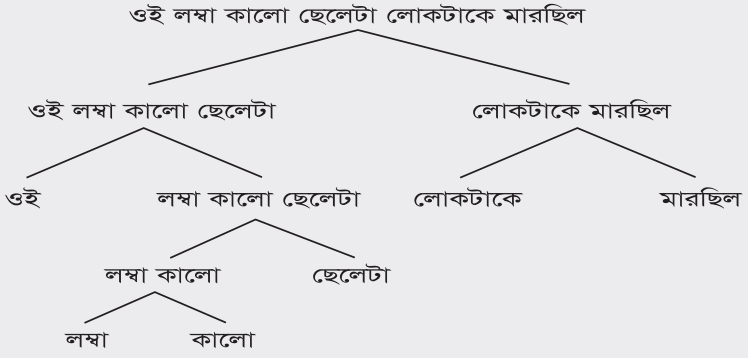

এই বৃক্ষচিত্রে প্রথম স্তরে দুটি উপাদান যেমন অব্যবহিত উপাদান তেমনি পরবর্তী স্তরে চারটি ও তার পরের দুটি উপাদানকেও অব্যবহিত উপাদান বলতে হবে সবশেষে যে বাকি থাকে সেই দুটি অর্থাৎ 'লম্বা' ও 'কালো' চরম উপাদান।

২

সাংগঠনিক ব্যাকরণ কিছু সীমিত সংখ্যক সূত্রের (Rule) সাহায্যে সীমিত সংখ্যক বাক্যের ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু ভাষার সীমাহীন সৃষ্টিশীলতা ব্যাখ্যার উপায় সেখানে নেই, সঞ্জননী তত্ত্বের সাহায্যে যা ব্যাখ্যা করা গেল। ১৯৫৭ সালে চমস্কি তাঁর 'Syntactic Structure' গ্রন্থে যে তত্ত্বটি তিনি প্রকাশ করেন তার মাধ্যমেই 'সঞ্জননী তত্ত্বের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। পরবর্তীকালে ১৯৬৫ সালে Aspect of the theory of Syntax', ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'Lectures on Government and Binding' এবং 'The Minimalist Program' যা ১৯৯৫ সালে প্রকাশ করেন। চমস্কির Aspect theory -কে Standard theory-বলা হয়, পরবর্তীকালে এই তত্ত্বেরই পুনর্বার সংস্কার সাধন করে তৈরি করেন Extended Standard Theory এবং এই theory-কে Revised Extended Standard theory বলা হয়।

চমস্কি সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার গ্রন্থে প্রথম Phrase Structure Rule এর কথা বলেন। অন্বয়ের স্তরে বাক্যিক উপাদানগুলি নির্দিষ্ট ক্রমে সূত্রবদ্ধ হয়। সূত্রগুলি হল–

S=NP+VP
NP=Det+N
VP=V+NP(Det+N)
N (Ram, Ball, Bus etc)
Det (The)
V (Put, Hit, Play etc)

বাংলা ভাষায় Determiner-হিসাবে 'টি' প্রত্যয়টিকে বিবেচনা করা যায় কিনা ভাবা দরকার, শিশির ভট্টাচার্য(২০১৩:৯১) এগুলোকে অবধারক বলেছেন। যেমন- 'গাছটিকে কাটা হল'(৮) এখানে 'গাছটি' পদের সঙ্গেই নির্দিষ্টবাচকতা প্রকাশের জন্য 'টি' বসেছে। সেই সঙ্গে P S Grammar-এর আরো একটি উদাহরণ বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেওয়া যায়–

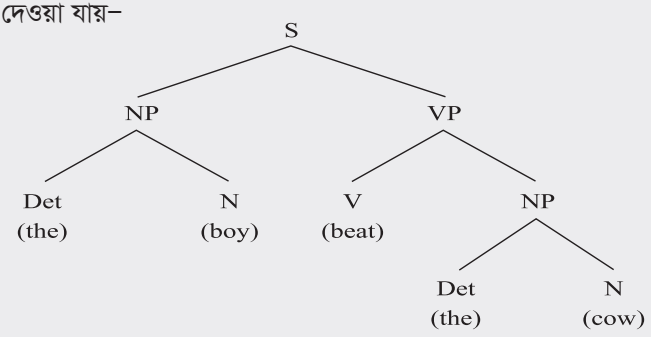

এই পদগঠনের কাঠামো পুরোপুরি তিনি তাঁর ১৯৬৫ সালে Aspect of the theory of Syntax গ্রন্থে না গ্রহণ করলেও, নিয়েছেন পদগঠনের সূত্র ও চিহ্নগুলি। এখানেই তিনি প্রথম বললেন যে বাক্য গঠনের নিয়মাবলি রক্ষিত আছে মানুষের ভাষার-অধিকার বা ভাষাক্ষমতা (competence)-র মধ্যে। কোন শব্দ কিভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হবে তা আমাদের Competence-ই বলে দেয়। আবার আমরা যখন ভাষা ব্যবহার করি তখন তা হয় Performance, এক কথায় ভাষা ব্যবহারকেই Performance বলে। কোনও বাক্য ব্যাকরণগত ভাবে ত্রুটিযুক্ত কিন্তু তা আমরা বুঝতে পারি, Competence-ই তা আমাদের বুঝিয়ে দেয়। এই Competence-কে তিনি পরবর্তীকালে ও language (Internal Language) ও Performance-কে E Language (External Language) বলেছেন। তিনি সঞ্জনন প্রক্রিয়ার তিনটি পর্যায়ের অনুমান করেছিলেন, তিনি নাম দিয়েছিলেন Base Component, Transformational Component, Phonological Component। যাকে পবিত্র সরকার যথাক্রমে ভিতঘর, সংবর্তনঘর ও ধ্বনিসংস্থানঘর বলেছেন (২০১৩:৮৭)। একটা বাক্য সঠিকভাবে উচ্চারিত হওয়ার আগে একটি প্রাথমিক কাঠামো তৈরি হয় যা বাক্যের অধোগঠন। এই অধোগঠনের স্তরের বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার আগে সংবর্তনের নিয়ম প্রযুক্ত হয় এবং তা যায় অধিগঠনের স্তরে। তার পরেও বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার উপযুক্ত হয়নি, তাই তার সঙ্গে ধ্বনি সংস্থানের নিয়মাবলি যুক্ত হয় এবং তার পরে বাক্যটি উচ্চারিত হয়। অনেক সময় বাক্যস্থ উপাদানগুলি তাদের নিজস্ব বাস্তু এলাকা পরিবর্তন করে বামদিকে বা ডানদিকে সরে যায়। যেমন-

আকাশ স্পিলবার্গের সিনেমা দেখছে (৯)
স্পিলবার্গের সিনেমা আকাশ দেখছে (১০)

শেষ বাক্যটিতে 'স্পিলবার্গের সিনেমা' তার বাস্তুভিটা ত্যাগ করে বামদিকে নতুন স্থানে বসেছে। বাক্যস্থ কোনও উপাদান যখন স্থান পরিবর্তন করে তখন সে সব কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায়। এটাকেই Movement বলে, বাংলায় অভিবাসন বলা হয়। এই অভিবাসন যে কোনও উপাদানের ক্ষেত্রে হতে পারে, তাই একে ধ্রুবক ধরা হয়। এক কথায় বলা হয় মুভ আলফা। সাহিত্যের ভাষায় অভিবাসনের বেশ প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন–

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'(১১)

'আমি হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'(১২)

শেষ বাক্যে দেখা যায় 'হাজার বছর ধরে' তার নিজস্ব বাস্তুভিটায় অবস্থান করছে। কারণ বাংলায় ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার আগে বসে, এটাই নিয়ম কিন্তু কবি জীবনানন্দ দাশ বামদিকে কর্তার আগে নিয়ে এলেন।

বাক্য সঞ্জননের নিয়মাবলি Aspect of the Theory of Syntax, GB Theory I Minimalist Programme-অনুসরণে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে।

এক্স বার কাঠামো

সঞ্জননী বাক্যতত্ত্বে X″ দ্বারা বাক্যের গঠন বর্ণনা করা হয়। গাছের যেমন শাখা প্রশাখা হয় তেমনি X″ বৃক্ষের মতোই নানা শাখা প্রশাখার সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- A থেকে B ও C এর উৎপত্তি হলে B ও C-র ওপর

কর্তৃত্ব করছে A। আবার যদি C থেকে D ও E-র উৎপত্তি হয় তাহলে D ও E-র ওপর কর্তৃত্ব করবে C। তাহলে বৃক্ষচিত্রটি এরকম হবে–

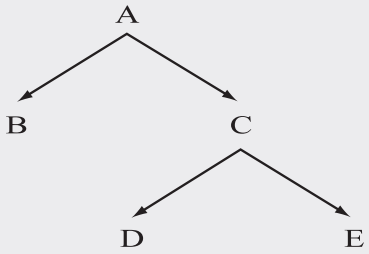

এরকম ভাবে X″ কাঠামোতে X″ , X′ ও X° -এই তিনটি স্তরের কল্পনা করা হয়। যেখানে X″ কর্তৃত্ব করছে X′-এর ওপর এবং X′ কর্তৃত্ব করছে X° -এর ওপর। কাঠামোটি দেখে নেওয়া যেতে পারে–

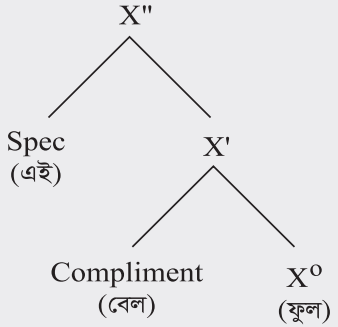

উক্ত বৃক্ষচিত্রটি একটি ঘচ। Noun-এর বামদিকে Compliment যুক্ত হয়ে X। গঠিত হয়েছে। আবার X।-এর বামপাশে Specifier বা নির্ধারক যুক্ত হয়ে X।। বা XP গঠিত হয়েছে। উক্ত বৃক্ষচিত্রের শির হল 'ফুল'। 'ফুল' পদটিই এখানে মূল পদ। যেহেতু 'ফুল' একটি Noun তাই এটি Noun phrase। Modifier কোনো বর্গ বা Phrase-এর অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নয়, বাক্যের প্রসারতা দান করাই এর উদ্দেশ্য। Phrase এ Modifier যুক্ত হলে বৃক্ষচিত্রটি যে রূপ নেয় তা নিম্নরূপ–

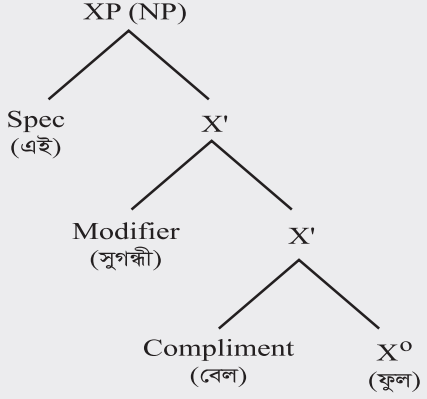

এই চিত্রে শির (head) হল 'ফুল'। এটি একটি Noun Phrase। এখানে modifier হল 'সুগন্ধী'। কিন্তু 'সুগন্ধী'-র স্থানে যদি Noun বা Noun Phrase ব্যবহার করতে হয় তাহলে বাংলার ক্ষেত্রে '-র' বিভক্তি নিয়ে আসতে হবে। যেমন–

এই বাগানের গাছের বেল ফুল

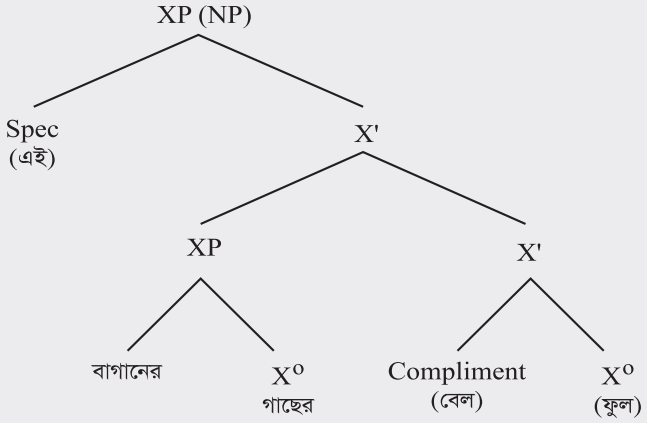

এরকম একটি Verb Phrase-এরও উল্লেখ করা যায়–

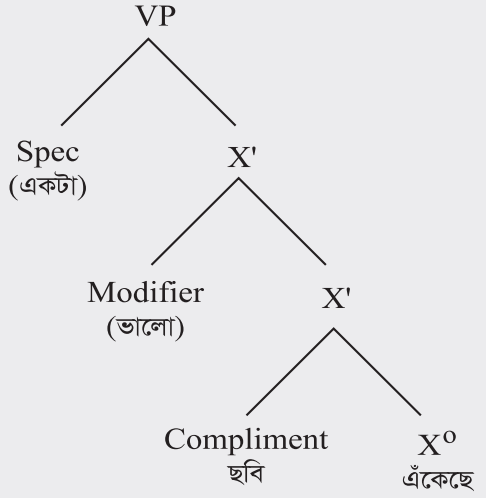

প্রতিটি ক্রিয়া কতগুলি Compliment নেবে, তা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন, এই বৃক্ষচিত্রের 'এঁকেছে' ক্রিয়া পদটি একটি Compliment নিচ্ছে। অর্থাৎ compliment-গুলির কিছু Projection principle আছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেমন- দেওয়া, নেওয়া ইত্যাদি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি Compliment অনিবার্যভাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কাউকে কিছু দেওয়া বা কারো থেকে কিছু নেওয়া বোঝাতে দুটি Compliment ব্যবহৃত হয়।

সঞ্জননী বাক্যতত্ত্বে Case(কারক) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Noun বা নামপদের কারক থাকবেই না হলে তা নামপদই নয়। যদি কারক না থাকে তাহলে পদ Case filter বা কারক ছাঁকুনি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সঞ্জননী ব্যাকরণে Case filter একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চমস্কি[১১] বলেছেন–

'NP if NP has Phonetic content and has no Case'

এ প্রসঙ্গে শিশির ভট্টাচার্য[১২] আরো বলেছেন যে কারক যদি ধ্বনিস্তরের ব্যাপার হয়, তাহলে কারক ও বিভক্তি সমার্থক। সেইজন্য ধরে নেওয়া যায় চমস্কির কারক ও পাশ্চাত্য কারক আলাদা নয়।

θ Role

θ role বাক্যের অগভীর স্তরে সম্পন্ন হয়। মূলত বাক্যের অন্তর্গত নামপদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল θ role। নোয়াম চমস্কির মত অনুযায়ী প্রত্যেকটি Argument-এর একটি θ role থাকে আর এর দ্বারা একটিই বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। θ role বাংলা কারকের কিছু সমস্যা মেটানো যায়, যেমন–

রাম স্কুলে আছে (১৩)

রাম স্কুলে যাচ্ছে (১৪)

১৩ ও ১৪ নম্বর বাক্য দুটির মধ্যে কিছু অর্থগত পার্থক্য আছে। θ role অনুযায়ী ১৩ নম্বর বাক্যের 'স্কুলে' পদটিকে Location বলা হয়। ১৪ নম্বর বাক্যের 'স্কুলে' পদটিকে Goal বলা হয়। একই রকম ভাবে Subject কখনো Agent হয় কখনো আবার Experiencer হয়। যেমন–

রহিম বই পড়ছে (১৫)

রহিমের চা ভালো লাগে (১৬)

১৫ নম্বর বাক্যের 'পড়া' কাজটি 'রহিম' করছে, তাই রহিম Agent। অন্যদিকে ভালোলাগা ক্রিয়াপদটির কর্তা 'রহিম' হলেও কাজটির ওপর কর্তার নিয়ন্ত্রণ কম, তাই পদটি Experiencer। কয়েকটি বাংলা কারকের সঙ্গে θ Role মিলে যায়। যেমন–

Source- অপাদান কারক

Goal- অধিকরণ কারক

Instrument-করণ কারক

Location-অধিকরণ কারক

এই দিক থেকে θ Role-এর সঙ্গে কারকের কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে শিশির ভট্টাচার্য[১৩] বলেছেন–

'কবিগুরুর আশীর্বাদ ফলিয়া গিয়াছে! সহস্র সঙ্ না হউক কর্মকারকের গর্ভ হইতে Goal, Patient, Percept, Benefactive এই চারিটি এবং কর্তৃকারকের গর্ভ হইতে Agent, Experiencer এই দুইটি সঙ জন্ম গ্রহণ করিয়া বেশ কিছুকাল যাবৎ θ ভূমিকায় অভিনয় করিতেছে।'

মোট ১১টি θ Role পাওয়া যায়, সেগুলি হল–

Agent
বিকাশ ফুটবল খেলে (১৭)
আমি ভাত খাই (১৮)

Experiencer
আমার চা ভালো লাগে (১৯)
সীতার রমাকে ভালো লাগে (২০)

Patient
শিক্ষক **ছাত্রকে** বকলেন (২১)
মা **ছেলেকে** দুধ খাওয়াচ্ছে (২২)

Recipient
রাম **রহিমকে** টাকা দিলেন (২৩)
মা **আমায়** চিঠি লিখেছে (২৪)

Theme
গরু **ঘাস** খায় (২৫)
তুমি **জল** আন (২৬)

Instrument
পুলিশ **লাঠি দিয়ে** চোরটাকে মারল (২৭)
শ্যামলী **চামচ দিয়ে** ভাত খায় (২৮)

Benefactive
মা **দিদির জন্য** শাড়ি কিনেছে (২৯)
শ্যামল **টাকার জন্য** চাকরি নিয়েছে (৩০)

Source
গাছ থেকে ফল পড়ে (৩১)
অপরাধী **জেল থেকে** ছাড়া পেল (৩২)

Location
কমল **বাড়িতে** আছে (৩৩)
আকাশে ঘুড়ি ওড়ে (৩৪)

Goal
কমল **কলকাতা** যাচ্ছে (৩৫)
আমি **বাড়ি** যাচ্ছি (৩৬)

Percept
কমলা **ভূতে** ভয় পায় (৩৭)
আমি **বজ্রপাতে** ভয় পাই (৩৮)

চমস্কি ও চমস্কি পূর্ববর্তী অন্বয়তত্ত্বের কয়েকটি দিক পর্যালোচনা করে তার নিরিখে বাংলা বাক্যের গঠন পর্যালোচনা করা হল। প্রথমে বর্ণনামূলক ব্যাকরণ তার পরে সাংগঠনিক ব্যাকরণ এবং শেষ পর্যন্ত সঞ্জননী ব্যাকরণের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে অন্বয়তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। চমস্কির তত্ত্বগুলির ভিত্তি কিন্তু ব্যাকরণসম্মত গ্রহণযোগ্য বাক্য। যে কোনো তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তা কতটা প্রাসঙ্গিক তার ওপর। নোয়াম চমস্কির অন্বয়তত্ত্ব বিষয়ে এখন পর্যন্ত বহু গবেষণা হয়েছে। বলাবাহুল্য তাঁর তত্ত্ব বিশ ও একুশ শতকের ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই আলোচনা আরও বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন আছে।

তথ্যসূত্র

১. সঞ্জননী তত্ত্বের আলোচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের (যদিও এই বিষয়টি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে) প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক, কারণ চমস্কি (১৯৬৫:ঠ) মনে করেছেন-"Panini's grammar can be interpreted as a fragment of such a "generative grammar," in essentially the contemporary sense of this term."

২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Compatibility' বা 'Propriety' অর্থে 'যোগ্যতা'কে বুঝিয়েছেন অন্যদিকে হুমায়ুন আজাদ 'Selectional Restriction' অর্থে গ্রহণ করেছেন। যদিও দুটি অর্থের মধ্যে কোনও সংঘাত নেই (চট্টোপাধ্যায় ২০০৩: ৩৬৩) (আজাদ ২০১০:২২)

৩. হুমায়ুন আজাদ আকাঙ্ক্ষার অর্থ বলতে বুঝিয়েছেন Co-occurrence Restriction'-কে, আবার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন আকাঙ্ক্ষার অর্থ 'Expectancy' (চট্টোপাধ্যায় ২০০৩: ৩৬৩) (আজাদ ২০১০:২২)

৪. (দ্রঃ আজাদ ২০১০: ২৪

৫. 'উদ্দেশ্য' আসলে ইংরাজির 'সাবজেক্ট' তা সংস্কৃতের 'কর্তা' নয়, সংস্কৃতের কর্তা আর ইংরাজির সাবজেক্ট অনেকসময়ই আলাদা হতে পারে।

৬. এই উদ্দেশ্যটিকে compound subject হিসাবে ধরা যেতে পারে।

৭. ইসলাম ও সরকার (সম্পা)২০১২:৩৪৮

৮. ইসলাম ও সরকার (সম্পা)(২০১২:৩৮৩)

৯. দ্রঃ আজাদ (২০১০:১০৯)

১০. আজাদ (২০১০:১১০) এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'বণ্টনিক বাক্যবর্ণনা কৌশল'

১১. Chomsky (১৯৮৮:৪৯

১২. ভট্টাচার্য (১৯৯৮: ১১৩)

১৩. ভট্টাচার্য (১৯৯৮: ১১৫)

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ২০১০, *'বাক্যতত্ত্ব'* , ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা), ২০১১, *বাঙলা ভাষা* (প্রথম খণ্ড), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা), ২০১১, *বাঙলা ভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

ইসলাম, রফিকুল ও সরকার, পবিত্র (সম্পা),২০১২, *'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ'* (প্রথম খণ্ড), ঢাকা: বাংলা একাডেমী

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ২০১২, *'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন'*, কলকাতা: দেজ

ঐ , ২০১৬, *'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ'*, কলকাতা: দেজ

ঐ ও চক্রবর্তী, নীলিমা, ২০১৬, *'ভাষাবিজ্ঞান'*, কলকাতা: দেজ

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ২০০৩, *'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'*, দিল্লী: রূপা

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, ২০১৩, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

দাশগুপ্ত, প্রবাল, ২০১২, *'ভাষার বিন্দুবিসর্গ'*, কলকাতা: গাঙচিল

দাক্ষী, অলিভা, ২০০৩, *বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান*, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

দাস, করুণাসিন্ধু, ২০১২, *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ*, কলকাতা : সদেশ

বেগম, রাশিদা, ১৯৯৯, *বাংলা অনুসর্গের গঠন-প্রকৃতি ও বাক্যে অনুসর্গের ভূমিকা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী

ভট্টাচার্য, শিশির, ২০১৩, *'অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ'*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী

ঐ , ১৯৯৮, *সঞ্জননী ব্যাকরণ'* , ঢাকা: চারু

মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব, ২০১২, *'স্কিনার চমস্কি ভাষাবিজ্ঞান'*, কলকাতা: পাবলভ

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর, ২০০৭, *'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব'*, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ

শ, রামেশ্বর, ১৪০৩, *'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা'*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, ২০০৮, *'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স

সরকার, পবিত্র, ২০০৬, *'বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ'*, কলকাতা: দেজ

ঐ , ২০১৩, *'চমস্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান'*, কলকাতা: পুনশ্চ

ঐ , ২০১১, *'পকেট বাংলা ব্যাকরণ'*, ঢাকা: পাঞ্জেরী

Chomsky, Noam, 1957, *Syntactic Structures,* Berlin: Mouton de Gruyter

Chomsky, Noam, 1965, *Aspects of the Theory of Syntax,* Massachusetts:MIT Press

Chomsky, Noam, 1988, *Lactures on Government and Binding,* Holland: Foris Publications

Carnie, Andrew, 2007, *Syntax: A Generative Introduction,* UK: Wiley Blackwell

Valin Jr, Robert D Van, 2001, *An Introduction to Syntax,*UK: Cambridge

Thakur, D, 2011, *Linguistics Simplified Syntax,* New Delhi: Bharati Bhawan

Verma, S.K & Krisnaswami, N, 2010, *Modern Linguistics: An Introduction,* Oxford: New Delhi

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 63-74

বাউল দর্শনে লালনের মানবতাবাদ : একটি পর্যালোচনা

প্রেমানন্দ মণ্ডল

প্রেমানন্দ মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ
খুলনা, বাংলাদেশ
e-mail: pramananda1968@gmail.com

সারসংক্ষেপ

আবহমান বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হলো লোকসঙ্গীত। আর লোকসঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ শাখা বা ধারা হলো বাউল সঙ্গীত। বাউলরা তাদের সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই তাদের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাউল দর্শনের উৎস নিহিত হৃদয় ধর্মে। দেহের মধ্যেই আছেন অন্তরবাসী দেবতা। মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টিকারী প্রবৃত্তিসমূহকে ধ্বংস করে সোনার মানুষকে গড়তে পারলেই মনের মানুষকে পাওয়া সহজ হয়। মনের মানুষের সন্ধানে ব্রতী বাউলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ফকির লালন শাহ। এজন্য তাঁকে বলা হয় বাউল শিরোমণি বা বাউল সম্রাট। লালনের সাধারণ পরিচয় তিনি একজন কবি, গীতিকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধুই কবি নন, বরং জালাল উদ্দিন রুমী, আল্লামা ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের ন্যায় দার্শনিক কবি। কবিতা বা গানে কবি বা গীতিকারের আবেগ প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু লালনের গান তীক্ষ্ণ যুক্তির আশ্রয়ে রচিত হওয়ায় তা কেবল আবেগ সর্বস্ব নয়, বরং এক যুক্তিবাদী দর্শন। লালনের দর্শনে সন্নিবেশিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে মানবতাবাদ অন্যতম। কিন্তু তাঁর মানবতাবাদী চিন্তা তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে কীভাবে নিহিত ও প্রকাশিত, সে বিষয় আমাদের অনেকেরই অজানা। যে মানবতাবাদী চিন্তার জন্য লালন অধিকতর মহিমান্বিত হওয়ার দাবী রাখেন, নিবন্ধটি সে বিষয়েরই একটি পর্যালোচনা ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলার ভাবান্দোলনের প্রাণপুরুষ, লোকদর্শনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, বাউল শিরোমণি লালনের মানবতাবাদের স্বরূপ-সম্ভাবনা এবং তার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যৎসামান্য আলোকপাতই এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য। লালনের গান যে কেবল চিত্তবিনোদনের বিষয় নয়; বরং তা এক মহতী সাধনার সহায়ক এবং মানবতাবোধের জাগরণে অন্যতম পথনির্দেশক-এ সত্যকে জনমানসে তুলে ধরাই গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণার পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে আকরগ্রন্থ, সমালোচনা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে।

মূল শব্দ

বাউল, লালন, চারচন্দ্র, অসাম্প্রদায়িক, মনুষ্যত্ববোধ, মানবতাবাদ

ভূমিকা

পঞ্চদশ শতকে বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি আচণ্ডালকে আলিঙ্গন করে তথাকথিত উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিভেদ ঘোচাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি সমাজের ছোটোজাত তথা অচ্ছুতদেরকে ছোঁয়াছুঁয়ির কবল থেকে রক্ষা করে তাদেরকে মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর মুখ থেকেই আমরা প্রথম 'বাউল' নামক একটা শ্রেণির কথা শুনতে পাই । যারা পরবর্তিতে সতের শতকের দিকে বিকশিত হয় এবং আঠার শতকে এসে মহাত্মা লালনের চিন্তা-ভাবনায় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। লালন নিজে ছোঁয়াছুঁয়ির কবলে পড়েছিলেন। যৌবনে স্বজাতিয়দের সাথে তীর্থক্ষেত্র দর্শন করে বাড়ি ফেরার পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে সঙ্গীরা যখন মুমূর্ষু লালনকে ত্যাগ করে যান, তখন জনৈক হাফেজ মলম শাহ কারিগরের স্ত্রী মতিজান বিবির পরিচর্যায় তিনি সুস্থ হন। পুনর্জীবন লাভ করে লালন বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু মুসলমান ফকিরের সেবা-শুশ্রূষা ও অন্ন-জলে প্রতিপালিত হওয়ার দোষে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়। অগত্যা তিনি মলম শাহের কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই এর নিকট ফকিরি মতে দীক্ষিত হন। হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় লালন ব্যথিত হয়েছিলেন। প্রচলিত ধর্মমত ও সাধন পদ্ধতি সমূহের ওপর তাঁর বিতৃষ্ণা জাগে। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে প্রথাগত অনুশাসন সম্পর্কে লালন বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কিন্তু কোনো ধর্মই নিষ্ঠার সাথে পালন করেন নি। তাঁর ধর্মীয় দর্শন বৌদ্ধ দর্শন, সুফিবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি নিষ্ঠার সাথে এসব মত মান্য করেন নি। তিনি বৌদ্ধ সহজিয়া মতকে আশ্রয় করে ইসলামের মরমীতত্ত্ব সুফিবাদ ও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণববাদী প্রেমতত্ত্বের সমন্বয়ে একটা স্বতন্ত্র ধর্মমতে উপনীত হন। এই ধর্মমত হলো 'মানবধর্ম', যা পরকালের অনিশ্চিত শান্তি প্রত্যাশার চেয়ে ইহজাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বেশী গুরুত্বারোপ করে। মানবধর্মের অনুশীলনের জন্য তিনি রচনা করেন প্রায় পাঁচ শতাধিক ভাবসঙ্গীত, যা লালন সঙ্গীত বা লালনগীতি নামে পরিচিত। এই সঙ্গীতের মধ্যেই লালনের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন নিহিত। প্রসঙ্গক্রমে লালনের দর্শনের অন্যতম উপাদান 'মানবতাবাদ' নিয়েই এ নিবন্ধের আলোচনা ।

বিশ্লেষণ

'বাউল' দর্শন বাঙালির দর্শন। এ দর্শন বাংলার মাটিতে তথা বাঙালি মননে উদ্ভূত, লালিত ও বিকশিত, বিধায় বাঙালির একান্ত নিজস্ব সম্পদ। "বাংলার এক শ্রেণীর অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, একতারা আশ্রয়ী ভাবোন্মত্ত গায়ক, স্বাধীন ও সমন্বয়মূলক মরমী সাধকের নাম বাউল।"[১] "বাউল মত বাংলার ধর্ম, বাঙালির ধর্মী

একান্তভাবে বাঙালির মানস ফসল।"[২] 'বাউল শব্দটির আদি প্রয়োগ লক্ষ করা যায় পনের শতকের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে এবং ষোল শতকের শেষের দিকে চৈতন্যচরিতামৃতে। সেখানে শব্দটিকে 'ক্ষেপা' ও 'বাহ্য জ্ঞানহীন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।'[৩] অনেকের মতে, "বাতুল শব্দ থেকে বাউল শব্দটির উদ্ভব। আবার অনেকের মতে বাউল এসেছে ব্যাকুল শব্দ থেকে। যারা আত্মানুসন্ধানে ব্যাকুল তারাই বাউল। বাউল মতে হিন্দু, মুসলমান উভয় শ্রেণির লোকই আছে। যদিও বিশেষ কোনো ধর্মীয় চেতনা এ মতবাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। আত্মারূপী পরমেশ্বরকে মানবদেহে উপলব্ধি করাই হলো বাউল সাধনার লক্ষ্য। মানবদেহকে সকল তত্ত্ব ও সত্যের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে বাউলরা ঘোষণা করেন, দেহই কৈলাস বৃন্দাবন, দেহই মক্কা-মদিনা', 'যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে' প্রভৃতি। (আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, পৃথিবী যে ৯২টি মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত, তার মধ্যে ৬১টি উপাদান দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত।)"[৪] বাউল মতে, মানবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মা, আলেখ সাঁই বা মনের মানুষের অধিষ্ঠান। বাংলাদেশে মরমি দর্শন বিকাশে সুফিতত্ত্বের পরই বাউলতত্ত্বের অবস্থান ।

বাউল দর্শনের ভিত্তি হলো বাউল সঙ্গীত। এ সঙ্গীত তাত্ত্বিকতায় পরিপূর্ণ। স্বশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত লোকদের রচনা বিধায় এ সাহিত্য লোকসাহিত্যের উপর উঠতে না পারলেও এর দার্শনিক গভীরতা আদৌ কম নয়। 'অধ্যাত্ম সাধনায় উজ্জীবিত এসব সাহিত্য ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিকে তথা সত্যিকার মানুষকে দেখার একটি মহান প্রয়াস।'

বাউলতত্ত্বের বিকাশ ঘটে মধ্যযুগে। সতের শতকের দ্বিতীয় পাদে মুসলমান মাধববিবি ও আউল চাঁদের হাত ধরে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের নিকট বাউল মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে এ তত্ত্বকে যিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় করে তোলেন, তিনি হলেন ফকির লালন শাহ্। অষ্টাদশ শতকের লালন শাহই হলেন বাউল সম্রাট, তথা বাউল শিরোমণি। মহাত্মা লালন তাঁর সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই তাঁর মতাদর্শ প্রকাশ করেন। তাই বাউল দর্শন ও লালন সঙ্গীত অবিচ্ছেদ্য। লালনের অনবদ্য সৃষ্টি লালন সঙ্গীতের মাধ্যমেই বাউল মত জনপ্রিয় হয় এবং দার্শনিক স্বীকৃতি অর্জন করে। বাউলের কাছে গান আর জ্ঞান সমার্থক। জ্ঞান হচ্ছে আরাধনা। বাউলরা ভক্তিতে-বিনয়ে-প্রেমে গান করার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা করেন।

বাউল মতানুসারে আত্মা পরমাত্মার অংশ। দেহাধারাস্থিত আত্মাকে জানাই বাউলের ব্রত। লালন তা প্রকাশ করেন এভাবে :

> 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
> ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায় ॥'[৫]

উল্লেখ্য, বহুলশ্রুত এই গানটি বিবিসির জরিপে সর্বকালের ২০টি বাংলা গানের তালিকায় ১৪তম স্থান পেয়েছে। গানটিতে বর্ণিত খাঁচা হলো দেহ আর অচিন পাখি হলো আত্মা; যাকে লালন মন-বেড়ী দিয়ে ধরে রাখার বাসনা করেছেন। এই প্রচেষ্টাই হলো আত্মানুসন্ধান। উপনিষদের ভাষায় যাকে "আত্মানংবিদ্ধি" বলা হয়েছে, সক্রেটিস যাকে বলেছেন, "নিজেকে জান" (know thyself); সেই নিজেকেই জানতে চেষ্টা করেছেন লালন। কারণ নিজেকে জানতে পারলেই পরমাত্মাকে জানা যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "যে নিজের 'নফস'কে অর্থাৎ

প্রাণশক্তি বা চালিকা শক্তিকে জানতে পারে সে তার রবকে জানতে পারে" (মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু)। আত্মানুসন্ধানী লালন শাহ ছাড়াও বাউল কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : শেখ মদন, গঙ্গারাম, পাগলা কানাই, পাঞ্জু শাহ, পদ্মলোচন (পোদো), যাদু, দুদ্দু, পাঁচু, চড় গোঁসাই, গোলাম গোঁসাই, চণ্ডী গোঁসাই প্রমুখ। এঁরা একাধারে কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা ও মরমি। তাঁদের গান কেবল লোকসাহিত্য হিসেবে নয়, বরং বাঙালির প্রাণের কথা, বাঙালি মনীষার ফসল ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর।

বাঙালিকে চিহ্নিত করা হয় সংকর জাতি হিসেবে। কারণ, বাঙালির রক্তে সংমিশ্রিত হয়েছে অস্টিক, দ্রাবিড়, নেগ্রিটো, আর্য প্রভৃতি গোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ। তবে ডঃ আহমদ শরীফ মনে করেন, এদেশে (বাংলাদেশে) অবিমিশ্র আর্য প্রভাব কোনোদিন পড়েনি। তাঁর মতে, গুপ্ত ও সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা দিলেও পাল আমলে বেদ' বিরোধী বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হয়। তন্ত্র, যোগ প্রভৃতি সাধন পদ্ধতিকেও পণ্ডিতরা অবৈদিক বলে মত দিয়েছেন। A. E. Gough (মাধবাচার্য্যের "সর্বদর্শনসংগ্রহ" গ্রন্থের সহ অনুবাদক) বলেন, 'স্থানীয় অনার্য অধিবাসীদের কাছ থেকেই বৈদিক আর্যরা কালক্রমে যোগ-সাধন পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছিল।'[৬] পাঁচকড়ি ব্যানার্জী বলেন, 'তন্ত্র অতিপ্রাচীন, তন্ত্র ধর্মই বাঙালির আদিম ধর্ম এবং ইহা অবৈদিক ও অনার্য।'[৭] সুতরাং অনার্য লোকায়েতিক জড়বাদ তথা জাগতিকতার সঙ্গে যোগ ও তন্ত্র সাধনার মতো দেহাত্মবাদ, অবৈদিক পূজা-অর্চণা, বৈদিক অধ্যাত্মবাদ ও পারলৌকিকতা প্রভৃতি বিপরীতধর্মী মতবাদে সমৃদ্ধ হয়েছে বাঙালির মনন-সাধনা। আর মধ্যযুগের বৈষ্ণব বাউল লোকসাহিত্য ও গীতিকবিতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও দার্শনিক কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রচার করা হয়েছে স্রষ্টা, সৃষ্টি ও রহস্যময় মানবজীবন সম্বন্ধে সাবলীল জিজ্ঞাসা, উদার পরিসরে প্রোথিত হয়েছে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনার। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্যাকাশে তা বিশালতর হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের গানে প্রভাবিত হয়ে প্রবাসী পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগে লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করে সুধীজন সমক্ষে তাঁকে তুলে ধরেন। এছাড়া তিনিই প্রথম, যিনি লালনের ২৮৯টি গান সঙ্কলন করেন এবং বাউল দর্শন নামক খাঁটি দেশীয় দর্শনকে বিশ্বসভায় পরিচিতি দেন ।

বাউলরা মানুষের মধ্যে ভেদ-অভেদ স্বীকার করে না।[৮] তাঁরা মানুষকে কোনো শাস্ত্রের অধীন করতে চায় না। সে শাস্ত্র মানুষের তৈরি হোক বা ঈশ্বর প্রদত্ত হোক। তাই তাঁরা হিন্দু-মুসলিম, বেদ-কুরানের পার্থক্য রচনা করেন না। তাইতো দেখা যায় বাউলদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য, আবার মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য।

বাউলদের সাধন পদ্ধতি প্রধানত দেহতাত্ত্বিক যা তন্ত্র থেকে উদ্ভূত। বাউলদের সাধন পদ্ধতি ও হিন্দুতন্ত্রের সাধন পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। হিন্দুতন্ত্রে সহস্রারে শিবত্ব উপলব্ধি হয়। আর বাউল সাধনায় 'সহস্রারে' যে পরমসত্তার সন্ধান পাওয়া যায় তার নাম দেওয়া হয়েছে 'পরমেশ্বর', 'মনের মানুষ', 'রসের মানুষ', 'অটল মানুষ' 'সহজ মনুষ', 'অধর মানুষ' 'অলখ সাই', 'অচিন পাখি' প্রভৃতি। বাউলরা বিশ্বাস করেন যোগসাধনার মাধ্যমে দেহকে ইচ্ছাধীন করা সম্ভব ।

বাউলরা শাস্ত্রকে যেমন অগ্রাহ্য করে তেমনই যুক্তিতর্কের অবতারণাতেও তাঁদের অনীহা লক্ষণীয়। তাঁরা

পরমসত্তা বা সাঁইকে মন দ্বারা উপলব্ধি করে। দেহসাধনার মাধ্যমে মন ও দেহের সম্মিলনে চরম অবস্থায় উন্নীত হলেই এই উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। এই সাধনা বলে বাউল অতিক্রম করেন বস্তুর প্রচলিত রূপের জগৎ এবং উপনীত হন এক তন্ময়াবস্থায়, সেখানে তিনি কার্যত হয়ে পড়েন 'জ্যান্তে মরা' এবং প্রত্যক্ষ করেন পরমসত্তার স্বরূপ। এই মরমিবাদী বৈশিষ্ট্যের কারণে বাউলতত্ত্বে সুফিবাদের প্রভাব রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় । সুফিদর্শনে পরমাত্মার সঙ্গে অসীম সত্তার এই মিলনকেই বলা হয় ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ ।

বাউল দর্শনে মানুষের গুরুত্ব বিশেষভাবে, বিশেষ অর্থে গ্রথিত হয়েছে। বাউল মতবাদে মানুষকেই মানুষের মুক্তিদাতা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোন ঈশ্বর বা দেব-দেবীর নিকট তারা মুক্তির পথ খোঁজেননি। এটাও তাদের সংগ্রামী জীবনের ফসল। বাউলরা ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণির লোক। সমাজের নীচুতলার মানুষ (হাঁড়ি,মুচি, ডোম, মেথর, তাঁতি, জোলা, বেহারা) যখন মানুষ হয়ে উঠতে পারছিল না, তথাকথিত উচ্চবর্ণের সমাজ-উঁচুতলার মানুষ তাদেরকে যখন স্বীকার করছিল না, কোনো ধর্মের আশ্রয় লাভও যখন তাদের মুক্তির পথ দেখায়নি তখন সমাজের এই হতভাগ্য মানুষগুলো তাদের মুক্তির পথ খুঁজেছেন কোনো নতুন পথ ও মতের মধ্যে। তাদের অবহেলিত, লাঞ্ছিত সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাতে সাহায্য করেছে যে, সমাজের উঁচুতলার মানুষ হতে শুরু করে কোন দেবদেবী বা ঈশ্বর তাদের ভালো মন্দ দেখেননি। তাদের ভাষায় 'মানুষ গুরু' মানুষই তাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, এই মানুষ তাদের সমাজের মতো মানুষ। বাউলের কাছে মানুষ তাই এত গুরুত্বপূর্ণ, মানুষ ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই। বাউল তাই বিশ্বময় মানুষ দেখতে পান, দেখতে চান। লালনের ভাষায়–

> "যথা যাই মানুষ দেখি
> মানুষ দেখে জুড়াই আঁখি।"[৯]

এভাবে বাউলদের নিকট ধর্মের চেয়ে মানুষ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। উপাসনালয়ের চেয়ে মানবদেহকে তারা বেশি পূজ্য ভেবেছেন। উত্তরকালের কবি নজরুলও বলেছেন, 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান', বা 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই'। বাউলদের মানবপ্রীতি বা মানবদরদি দিকটির যে মহান দার্শনিক তাৎপর্য রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমানে যাকে 'secular humanism' বা 'secular thought' বলা হয় বাউল দর্শনে তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ ঘটেছে।

বাউল শিরোমণি লালনকে সন্ধান করতে গেলে ফাঁপরে পড়তে হয়। প্রশ্ন জাগে- কে এই লালন, কী তাঁর পরিচয় অথবা কেমন তাঁর ধর্ম-জীবন? মানুষের মতামতের যেমন শেষ নেই, তেমনি গবেষকরাও তাঁর সব বিষয়ে একমত পোষণ করেননি। লালনের জন্ম-পরিচয় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। লালন গবেষকদের একাংশের মতে, তিনি মুসলমান বংশোদ্ভূত এবং তাঁর জন্ম বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামে। কিন্তু অধিকাংশের মতে, তাঁর জন্ম হিন্দুকুলের কায়স্থ পরিবারে এবং জন্মস্থান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালির ভাঁড়ারা গ্রামে। লালনের জন্ম ১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। দীর্ঘায়ু লালন যৌবনে সিরাজ সাঁই এর নিকট ফকিরি মতে দীক্ষা লাভ করেন। হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে যেসব কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, তা নিয়ে গবেষণা চলমান। সম্প্রতি তাঁর গান নিয়ে দেশে-বিদেশে অধিকতর গবেষণা হচ্ছে। লালনের কণ্ঠে

ধ্বনিত হয়েছে মানবতার জয়গান। তিনি আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে যে অমৃতের সন্ধান করেছেন, তাঁর অনুসারীরা তাঁর গানের মধ্য দিয়েই সেই অমৃতের সন্ধান খুঁজে পান ।

ফকির লালন শাহ স্বয়ং মহা ভাবসমুদ্র। তিনি মাতৃযোনি সম্ভূত সাধারণ মানব সন্তান হলেও একটি আদর্শিক ভাবধারা নিয়ে দার্শনিকতার জগতে আত্মমুক্তির এক বিশেষ পন্থায় জীবন পরিচালনার মহামন্ত্র প্রচার করে গিয়েছেন। তখনকার ধর্মভিত্তিক খণ্ড-বিখণ্ড সমাজ ব্যবস্থাকে ঐক্যসূত্রে বাঁধার পরিকল্পনার মহাপ্রয়াস নিয়ে লালন শাহ সমাজে যে বিশেষ একটি ভাবদর্শন তৈরী করেছিলেন, মূলত সেটাকেই লালন দর্শন বা বাউল-দর্শন অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

শ্রেষ্ঠ বাউল হিসেবে লালনের যে দর্শন, তা অনেক ব্যাপক-বিস্তৃত। তাঁর সঙ্গীতে সন্নিবেশিত হয়েছে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, গুরু বা মুর্শিদতত্ত্ব, প্রেম-ভক্তিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, মানবতাবাদ ইত্যাকার নানাবিষয়। বৌদ্ধ সহজিয়া মত, সুফিবাদের মরমীতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্ব প্রভাবিত লালন দর্শনে যে মানবতাবাদের বিকাশ ঘটেছে তা আলোচনার পূর্বে মানবতাবাদ বলতে কী বোঝায় এবং এ মতবাদের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা আবশ্যক।

সাধারণত 'মানবতাবাদ' বলতে মানবকেন্দ্রিক দর্শনকে বুঝায়। মানবতাবাদ হলো এমন এক বিশেষ দার্শনিক মতবাদ, যাতে সমাজ জীবনের যাবতীয় বিষয়ের বিচার-বিবেচনায় মানুষকেই করা হয় কেন্দ্রবিন্দু এবং মানুষের শক্তি, সত্তা ও গুণসমূহ প্রাধান্য পায়। এ মতবাদে মানুষের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে বলা হয়, মানুষ অন্যকিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং অন্য সবকিছুই মানুষের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ নিজে তার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকর্তা। আত্মোন্নতির দ্বারা মানুষ নিজের, সমাজের, জগতের কল্যাণসাধন করতে পারে। কাজেই মানবতাবাদ হলো এমন এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা মানুষের সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে।

দর্শন ভাবনায় মানবতাবাদের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং প্রবহমান। পাশ্চাত্যে খ্রিস্টপূর্ব যুগের প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর সমকালীন দর্শনেও এ দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত। গ্রিক দর্শনে মানবতাবাদী চিন্তার উদ্ভব লক্ষ করা যায় সোফিস্টদের দর্শনে। সোফিস্ট শিরোমণি প্রটেগোরাসের বক্তব্য 'Man is the measure of all things' অর্থাৎ 'মানুষ সবকিছুর পরিমাপক' এ উক্তির মধ্যেই সোফিস্টদের মানবতাবাদের বীজ নিহিত। তাঁরা উত্তরকালের মানুষদের জন্য এ শিক্ষাই রেখে যান যে, প্রকৃতি নয়, মানুষ নিজেই তার কৃতকর্মের মানদণ্ড এবং সে নিজেই তার চিন্তার প্রথম ও শেষ সমস্যা। সোফিস্ট পরবর্তী সক্রেটিস, প্লেটোর মানবতাবাদের অনুসরণ করে মধ্যযুগের ব্রিটিশ দার্শনিক জন উইক্লিফ (John Wycliffe, 1320-1384) ধর্মযাজকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিজের জীবনের ঝুঁকিকে মাথায় নিয়ে মধ্যযুগীয় নির্বিচারবাদ ও চার্চীয় কর্তৃত্বের সমালোচনা করে তাঁর মানবতাবাদী মতবাদ প্রচার করেন ।

মধ্যযুগীয় চার্চবাদের পতনের পর চৌদ্দ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে ষোল শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে নতুন উদ্দীপনা দেখা দেয়, যা 'রেনেসাঁ' (নবজাগরণ) নামে খ্যাত, সেই 'রেনেসাঁ'র পথিকৃৎদের চিন্তা-ভাবনা তথা আধুনিক যুগের ধ্যান-ধারণায় মানবতাবাদের প্রচার ও প্রসার লক্ষণীয়। এরপর সমকালীন

পাশ্চাত্য দর্শনে মানবতাবাদ এক নতুন মাত্রা পায়। এসময় যাঁরা মানবতাবাদের ঝাণ্ডা নিয়ে দৃপ্তপদে অগ্রসরমান তাদের মধ্যে বার্ট্রান্ড রাসেল এবং জ্যাঁ পল সার্ত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানবতার শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামে ব্রিটিশ দার্শনিক রাসেল ছিলেন একজন আপোষহীন সংগঠক। মানবতার স্থায়ী কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন তার জন্য তাঁকে চাকরী হারাতে হয়েছে, কারাবরণ করতে হয়েছে। তথাপি তিনি আদর্শচ্যুত হননি। আর ফরাসি দার্শনিক সার্ত্রে মানুষের মুক্তির সংগ্রামে এক নবযুগের সূচনা করে অস্তিত্ববাদী দর্শনকে মানবতাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। মানবতার উদ্দেশে কথা বলেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করে যাননি, বরং চিন্তায়-কর্মে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর দর্শন নিছক তত্ত্বদর্শন নয়, তাঁর দর্শন মানবতার মুক্তি আদায়ের, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার, সমাজকে শোষণমুক্ত করার দিগ্দর্শন। অসহায়, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানবতার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনার নিদর্শন হিসেবেই তিনি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েও অবলীলায় তা প্রত্যাখ্যান করেন।

পাশ্চাত্যের ন্যায় প্রাচ্যেও বিশেষ করে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে মানবতাবাদের প্রকাশ লক্ষণীয়। মানবতাবাদের প্রথম সাক্ষাৎ বৈদিক যুগে। এ যুগের নাস্তিক বা অবিশ্বাসীরা বৈদিক সাহিত্যের তথা বেদে বর্ণিত প্রথম দিককার সূত্রগুলোর বিরোধিতা করে অর্থাৎ প্রাকৃতিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে যে বৈদিক ধর্ম গড়ে উঠেছিল তার বিরোধিতা করে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। আবার পরবর্তীতে বেদের উত্তরকাণ্ডের জ্ঞানকাণ্ড তথা উপনিষদে যে 'ব্রহ্ম'কে সচ্চিদানন্দ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। এ কথায় মানুষকে এক উচ্চমার্গে স্থাপন করা হয়। উপনিষদে মানুষের মর্যাদা এবং তার কল্যাণবোধকে স্বীকৃতি দেওয়ায় অনেকে মনে করেন সম্ভবত উপনিষদেই সর্বপ্রথম মানবতার জয়গান গীত হয়েছে।

পরবর্তীতে মানবতার মুক্তির পথকে উন্মোচিত করে মানবতাবাদের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে বৌদ্ধদর্শনে। তথাগত বুদ্ধের কাছে জীবের মুক্তি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর দর্শনে ঈশ্বর বা অতীন্দ্রিয় সত্তার কোন উল্লেখ নেই। জীবের মুক্তির জন্য জীব নিজেই যথেষ্ট। তার মানে বৌদ্ধদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ ও মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা, কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার পূজার্চনা নয়। মানুষ এক বিরাট সম্ভাবনাময় সত্তা, সে যে নিজেই সবকিছু করার অধিকার রাখে এ কথা সম্ভবত বুদ্ধই সর্বপ্রথম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, অন্তত প্রাচ্যের দর্শনে ।

তথাগত বুদ্ধের উপলব্ধিরই প্রকাশ লক্ষণীয় মধ্যযুগের (চতুর্দশ শতকের) কবি চণ্ডীদাসের প্রবাদতুল্য উক্তি- "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই"-এ পঙক্তিতে। কবি চণ্ডীদাসের এই প্রকাশ শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব দর্শনে যেমন বিশেষভাবে প্রতিফলিত, তেমনই তার চরম বিকাশ ঘটেছে বাউলদের 'চারিচন্দ্রভেদ' (রজঃ, শুক্র, মূত্র ও মল) সাধন প্রণালিতে। তাঁদের মতে, মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, বিধায় মানুষের কোন অংশই অপবিত্র নয়। তারা বিশ্বাস করেন, চারিচন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমেই সাধক-সাধিকার উভয়ের দেহ পরিপক্ব ও সাধনা পূর্ণ হয় ।

দীর্ঘকাল থেকে মানবতাবাদী মতবাদের দু'টি ধারা বহমান; একটি নিরীশ্বরবাদী এবং অপরটি ধর্মীয় বা

আধ্যাত্মিক। বাউল শিরোমণি লালনের মানবতাবাদী চিন্তায় অধ্যাত্মবাদের ছোঁয়া থাকলেও তা মূলত ইহজাগতিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ। লালন মানবীয় বিচ্যুতির সব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে, ব্যক্তিগত লোভ-লালসা-মোহ-হিংসা-দ্বেষ বর্জন করে, কেবল মানুষের সম্প্রীতির বাণীই তাঁর গানে প্রচার করেছেন। সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে তুল্য মূল্যে বিচার চলে এমন মানুষ পৃথিবীতে খুবই বিরল। বাঙালির এক শ্রেষ্ঠ সন্তান লালন আজ বিশ্বসমাজের মহান আদর্শ, প্রতীক-প্রতিমা। লালনের দর্শন ইতোমধ্যে জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করেছে। জাতিসংঘের ইউনেস্কো ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে বাউল দর্শন তথা লালন দর্শনকে 'A Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity' হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে।

বাউল দর্শনে মানবতাবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে লালন এক আইকন স্বরূপ। সমাজে প্রচলিত ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও জাতপাতের বিরুদ্ধে লালন তাঁর মানবধর্মের মতবাদ প্রচার করেছিলেন গানের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে তাঁর সেই অহিংস মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে। বিশেষ করে সমাজের সাধারণ মানুষ শিষ্যত্ব নেন লালনের। তাঁর মাধ্যমে শুরু হয় নতুন এক মানবধর্মের চর্চা। জাত-পাতহীন, ধর্ম-বর্ণহীন সমাজের কথাগুলো লালনের গানের মূল কথা হওয়ায় মানুষ তাঁর গানের মাধ্যমে মানবমুক্তির আশ্রয় খুঁজে পায়।

লালনের মানবতাবাদী চিন্তার পেছনে একান্ত সহায় ছিল হাজার বছর লালিত বাংলার বৌদ্ধ উর্বর, সুফী উর্বর, বৈষ্ণব উর্বর সমাজমন। বিশ্বজগতের সৃষ্টির রহস্যময় আলো আঁধারির বিষয় নিয়ে এবং জীবনকে ঘিরে মানবমনে যত প্রকার মৌলিক প্রশ্নের উদয় হতে পারে লালনের তত্ত্বসংগীতে আমরা তা দেখতে পাই। সেদিক বিবেচনায় লালন সাঁইজি একজন ভাববাদী দার্শনিক। তবে তিনি মূলত যুক্তিবাদী কবি-দার্শনিক, বস্তুবাদের সমর্থক এবং সমাজবাদী।

লালনকে বিশ্লেষণ করতে হলে অবশ্যই তাঁর সমকালীন সমাজকে জানতে হবে। সমাজে যখন জাতিভেদ প্রথার ছোঁয়াছুঁয়ির কবলে পড়ে নিচুতলার মানুষ ঊনমানবে পরিণত হয়ে মুক্তির আকুতি নিয়ে আকুলি বিকুলি করছিল কিন্তু প্রতিবাদের অস্ফুট স্বর কণ্ঠ পেরিয়ে মুখে আসছিল না, লালন তখন এ জাতপাতের ওপর খড়্গ ধরেন এবং তাদের মুখে ভাষা দেন। তিনি বলিষ্ঠভাবে সমাজ আরোপিত জাতপাত অস্বীকার করে বলেন, "জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা / সত্য পথে কেউ নয় রাজি সবি দেখি তা না না না। যখন তুমি ভবে এলে / তখন তুমি কী জাত নিলে / কী জাত হবা যাবার কালে / সে কথা ভেবে বল না ॥"[১০]

লালনের গানে পাই বিশ্বজনীন বা সর্বজনীন মানব বন্দনার আহ্বান। তাঁর গানের মূল কথা হচ্ছে মানুষের কোনো 'জাত নাই'। জাত হাতে পেলে তা আগুন দিয়ে পোড়ানোর বাসনা করেছেন। এ কোনো আধ্যাত্মিক কথা বা কোনো কথার কথা নয়, এর মধ্যে রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের আভাস। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অখণ্ড মানবতাবাদের প্রচারে লালন নিজের জাতি পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন–

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে ।
যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,

বামন চিনি পৈতে প্রমাণ,
বামনী চিনি কিসেরে ॥"[১১]

স্পষ্টতই এখানে লালন 'জাতের নামে বজ্জাতি' কে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ধর্মকে বিদ্রূপ করেছেন এবং বলেছেন মানবধর্মের কথা । মানবতার মহামন্ত্রে শ্রেণিবৈষম্যকে ভেঙে চুরমার করার প্রয়াস এখানে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে । লক্ষণীয়,উনবিংশ শতকে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) যুগে যুগে ধর্মতাত্ত্বিকরা ধর্মের নামে মানুষকে শোষণ করে বলে যে তত্ত্ব দেন, তার পূর্বেই লালন তাঁর বিভিন্ন গানে ধর্মের এই ক্ষতিকর দিকটি তুলে ধরেছিলেন। ধর্মতাত্ত্বিকদের ন্যায় সমাজপতিরাও ধর্মকে ব্যবহার করে জাতের নামে যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন তা লালনের মতে কোন শাস্ত্রের তো নয়ই, বরং তা মানুষের অজ্ঞতার ফসল । তিনি বলেন–

"জাত বলিতে কি হয় বিধান
হিন্দু- যবন বৌদ্ধ খ্রিস্টান
জাতের আছে কিবা প্রমাণ শাস্ত্র খুঁজিলে।"[১২]

সমাজে পোষাকী ধার্মিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, কিন্ত যথার্থ ধার্মিক নিতান্তই নগন্য। ধর্মীয় আবরণে আচ্ছাদিত ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশের বাইরের দিকটা আতর-চন্দনে যতটা সুবাসিত, ভেতরটা ততোধিক দুর্গন্ধযুক্ত। অর্থাৎ ভিতর আর বাহির আলাদা। তাঁরা সাধু সেজে যাদু দেখায়। কেউ সত্যানুসরণ করে না। এমন কপটতার প্রেক্ষিতে লালনের আবেদন : "সত্য বল, সুপথে চল ওরে আমার মন / সত্য সুপথ না চিনিলে পাবিনে মানুষের দরশন।"

মানুষকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে লালন মানুষ ভজনের প্রাধান্য দেন। বলেন–

"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি ।
মানুষ ছাড়া ক্ষেপারে তুই মূল হারাবি ॥"[১৩]

লক্ষণীয়, লালন দর্শনে 'মানব সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছে। মানুষের মধ্যে উত্তম সত্তা বর্তমান। এটাই লালন দর্শনে'মানুষ রতন'। এখানে এই মানুষকেই বলা হয়েছে 'সোনার মানুষ।' এই সোনার মানুষ হতে হলে 'মানুষ ভজন' করতে হবে। মানুষের জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এর চেয়ে বড় কিছু নাই।[১৪]

লালন ফকির গুরুবাদী মানবধর্মের প্রবর্তক। তাঁর সাধনার কেন্দ্রে রেখেছেন মানুষকে। বলেছেন :

"সহজ মানুষ ভজে দেখনারে মন দিব্যজ্ঞানে।
পাবিরে অমূল্য নিধি বর্তমানে, পাবি বর্তমানে ॥"[১৫]

আমরা যদি আমাদের সকল অহংকার-সংস্কার-আমিত্বকে বর্জন করে আমাদের দেখার দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারি তাহলে দেখতে পাই, মানুষ গুরুই মানুষের পথপ্রদর্শক, মানুষের মুক্তিদাতা। লালন বলেন–

"ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার
সর্বসাধন সিদ্ধি হয় তার ॥"[১৬]

লালনের গানে মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দর্শনের যে প্রতিফলন দেখা যায় তা দেশকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বমানবিক মূল্যবোধের পরিচয় তুলে ধরে। তাই তিনি কেবল বাঙালি মরমি কবি বা গীতিকবিদের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন, বরং বিশ্ব লোকসংস্কৃতির অঙ্গনেও তাঁর অবস্থান অনেক উঁচুতে। উপমহাদেশে বিদ্যমান হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে জাত-ধর্মের বাহ্যিক আচরণ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে লালন ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠ। তাঁর গান জাত-পাতের বিরুদ্ধে মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়। গানে তিনি বলছেন, "একই ঘাটে আসা যাওয়া, একই পাটনি দিচ্ছে খেওয়া / কেউ খায় না কারও ছোঁয়া, বিভিন্ন জল কে কোথায় পান।"[১৭]

'জাতি' শব্দটি মূলত রাজনীতিবিজ্ঞানের একটি পরিভাষা। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-জৈন-খ্রিস্টান এসব ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা জীবন-সংগ্রাম বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সংস্কার-সংস্কৃতির কিছু উদাহরণ তুলে ধরে লালন জাতের অসারতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।[১৮] লালনের মতে, মানুষ এক জাতি। তাই স্বপ্ন দেখেছেন এক অখণ্ড মানবজাতির মহামিলনের। বলেছেন–

"এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ আর খ্রিস্টান, জাতি-গোত্র নাহি রবে ॥"[১৯]

লালনের এই গভীর আকুতি নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিকে অতিক্রম করেছে। আর এজন্যই তাঁকে বলা হয় অসাম্প্রদায়িক মানবতার স্বপ্নদ্রষ্টা ।

যুগে যুগে যেসব কারণে মানবিকতা বিপন্ন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হলো ধর্মীয় বিভেদজনিত সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতায় মানবিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় এর ভাষায়, "প্রাকৃতিক দুর্যোগে মরে মানুষ আর সাম্প্রদায়িকতায় মরে মনুষ্যত্ব।" মনুষ্যত্ব লোপ পেলে মানুষের আর কীই বা অবশিষ্ট থাকে? লালন এটি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। সেকারণে লালন এই সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে এক অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন। লালনোত্তর কালে তথা বর্তমান সময়ে আমরা যদি বিদ্যমান জাতিকুলের ভিন্নতা দূরীভূত করতে না পারি, যদি একই স্রষ্টার সৃষ্ট মানবরূপে নিজেদেরকে চিহ্নিত এবং প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি, তাহলে যতই আমরা নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক বলে দাবী করিনা কেন, যতই সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার লাইন- "মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান / মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥"[২০] বলে উচ্চকণ্ঠ হই না কেন, কোনো সুফল বয়ে আনবে না। বরং অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিসমূহের উপাসনালয়ে হামলা, ভাঙচুর আর পারস্পরিক হানাহানিতে প্রতিপক্ষের পৈশাচিকতায় রক্তের হোলিখেলা চলতেই থাকবে; বিপন্ন হবে মানবিকতা। সমাজের এমন প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতায় লালনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ মানবতাবাদী দর্শন অনুধাবন এবং অনুশীলন অতীব প্রয়োজন।

উপসংহার

লালন তাঁর মানবতাবাদী দর্শনে একথাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, মানুষের মধ্যে কোনো জাতিভেদ নেই। মানুষ এক জাতি; মানুষ কেবল না হিন্দু, না মুসলমান, না বৌদ্ধ, না খ্রিস্টান কিংবা নয় অন্যকিছু। সে কেবলই মানুষ, আর সব মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সেইসাথে মহাবিশ্বের ছোট্ট ধরণীতে সৃষ্ট জীবকুলের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। আমরা যদি নিজেদেরকে জীবকুলশ্রেষ্ঠ হিসেবে দাবী করি তাহলে মানবকল্যাণে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, সব মানুষকে থাকতে হবে মিলিতভাবে। লালন সর্বদাই ইঙ্গিত করেছেন মানুষের মনুষ্যত্ব গুণের প্রতি। এ মনুষ্যত্ববোধকে যদি আমরা সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিতে পারি তাহলে পারস্পরিক কলহ, হানাহানি, যুদ্ধ-সন্ত্রাস এমনকি রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনও হয়তোবা একসময় বন্ধ হবে। পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী মানুষ সেই সুদিনের অপেক্ষায় অপেক্ষমান। জয়তুঃ লালন।

তথ্যসূত্র

১. ড. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, বাংলার বাউল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩৭

২. ডঃ আহমদ শরীফ, বাউলতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৪৬

৩. ডঃ আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৭৫

৪. ডা. অপূর্ব চৌধুরী-মানুষের শরীর কী দিয়ে তৈরী, ১৯ জুলাই-২০২২, বাংলাদেশ প্রতিদিন

৫. ডক্টর শ্রীমতিলাল দাস ও শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৫৮ লালন-গীতিকা, পৃ. ২০২, পদ-সংখ্যা-২৯১

৬. Philosophy of India, P-513-14, উদ্ধৃত: আহমদ শরীফ: বাউলতত্ত্ব

৭. উদ্ধৃত: আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৮

৮. ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ পৃ. ২৮

৯. তৃপ্তি ব্রহ্ম, লালনের মানবতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি, লালন মৃত্যু-শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১৫৬

১০. আবু ইসহাক হোসেন, বাউল দর্শন ও লালনতত্ব, পৃ. ২৪৯, গান নং-৪

১১. শ্রীবসন্তকুমার পাল, মহাত্মা লালন ফকির, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, পৃ. ৩১

১২. আবু ইসহাক হোসেন, বাউল দর্শন ও লালনতত্ব, পৃ.২৮৪, গান নং-৬১

১৩. ডক্টর শ্রীমতিলাল দাস ও শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৫৮ লালন-গীতিকা, পৃ. ২৭১, পদ-সংখ্যা-৩৯১

১৪. ডক্টর খোন্দকার রিয়াজুল হক, লালন শাহ:জীবন ও অধ্যাত্মদর্শন, প্রবন্ধ, পৃ. ৬৫২

১৫. ফকির আনোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), লালন-সঙ্গীত, ১ম খণ্ড, কুষ্টিয়া, ১৯৯৩, পৃ. ১৯৩, গান নং ১৯৩

১৬. আবু ইসহাক হোসেন, বাউল দর্শন ও লালনতত্ব, পৃ. ৩০০, গান নং-৮৫

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮, গান নং-২

১৮. অ্যাডভোকেট সিরাজ প্রামাণিক-লালন স্মরণোৎসব, ১৫ মার্চ-২০২২, বাংলাদেশ প্রতিদিন

১৯. আবু ইসহাক হোসেন, বাউল দর্শন ও লালনতত্ত্ব, পৃ. ২৭৫, গান নং-৪৬

২০. কাজী নজরুল ইসলামের গীতি গ্রন্থ 'সুর-সাকী'র গীত 'হিন্দু-মুসলমান', ফজলুল আলম পাপ্পু সম্পাদিত, আবৃত্তির কবিতাসমগ্র, হাতেখড়ি-২০১৫, পৃ. ১৯৭

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 75-82

পূর্ণেন্দুর মাধবী : প্রসঙ্গ কবিতা

অমিত মণ্ডল

সারসংক্ষেপ

সাহিত্য ও শিল্পের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী পূর্ণেন্দু পত্রী। শিল্পের বিচিত্র ধারায় অবাধ চর্চার ফলে তাঁর এক শিল্পের ছায়া আরেক শিল্পে এসে পড়ে। পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতায় যে সংলাপধর্মিতার মৌলিক গুণ পরিলক্ষিত হয় তার অন্যতম উৎস হলো তাঁর চলচ্চিত্র চর্চা। ১৯৬৫ সালে তৈরি তাঁর প্রথম সিনেমা 'স্বপ্ন নিয়ে'-র অন্যতম কেন্দ্রীয় অভিনেত্রী ছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী সিনেমা 'স্ত্রীর পত্র'-তেও তিনি মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি শিল্পীর মন। এই 'স্বপ্ন নিয়ে'-র নির্মাণকালেই পূর্ণেন্দুর কবিতায় উঠে আসেন মাধবী। শুধু কবিতায় নয়, কাব্যনাট্যেও। কবিতাটি হল 'মাধবীর জন্যে' এবং কাব্যনাট্যটি হল 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত'। একসময় কানাঘুষো শোনা যেত, মাধবী এবং পূর্ণেন্দুর মধ্যে রয়েছে রোম্যান্টিক কোনো সম্পর্ক। পরে সে নিয়ে মাধবী লিখেওছেন কিছু কথা, যা মূল প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য মাধবীকে পূর্ণেন্দু কবিতায় কীভাবে পেলেন।

অমিত মণ্ডল
পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: amitochitro@gmail.com

মূলশব্দ

পূর্ণেন্দু পত্রী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সিনেমা, কবিতা, সংলাপ

গবেষণার উদ্দেশ্য

সিনেমার চরিত্রাভিনেত্রী মাধবী কীভাবে হয়ে উঠলেন পূর্ণেন্দুর কবিতার নারী, আর কেন-ই বা কবিতায় মাধবীর বিপরীতে পরিচালক সবসময় নিজেকে স্থান দিলেন; সিনেমা, ব্যক্তিজীবন এবং কবিতার আলোচনার মাধ্যমে সেই উত্তর খোঁজা এবং আরো কিছু গবেষণামুখী প্রশ্ন তৈরি করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন আকরগ্রন্থ, সহায়কগ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

'তোর কি যে কসম খাই, চোখের কোণে পানি আসছে ভাই'। পূর্ণেন্দু পত্রীর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দীর্ঘ লেখার এই ছিল শিরোনাম। এই লেখাটি আরো অনেকের লেখার সঙ্গে সংকলিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালের ১৭ জুলাই প্রকাশিত 'পূর্ণেন্দু পত্রী এক বহুমুখী প্রতিভা' বইটিতে। এই নামকরণ কেবল অভিনব তাই নয় বরং এই সংকলনে প্রকাশিত অন্য সমস্ত লেখাগুলির শিরোনামের তুলনায় সবচেয়ে বেশি আন্তরিক। কিন্তু শিরোনাম পার করে যখন মূল লেখায় প্রবেশ করি তখন দেখি, লেখা ততটা আন্তরিক নয়। কিছু ঘটনা, কিছু স্মৃতি এবং কিছু জবাবদিহির কোলাজ। শিরোনাম যে আন্তরিক একটি লেখা পড়বার আশা মনে জাগায় তা থেকে সরে এসে এই লেখা হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে সৌজন্যমূলক এক স্মৃতিচারণ।

আরও পরে ২০১২ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত 'মাধবীকানন' বইটিতে আমরা দেখি মাধবী নিজের আত্মজীবনীর একটি অধ্যায় রেখেছেন পূর্ণেন্দু পত্রীর জন্য। অধ্যায়ের নাম 'স্বপ্ন নিয়ে : যে টেলিফোন আসার কথা...'। একে ঠিক নতুন লেখা বলা চলে না; আবার এও বলা চলে না এই লেখাটি সেই আগের লেখার পরিমার্জিত কিংবা পরিবর্ধিত রূপ। দুটি লেখাতেই কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি আছে (যদিও তথ্যের হেরফের ঘটে গেছে বহু) এবং কিছু প্রসঙ্গ সংযোজিত ও বিয়োজিত হয়েছে। দুটি লেখা পাশাপাশি পড়লেই পাঠক তা বুঝবেন। গুরুত্বপূর্ণভাবে এই লেখাটিতে একটি নতুন প্রসঙ্গ সংযোজিত হয়েছে, সেটি হল কবিতা। অবিশ্যি সেকথা শিরোনামেই স্পষ্ট, 'যে টেলিফোন আসার কথা...'।

মাধবীর লেখা অনুযায়ী 'যে টেলিফোন আসার কথা' কবিতাটি নাকি তাঁকে ঘিরেই লেখা। মাধবী বলেছেন, 'দীর্ঘদিনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার পরে কে প্রথম ফোন করেছি, উনি না আমি, আজ আর তা মনে নেই। আমি বলেছিলাম, 'আপনি আর ছবি করবেন না?'

'ইচ্ছে করে', পূর্ণেন্দুবাবু বলেছিলেন– 'কিন্তু যখনই ভাবি প্রোডাকশন ম্যানেজার কে হবেন, আঁতকে উঠি।'

'ঠিক আছে। আমি আপনার প্রোডাকশন দেখব।'

পূর্ণেন্দুবাবু আশ্বস্ত হলেন-'ঠিক আছে। তা হলে ছবি বানাব। আপনি আমাকে ফোন করবেন।'

সে সময় ব্যক্তিগত অস্থিরতার মধ্যে ছিলাম। ভুলে গেলাম ফোন করতে। আর তাঁর পরেই পূর্ণেন্দু পত্রী লিখলেন-'যে টেলিফোন আসার কথা, আসেনি'।"[১]

মাধবীর এই ব্যক্তিগত অস্থিরতা কী? সেই সময় নির্মলকুমারের সঙ্গে তাঁর 'সম্পর্ক একটা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিল।' বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি ঠিকই কিন্তু মাধবী 'একবস্ত্রে' সংসার থেকে বেরিয়ে যান সেসময়। সঠিক সাল তারিখ পাওয়া না গেলেও একটা ন্যায়সঙ্গত হিসেব কষাই যায়। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'কাপুরুষ' সত্যজিতের সঙ্গে মাধবীর শেষ ছবি, যার পর মাধবী ঘোষণা করেন তিনি আর সত্যজিতের সঙ্গে কাজ করবেন না। এসময় তিনি বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নিলেও এর কয়েকবছরের মধ্যে তিনি নির্মলকুমারকে বিয়ে করেন। এখন ২০২০ সালে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী আলাদা থাকলেও মাধবী ও নির্মলকুমার সেই বছর তাঁদের দাম্পত্যের ৫২ বছর পূর্ণ করেছেন।[২] সে অনুযায়ী ওঁদের বিয়ের সম্ভাব্য সাল ১৯৬৮। তাঁরা একত্রে সংসার

করেছেন ২৫ বছর। অতএব তাঁদের সেপারেশনের সম্ভাব্য সাল ১৯৯৩। এদিকে 'যে টেলিফোন আসার কথা' প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে 'তুমি এলে সূর্যোদয় হয়' কাব্যগ্রন্থে। ১৯৯৩-ই যদি মাধবী আর নির্মলকুমারের 'সন্ধিক্ষণ' হয় তবে কী করে পূর্ণেন্দুর এই কবিতা মাধবীকে ঘিরে হবে? আর মাধবী ও পূর্ণেন্দুর পূর্বোক্ত কথোপকথনের মর্মোদ্ধার করলে একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এ সেই সময় যখন পূর্ণেন্দু সিনেমা করা ছেড়ে দিয়েছেন। আর আমরা জানি 'তুমি এলে সূর্যোদয় হয়' যে সালে প্রকাশিত হয় সেই ১৯৭৬ সালে পূর্ণেন্দু মোটেই সিনেমা করা ছাড়েননি বরং সেই বছরই তিনি তৈরি করেন তাঁর 'অবনীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রটি। এবং ১৯৮২ সালের পর পর্যন্তও তিনি প্রত্যক্ষভাবে সিনেমা তৈরির কাজে যুক্ত থাকবেন। যদি এই কবিতা অন্য কোনোভাবে মাধবীকে ঘিরে হয়েও থাকে সে পার্থিব ঘটনা আমাদের অজানা। কিন্তু সাল তারিখের হিসেব আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেয় মাধবীর দাবিতে একটা বড়ো রকমের গোলমাল রয়ে গেছে।

সরাসরি মাধবীর নামোল্লেখ করে পূর্ণেন্দু পত্রী একটি কবিতা এবং একটি কাব্যনাট্য লিখেছেন। কবিতাটি হল 'মাধবীর জন্যে' আর কাব্যনাট্যটি হল 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত'। দুটিরই রচনাকাল সম্বন্ধে সাল-তারিখের অনুপুঙ্খ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে পূর্ণেন্দুর বয়ান থেকে জানা যায়, ১৯৬৫ সালের 'স্বপ্ন নিয়ে' সিনেমাটি না চললেও 'দীর্ঘদিন তার রেশ বাজতে থাকে' পূর্ণেন্দুর 'ভাবনার ভিতরে'। সেইরকম একটা সময়েই তিনি এই কাব্যনাট্যটি লিখেছিলেন। তখন তার নাম ছিল 'সিঁড়িতে বিদায় দৃশ্য'। পরে সেটি 'আগাপাশতলা পরিমার্জনা' করে নাম দেন 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত' এবং প্রকাশ করেন 'একালের রক্তকরবী' পত্রিকায়। অন্যদিকে 'মাধবীর জন্যে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে, পূর্ণেন্দুর 'শব্দের বিছানা' কাব্যগ্রন্থে। আমরা জানি পূর্ণেন্দুর প্রথম এবং দ্বিতীয় কবিতার বই প্রকাশের ব্যবধান প্রায় একুশ-বাইশ বছর। এই বাইশ বছর তিনি গদ্য-গল্প-প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, প্রচ্ছদ করেছেন, সিনেমা নির্মাণ করেছেন। কবিতাও লিখেছেন কিন্তু প্রকাশ করেননি কোনো কবিতার বই। যখন আবার প্রকাশ পেল কবিতা তখন দেখা গেল এই বহুবিচিত্র শিল্প মাধ্যমে গভীর বিচরণ তাঁর কবিতায় নিবিড় ছাপ রেখে গেছে এবং সেটা হলো তাঁর কবিতার সংলাপধর্মিতা। দেবেশ রায় চমৎকারভাবে আমাদের সেই কথা জানিয়েছেন, "আমার ভাবতে ইচ্ছে করে, পূর্ণেন্দু যখন গল্প উপন্যাস রিপোর্তাজ লিখছিল, গল্পের ছবি আঁকছিল, বই সাজাচ্ছিল, বইয়ের মলাট করছিল, উনিশ শতকের কলকাতা নিয়ে লেখা বুনছিল, ফিল্মের স্ক্রিপ্ট ছকছিল ও ভাবছিল আরো বেশি-তখনই, এই পুরো সময় জুড়ে, তার সঙ্গে পরিবেশের সংলাপ চলেছে, অবিচ্ছিন্ন। তখনো যদি সে কবিতা লিখে যেত, তা হলে কী হত জানি না, কিন্তু অব্যবহিত-কবিতা হয়ে না ওঠায় সেই নিয়ত সংলাপের পুঁজি কোথাও জমা হয়ে যাচ্ছিল, নেপথ্যে। তাই, দু'দশক পরে সে যখন আবার কবিতা লিখতে শুরু করে তার ভিতর কোনো অপ্রস্তুতি বা জড়তা কাজ করে না। ভাষা যেন ভিতরে-ভিতরে তৈরি হয়েইছিল। এখন কাগজে কালি দিয়ে লেখা হল মাত্র।"[৩] চমৎকার বিশ্লেষণ। কিন্তু দ্বিমত পোষণ করতে হয় একটা জায়গায়, পূর্ণেন্দু পত্রী দু'দশক কবিতা লেখেননি-এটা কষ্টকল্পনা। ('ভাস্কর্যের ভাঙা হাত'-এর রচনাকালেই সে কথা স্পষ্ট, কিছু পরে 'মাধবীর জন্যে' কবিতাটি নিয়ে কথা বললে সেকথা আরো স্পষ্ট হবে।) পূর্ণেন্দু নিশ্চিতভাবেই কবিতা লিখেছেন, প্রকাশও করেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, কেবল কবিতার বই করেননি। পূর্ণেন্দু নিজেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় লিখেছেন, 'দ্বিতীয় কবিতার বই একুশ-বাইশ বছর পরে। তার মানে এই নয় যে, এই ক'বছর কবিতা লিখিনি!'[৪] এই সময়কালেই কবিতার

মধ্যে মিশেছে সেই মৌলিক সংলাপধর্মিতা এবং এটাই হয়ে উঠেছে পূর্ণেন্দুর স্বাভাবিক প্রবণতা, নিজস্ব ভঙ্গি। আর এই দু'দশকের সময়কালেই লেখা হয়েছে 'মাধবীর জন্যে'।

'মাধবীকানন'-এ মাধবীর বয়ান অনুযায়ী এই কবিতা লেখা হয়েছে ১৯৬৫ সাল নাগাদ 'স্বপ্ন নিয়ে'র শুটিং চলাকালীন। সেই সময় 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'র কাজ চলায় 'স্বপ্ন নিয়ে'র শুটিং পড়েছিল সন্ধে ছ'টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। কিন্তু শুটিং রাত বারোটা পার করে একটা, দুটো বা তিনটে পর্যন্ত গড়িয়ে যেত। পরিচালকের হুঁশ থাকত না। বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর একদিন রাত বারোটায় মাধবী মুখের মেকাপ তুলে ফেলেছিলেন (যদিও এ নিয়ে মাধবীর পূর্বোক্ত দুটি লেখায় দুরকম বয়ান দেখা যায়) এবং তা দেখে পূর্ণেন্দু রাগ না করে সেদিনের মতো প্যাকাপ করেছিলেন। মাধবী বলছেন, "তারপর একদিন 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'র কাজ শেষ হল। এবার আমি সকাল থেকেই সময় দিতে পারব। পরিচালক মশাইকে সেকথা জানালাম। পূর্ণেন্দুবাবু কোনো কথা না বলে একটা কাগজ নিয়ে কী লিখতে আরম্ভ করলেন। তখন দেখাননি। পরবর্তী কালে প্রকাশ পেল, সেটা ছিল একটা কবিতা।"[৫] মাধবীর মতে এই কবিতাই 'মাধবীর জন্যে'[৬]। পরে পূর্ণেন্দু নিজে মুখে মাধবীর কাছে সেকথার উল্লেখ করেছিলেন কি না বা মাধবী আর কীভাবে অতখানি নিশ্চিত হলেন সেকথার কোনও স্থূল প্রমাণ নেই। কবিতার দিকে চোখ রেখে বিচার করা যাক।

কবিতায় আমরা দেখতে পাই একটি গভীর অভিমান, এক স্বাভাবিক দূরত্ব এবং এক না হয়ে ওঠা গল্প। মাধবীকে পূর্ণেন্দু 'আপনি' সম্বোধন করতেন। কবিতাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কবিতাটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলেই বোঝা যায় ওখানে কবি ও পরিচালক মাধবীকে সম্বোধন করে এই কবিতা লিখলেও মাঝে মাঝেই মাধবীকে সামনে রেখে আসলে নিজের সঙ্গেও কথা বলছেন। কবিতাটি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যেন একটি সিনেমার শুটিং চলছে। কিন্তু আসলে এ তো জীবনের চিত্রনাট্য। কবিতার প্রথমেই থাকছে একটি আয়না, যার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন মাধবী (আসলে পূর্ণেন্দু)। সেই আয়নার পাশে আঁকতে বলা হচ্ছে 'অন্ধকার ছায়া'। দৃশ্য ব্যথিত এবং তার পট জুড়ে থাকছে 'চিত্রিত আঁধার'। পরের লাইনেই কবি বলছেন, 'দেওয়ালের ছবিটাকে একটু সরাতে হবে ভাই।' কোন ছবি? যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, 'জুলিয়েট জ্যোৎস্নার ভিতরে/ রক্তে উচ্চকিত তৃষ্ণা রোমিওর উষ্ণ ওষ্ঠাধরে।' অর্থাৎ সংরক্ত প্রেম। এই প্রেম এবং তার উচ্চকিত ভঙ্গিকে সরিয়ে রাখতে হবে? কার প্রেমকে সরিয়ে রাখতে বলছেন পূর্ণেন্দু? আর কাকেই বা 'ভাই' সম্বোধন করছেন? 'ভাই' সম্বোধন করছেন নিজেকে। নিজের প্রতি নিজের সহমর্মিতা বোধ থেকে নিজেকে 'ভাই' বলে নিজের প্রেমকেই সরিয়ে রাখতে বলছেন তিনি।

এবার তিনি ডাকছেন মাধবীকে। সেই ব্যথিত দৃশ্যের মাঝে এসে মাধবীকে দাঁড়াতে বলছেন। 'লাইটস বার্ণিং'। আলো জ্বলছে। ব্যথিত দৃশ্যের মাঝে এই 'লাইটস বার্ণিং'কে কবির অন্তর্দাহ বলেই মনে হয়। এখন মাধবীর একটি ক্লোজআপ নেবেন কবি। কবি বলেন, 'এখানে দাঁড়ান, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে প্লিজ।' বাঁ দিক? মানে হৃদয়ের কাছাকাছি? এবার 'মনিটর...' বুকের পর্দায় মাধবীকে রেখে নিজের মুখের সংলাপ মাধবীকে বলতে বলেন, 'কিছু লাভ আছে মনে রেখে?' কী মনে রেখে লাভ নেই? ছোট ছোট অভিমান, যা মনে রাখলে দূরত্বের আড়ালে আসলে নৈকট্য বাড়ে?

কিন্তু বেশি স্পষ্ট না বরং নির্জন স্বরে এই কথা বলতে বলেন কবি। যেন স্বগতোক্তি, 'নিজের আত্মার সঙ্গে কথোপকথন।' 'যেন মনে হয়/ওষ্ঠ হতে উচ্চারিত কয়েকটি শীতল বাক্য নয়।' বরং এই সংলাপে থাকবে সন্ধ্যাপৃথিবীর বনবীথিতলে ঝরতে থাকা অবসন্ন কুসুমের নীরব রোদন। লক্ষ করার মতো বিষয়, কুসুম মানে কুঁড়ি, ফুল নয়। অর্থাৎ যার সম্ভাবনা ছিল অথচ ফুটতে পারল না। অবসন্ন মনে ঝরে যাওয়ার যে রোদন, সেই নীরবতায় পূর্বোক্ত সংলাপের আড়ালে আসলে যে কথা বলতে চাওয়া, তা হলো– 'মনে রেখো, মনে রেখো সখা,/ যেন কেহ কোনোদিন মনে রাখে নাই/ মনে আর রাখিবে না।' এখানে এসে কবিতায় আর কবির মনে যে বেদনাময় টানাপোড়েন জেগে ওঠে তা আর পাঠকের অগোচরে থাকে না। কবিই সে আড়াল রাখতে চান না। পাঠকের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেন বইয়ের পাতার মতো। কিন্তু কবি বুঝতে পারেন 'জ্যোৎস্নার ভিতরে কোথাও আহ্বান নেই আর'। আহ্বানহীন 'জ্যোৎস্নার ভিতরে' 'গোলাপের মহিমায় ফুটে' থাকা উষ্ণ ওষ্ঠাধরের এখন কেবল নিদারুণ অপেক্ষা, 'কবে পাখি বলে যাবে, রাত্রি হলো অবসান বনবীথিতলে।' কোন রাত্রি? নীরব রোদনের সন্ধ্যা পেরিয়ে যে রাতে প্রাণ আসল কথা বলতে চায়, 'মনে রেখো, মনে রেখো সখা'। আসলে মনে রাখতে নেই, এই কথাও কবি জানেন। তাই সেই না হয়ে ওঠা গল্পের নিদারুণ ভবিতব্যের জন্য এই নিদারুণ অপেক্ষা।

রাত্রির অবসান হয়েছে। প্রেম এখন অন্তঃসলীলা নদী। দৃষ্টিও নত। কারণ 'সম্মুখে কোথাও কোনো দেখিবার মত দৃশ্য নাই।' অপেক্ষা আর টানাপোড়েন থেকে বাস্তবের মাটিতে নামলে চোখের সামনে দেখবার মতো কোনো দৃশ্য থাকে না; সব দৃশ্য বন্ধক দিয়ে আসতে হয় স্বপ্নের কাছে। লক্ষণীয় কবিতায় দুবার সাধুভাষার প্রয়োগ হল। এবং এই দুটি কথাই অলঙ্ঘনীয় সত্য। এক, "মনে রেখো, মনে রেখো সখা,/ যেন কেহ কোনোদিন মনে রাখে নাই/ মনে আর রাখিবে না।" এবং দুই, 'সম্মুখে কোথাও কোনো দেখিবার মতো দৃশ্য নাই।'

এখন কেবল "নিবন্ত ধূপের সাদা ছাই/ রজনী-পোয়ানো কিছু মৃত গোলাপের দীর্ঘশ্বাস/ হাঁ-করা নেকড়ের মুখে দগ্ধ সিগারেট/ এইটুকু দৃশ্য শুধু পড়ে আছে কাঠের টেবিলে।" অর্থাৎ সমস্ত না হয়ে ওঠা গল্প আর ব্যর্থ মনোরথের ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য। তারপর আবারও 'লাইটস্‌বার্ণিং', কিন্তু এবার সত্যি অভিনয়, যেমন আমরা আমাদের জীবনে করে থাকি। তাই এবার মাধবীরও মুখে 'মেক-আপ'। যে মেক-আপ নিয়ে একটা ছোট অভিমানের সূত্রপাত তা বাঁকবদল করে এসে দাঁড়ায় জীবনের রঙ্গমঞ্চে। 'এবার টেকিং।' কবি মনে করিয়ে দেন, "মাধবী, নিশ্চয়ই মনে আছে সংক্ষিপ্ত সংলাপটুকু/ 'কিছু লাভ আছে মনে রেখে?"

এভাবেই পরিচালক ও মাধবী নিজেদের পার্থিব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে হয়ে উঠছেন এমন দুই মানব মানবী যাদের মধ্যে এক গল্পের জন্ম হয় কিন্তু সেই চারাকে মেরে ফেলাও যায় না বাড়তে দেওয়াও যায় না। তাই মানব এসে আশ্রয় নেন কবিতার কাছে আর সেই না-পাওয়া কিংবা না-পেতে-চাওয়া মানবীকে সযত্নে এঁকে রাখেন সেই কবিতায়।

মাধবী বলেছিলেন, 'অনেকেরই ধারণা যে, পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে বোধহয় আমার একটা রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল। হ্যাঁ, রোমান্টিক সম্পর্ক একটা ছিল আমাদের মধ্যে।'[৭] কিন্তু এও জানিয়েছেন, 'মানব-মানবী হিসেবে' পূর্ণেন্দু এবং তাঁর মধ্যে 'কোন স্থূল ভালবাসা ছিল না।' ছিল 'শিল্পীর রোমান্টিকতা'। 'শিল্পীর রোমান্টিকতা হল, এক

শিল্পী আরেক শিল্পীকে ভালবাসে অর্থাৎ শিল্পীর শিল্পকে, শিল্প-কর্মকে ভালবাসা।'৮ 'স্থূল ভালবাসা'য় বৈধতা-অবৈধতার পাঠ আমাদের নিতেই হয় কিন্তু কবিতায় বা শিল্পে বৈধ বা অবৈধ বলে তো কিছু হয় না। তাই দৃশ্যপট থেকে রোমিও-জুলিয়েটের ছবি 'একটু সরাতে' হলেও ভালোবাসা আপন গভীর 'পুলকবেদনা' নিয়ে কবিতায়, ছবিতে থেকেই যায়।

মাধবী ছিলেন পূর্ণেন্দুর অনুপ্রেরণা। ১৯৯৮ সালে এই 'প্রেরণা'কে তিনি বলেছিলেন রটনা, পরে নিজের আত্মজীবনীতে নিজেই স্বীকার করলেন সেকথার সত্যতা। মাধবী বলেছেন, 'আমি চেষ্টা করেছি তাঁকে সাহস দিতে, অনুপ্রাণিত করতে, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও আমার সাধ্য কতটুকু?'[৯] পূর্ণেন্দুও বলেছেন মাধবীর কথা, 'মাধবী না থাকলে আমি ছবি করতে পারতাম না'। মাধবী প্রেরণাদাত্রী হিসেবে নিজের কথা বলতে গিয়ে এ-ও বলেছেন, 'দেশলাই কাঠির আগায় যেমন বারুদ থাকে, দেশলাই বাক্সের গায়েও তেমনই বারুদ লাগানো থাকে। দুইয়ের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে ওঠে। আমি ওই বাক্সের গায়ে লাগানো বারুদের ভূমিকা পালন করে গিয়েছি।'[১০] হ্যাঁ, আগুন জ্বলেছে; আর আলোও। সেই আলো এসে পড়েছে কবির মনে। কবিতার জন্ম হয়েছে। 'মাধবীর জন্যে' সেই আলো এসে ছুঁয়েছে পাঠকের হৃদয়।

অতএব কোথা থেকে 'মাধবীর জন্যে' কবিতার জন্ম তা স্পষ্ট হলো। পাশাপাশি এও প্রমাণিত হলো যে চলচ্চিত্রের সঙ্গে পূর্ণেন্দুর সুগভীর যোগ এই কবিতা রচনার অন্যতম ভিত্তিভূমি। আমরা আগেই জেনেছি, 'মাধবীর জন্যে' কবিতাটিতে প্রথম প্রত্যক্ষ সংলাপধর্মিতা উঠে এসেছে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে পূর্ণেন্দুর চলচ্চিত্র চর্চা এতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। পূর্ণেন্দুর সিনেমার চিত্রনাট্যে যেমন অখণ্ড কবিমনের প্রকাশ পায় তেমনই কবিতায় প্রভাব ফেলে সেই চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের নেপথ্য কাহিনি। আর এভাবেই চলচ্চিত্রের সংলাপধর্মিতার ছায়া অবলীলায় মিশে যায় কবিতার শরীরে।

আমরা এতক্ষণে জেনেছি এই 'স্বপ্ন নিয়ে' চলচ্চিত্রেই পরিপুষ্টি লাভ করে জন্ম নিয়ে 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত' কাব্যনাট্যটি। সিনেমার একটি দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল, বিজন জমিদার বাড়ির পুরাতন বাগান থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে ভাস্কর্যের একটি ভাঙা হাত। সেই ভাঙা হাত-ই হয়ে উঠল এই কাব্যনাট্যের প্রাণবস্তু।

'সিঁড়িতে বিদায় দৃশ্য' মাধবী আর বিজনের সংলাপ-সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু পরিমার্জনার পর 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত'[১১]-এ সেই সংলাপ তৈরি হল মাধবী ও পরিচালকের মধ্যে। বিজনের সঙ্গে মাধবীর কথোপকথন কোন খাতে বয়েছিল তা আমরা জানিনা। কিন্তু সিনেমার বিজন চরিত্রটিকে যিনি নির্মাণ করেছেন সেই পরিচালকের সঙ্গে মাধবীর যে কথোপকথন আমাদের সামনে আছে তা থেকে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় এই বিজন, পরিচালকেরই একটি ছায়া। সিনেমার সবকটি চরিত্রেরই সুতো বাঁধা থাকে পরিচালকের হাতে। কিন্তু মাধবীকে এখানে আর কেবল সিনেমার চরিত্র করে রাখেন না পূর্ণেন্দু। তাই মাধবী সিনেমার চরিত্রের নামে এই কাব্যনাট্যে উপস্থিত থাকেন না, থাকেন নিজের নামে, স্বমহিমায়। এবং সারা কাব্যনাট্যে পূর্ণেন্দু পরিচালক হয়ে মাধবীকে এটাই বোঝাতে থাকেন, কেন সিঁড়িতে বিজনকে বিদায় দেওয়ার সময় মাধবীর চোখে জল এসেছিল, কেন তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বিসর্জনে ডুবতে থাকার বেদনায় ভারাক্রান্ত, নত।

বিজনের সঙ্গে মাধবীর 'চেনাজানা মাত্র দুদিনের'। মাধবী 'তার অস্তিত্বের অলিগলি রাজপথ' কিছুই জানেন না।

বিজনও মাধবীর 'জীবনের জাহাজডুবির/ নথিপত্র জেনে যাবে, চেনাজানা অত দীর্ঘ নয়।' প্রেম-ভালোবাসার অবকাশ ঘটনাচক্রের কোনোখানেই ছিল না। পরিচালক প্রশ্ন করেন, কিন্তু তাও বিজনের চলে যাওয়ার সময়, সিঁড়িতে বিদায় দৃশ্যে কেন মাধবীর চোখে দেখা দিয়েছিল 'অশ্রুর চিকন রেখা'? মাধবী উত্তরে বলেন 'চিত্রনাট্যে ছিল।' পরিচালক প্রত্যুত্তরে বলেন, 'চিত্রনাট্যে অশ্রু লেখা থাকে।/ অশ্রু তো থাকে না।' তবে কীভাবে গ্লিসারিন ছাড়াই সেই অশ্রু দেখা দিল মাধবীর চোখে?

বিজনের প্রতি 'প্রেম', 'ভালোবাসা' কিংবা 'গভীর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মাথা-উঁচু-করা সাধ' থেকে যখন এই অশ্রু আসেনি তখন নিশ্চয়ই 'আরো বড় কোনো ডানার ঝাপট' কিংবা 'আরো কোনো নিমগ্ন খনন' এখানে আছে। আছে চাওয়া-পাওয়ার বৈপরীত্যের গভীর বেদনা। আসলে বিজন, মাধবীর অন্তরকে চিনেছিল একথা প্রমাণ হবে একটু পরেই। এবং তার সূত্র ধরিয়ে দেন স্বয়ং মাধবী-ই। মাধবী বলেন, "যে-শিকড় উপড়োনো আদৌ সহজসাধ্য নয়/ একমাত্র কুড়োলে কেটে রক্তপাত ছাড়া,/ বিজনবাবু কি তাঁকে সত্যি সত্যি আরোগ্য চেনাবে?"

পূর্ণেন্দু বলেন, রক্তকরবীর রাজার মতো মাধবীকেও একটি ছিদ্রহীন জাল ঘিরে আছে। বিজনের সাধ্য নেই তা থেকে মাধবীকে মুক্ত করে। কিন্তু বিজনের "তো কৃতিত্ব একটাই/ সুখী গৃহিণীর তৃপ্ত ছদ্মবেশখানা ছিঁড়ে খুঁড়ে/ সে তো ঠিকই বুঝে গেছে" যে মাধবী ভালো নেই। যে সংসার সাজানো মনে হয় বাইরে থেকে তার ভেতরে কোনো প্রাণ নেই- নেই স্বামীর সঙ্গে সুসম্পর্কের কোনো সহাবস্থান। মাধবী ভুল ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া সেই খাম 'যার মধ্যে রয়ে গেছে ভাষা-স্তবকের ভিন্ন ঘ্রাণ।' এভাবেই বিজন মাধবীর অন্তরকে চিনে যায়। ভাস্কর্য সুন্দর কিন্তু অযাচিত সংসারের আগাছার ভারে পড়ে থাকা ভাস্কর্যের ভাঙা হাতটি নির্মম বেদনার। 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত'-এর মধ্যে যে বেদনার দ্যোতনা আছে, মাধবীর মধ্যেও আছে তেমনই সুপ্ত বেদনা। অচরিতার্থ জীবনের পরিচালক বিজন হয়ে যেমন ভাঙা হাত খুঁজে নিয়েছিল তেমনই অনুভব করতে পেরেছিল মাধবীর ভাঙা জীবনের বেদনার অন্তর্লীন গান। সেকারণেই মাধবীর চোখে জল। এখানে কি কোথাও বাস্তবের মাধবী আর সিনেমার চরিত্রাভিনেত্রী মাধবীকে এক করে দিলেন কবি? এবং সেই অভীপ্সাতেই কি 'সিঁড়িতে বিদায় দৃশ্য' বদলে হল 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত' এবং নিজের সৃষ্ট বিজন চরিত্রের জায়গায় আপাত নিরপেক্ষতা ও দূরত্ব নিয়ে পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং পরিচালক? বাস্তবের সত্য কী বলে জানা নেই, কাব্যের সত্য এই প্রশ্নের দিকেই আমাদের ধাবিত করে।

তথ্যসূত্র :

১. মাধবী মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০১২, মাধবীকানন, প্রথম প্রকাশ, চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রা: লি:, ১৩ বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০১২, পৃ. ১৫৪-১৫৫

২. https://www.uttarbangasambad.com/madhabi-mukherjee-nirmalkumar-chemistry-remains-same-after-separation/

৩. সম্পা. মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪, পূর্ণেন্দু পত্রী : শিল্পী ও ব্যক্তি, প্রথম প্রকাশ, সমন্বয়, ৪৪৬ পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা ৭০০০৬০, পৃ. ৫০-৫১

৪. পূর্ণেন্দু পত্রী, নভেম্বর ২০১৭, পূর্ণেন্দু পত্রীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,

কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৯

৫. মাধবী মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০১২, মাধবীকানন, প্রথম প্রকাশ, চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রা: লি:, ১৩ বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০১২, পৃ. ১৫০

৬. পূর্ণেন্দু পত্রী, নভেম্বর ২০১৭, পূর্ণেন্দু পত্রীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৯-৪০

৭. সম্পা. তপন কর, ১৭ জুলাই ১৯৯৮, পূর্ণেন্দু পত্রী : এক বহুমুখী প্রতিভা, প্রথম প্রকাশ, আলেয়া প্রকাশনী, কানাইপুর, বাঁটুল, হাওড়া ৭১১৩১২, পৃ. ১৭০

৮. ঐ, পৃ. ১৭০

৯. মাধবী মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০১২, মাধবীকানন, প্রথম প্রকাশ, চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রা: লি:, ১৩ বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০১২, পৃ. ১৫৪

১০. ঐ, পৃ. ১৫৪

১১. পূর্ণেন্দু পত্রী, জানুয়ারি ১৯৯৮, কাব্যনাট্য, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৬১-৬৯

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 83-105

চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যভাবনা বনাম চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যপ্রেম

শেলী দত্ত

সারসংক্ষেপ

বৈষ্ণবীয় সাহিত্যের মুখ্য রস হচ্ছে 'মধুর' রস যেখানে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসও বর্তমান। যা পর্যায়ক্রমে হৃদয়লোকে দানা বাঁধে আর এই রসের ভিত্তিতেই ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে বাঁধা পড়েন। তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দাস্য রস আর বৈষ্ণব সমাজেও দাস্যরসের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। তাই চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের রচনাতেও যেমন দাস্যরস বর্তমান ছিল তেমনি চৈতন্য পরবর্তী রচনাতেও দাস্যরসের কথা এসেছে বিভিন্ন ভাবে। রস হচ্ছে ভাবেরই প্রকাশ তাই এই দাস্যভাবনা ভক্তের ভাবকে আশ্রয় করে মধুরে এসে প্রেমে (দাস্যপ্রেম) পরিণত হয় যা চৈতন্য পরবর্তী যুগে এসেই সম্ভব হয়েছিল। চৈতন্য পূর্ববর্তী এই যে দাস্যভাব চৈতন্য পরবর্তীতে দাস্যপ্রেমে পরিণত হওয়ার যে পথ তা নির্দিষ্ট করারই প্রয়াস করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

শেলী দত্ত
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
তিনসুকিয়া মহাবিদ্যালয়
আসাম, ভারত
e-mail: dttamomi@gmail.com

বীজ শব্দ

দাস্যভাবনা, দাস্যপ্রেম, বৈষ্ণবীয় বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, কৈতব ভক্তি, অকৈতব ভক্তি

গবেষণার উদ্দেশ্য

বৈষ্ণব পদাবলি নিয়ে অনেক আলোচনা চোখে পড়েছে, তবে সরাসরি এই বিষয়টির উপর কোনো আলোচক অথবা লেখকই তেমনভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেননি, তাই সহায়ক গ্রন্থের সাহায্যে উক্ত বিষয়টিকে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে চৈতন্য পূর্ববর্তী আর চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন করার প্রয়াস করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন আকরগ্রন্থ, সমালোচনা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

মধ্যযুগে সর্বভারতীয় স্তরে ভক্তিকে নিয়ে গড়ে ওঠা ভক্তিআন্দোলন, আসলেই ছিল মানবতাবাদকে স্বীকৃতি দেওয়ার লড়াই, তাই ভক্তিতেও মানবতাবাদ ফুটে উঠেছিল সেদিন, স্থানে স্থানে এক একজন পথিক হয়েছিলেন এর কর্ণধার, আর সেই সূত্র ধরেই বঙ্গে এলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি হয়ে উঠলেন মধ্যযুগের মধ্যমণি, তাই মধ্যযুগীয় সাহিত্যসমূহকে যে দুটি ধারায় ভাগ করা হয়েছে, সেখানে চৈতন্যকে সামনে রেখেই এই দুই ধারার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে, এই কথা মাথায় রেখেই উক্ত অধ্যায়কেও চৈতন্য পূর্ববর্তী এবং চৈতন্য পরবর্তী এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যভাবনা

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম তথা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। সেই দ্বাদশ শতকেই, যখন জয়দেব এলেন। জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও তার হাতেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ প্রথম পাওয়া গেছে বলে বাংলায় মেনে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশেও বৈষ্ণবদের একটি ধারা সেসময় উজ্জীবিত ছিল, সঙ্গে বিষ্ণুর উপাসনাও ছিল। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমমহিমা বর্ণন ও ভজন-কীর্তন-নৃত্য ইত্যাদিতে মগ্ন ছিলেন। এঁরা রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন, এককথায় বলতে গেলে এঁরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; যদিও, সংখ্যাগরিষ্ঠ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁদের যোগ নেই বললেই চলে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বৈষ্ণব সহজিয়ারা জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ুচণ্ডীদাসকে সহজিয়া ধর্মপ্রবর্তকের পূর্বসূরী বলে গণ্য করেন।[১] তাঁদের রচিত পদ বৈষ্ণব পদাবলির অন্তর্ভুক্ত হলেও অনেকেই তাঁদের পদগুলোকে'শুদ্ধ বৈষ্ণবপদের' (যে সমস্ত পদ চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পর রচিত হয়) আখ্যা থেকে বিরত রেখেছেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন–

> "চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রচলিত সংস্করণে যেসব পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সম্বন্ধযুক্ত পদের মিশ্রণ আছে।"[২]

এখানে প্রথমত, একাধিক চণ্ডীদাস, আর চৈতন্যপরবর্তী কোনো এক চণ্ডীদাসের উপস্থিতি এবং পদের মিশ্রণ ঘটেছে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে অনেকেই এই একাধিক চণ্ডীদাসের উপস্থিতিকে স্বীকার করেছেন, বাংলা সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাস নিয়ে অনেক বিতর্কও রয়েছে। তাঁদের মত এই যে, যিনি "সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম / কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো / আকুল করিল মোর প্রাণ।"[৩] এই পদটি লিখেছেন, তিনি কখনই চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কবি হতে পারেন না। কারণ এই পদে 'নামমাহাত্ম্য' এসেছে, এসেছে জপের প্রসঙ্গ। যে 'জপমাহাত্ম্য' চৈতন্যই বঙ্গদেশে নিয়ে এসেছিলেন–

> (ক) "কলিকালের নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
> নাম হৈতে হয় সর্বজগৎ নিস্তার।।"[৪]

(খ) "প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র,
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ।।
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার,
সর্বক্ষণ বলো ইথে বিধি নাহি আর।।"[৫]

(গ) "কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব
যেই যপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভার।।"[৬]

ইত্যাদি

চৈতন্য জীবনীকাব্যের এমন দৃষ্টান্ত আরোও অনেক রয়েছে, যা বঙ্গদেশে চৈতন্যের 'নামমাহাত্ম্য' প্রচারের স্বাক্ষর বহন করছে। কাজেই চণ্ডীদাস যখন লিখলেন "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিলো গো / কেমনে বা পাসরিব তারে"[৭], তখনই এই কবি যে চৈতন্যপরবর্তী যুগের এই দিকটি আরোও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কাজেই চণ্ডীদাসের পদে ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করার যে প্রক্রিয়া তা চৈতন্য পরবর্তী যুগের ভাবনার আদলেই রচিত বলে মেনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এবার উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপরে উল্লেখ্য বক্তব্যের দ্বিতীয়ত যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা আলোকপাত করা যেতে পারে।

'শুদ্ধ বৈষ্ণবদের সহিত সহজিয়া মতের সম্বন্ধযুক্ত পদের মিশ্রণ আছে' অর্থাৎ সহজিয়া পদগুলো শুদ্ধ বৈষ্ণবপদ যে নয় প্রকারান্তরে এই দিকটিও ব্যক্ত করা হয়েছে। এই পার্থক্যের হেতু বিচার করলে যে কারণগুলো দাঁড়ায় তা হচ্ছে–

(১) চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন যেসমস্ত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদের অনুসরণ করেছিলেন তা ছিল প্রেমের প্রতীক। নিতান্তই কামনানির্ভর। আসলে মানুষের/সমাজের মনের খোরাক, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সাহিত্যের রূপ গ্রহণ করে, সেদিক থেকে তখনকার সমাজের চাহিদাকে বজিয়ে রেখেই রাধাকৃষ্ণের পদগুলো রচিত হয়েছিল। তাই উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আরোও লিখেছেন, "পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কীভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করলে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে এইসব রচনার মূলে কোনো ধর্মের প্রেরণা ছিল না, ইহা ছিল নিতান্তই কাব্যগত প্রেরণা।"[৮] আবার শশীভূষণ দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে লিখছেন, "যে 'গীতগোবিন্দ'-এ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা দেখতে পাই, তাহাতে আধ্যাত্মিক আবহাওয়া অপেক্ষা কাব্যের আবহাওয়াই স্ফুটতর।"[৯] স্বভাবতই এই সময়ে জাত ভক্তিও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সেই 'প্রেমভক্তির' সূচক ছিল না, একথা সহজেই বলা যায়, কারণ 'বিলাসকলার' মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি তখনকার বৈষ্ণবীয় কুল খুঁজছিল তা কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা (পরবর্তী আলোচনায় এই দিকটি আরও স্পষ্ট করা হবে)।

(২) চৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম 'রাগমার্গে' ভজনকে প্রাধান্য দিয়েছিল। তাই 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বলা হয়েছে "রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম"[১০] কিন্তু সহজিয়ারা ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত সাধনার অধীন, ফলে তাঁরা

পার্থিব চাওয়া-পাওয়াকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাই তাঁরা ধর্মে ও বিধিবদ্ধ কর্মে মনোযোগী ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে যোগসাধনার উল্লেখ এই দিকটিই প্রমাণ করে সঙ্গে ইড়া, পিঙ্গলা শব্দাদির ব্যবহারে চৈতন্যপূর্ববর্তী কবিদের সহজিয়াপন্থার অনুসরণকে আরও স্পষ্টতর করে তোলে যা জ্ঞানমার্গাধীন আর গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে তাঁদের বিন্যস্ত করে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হল,

"অহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রেহাই।।
মূল কমলে করিলে মধুপান।
এঁবে পাইঞা আহ্মে ব্রহ্মগেয়ান।।
দূর আনুসর সুন্দরি রাহি
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী।।
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না সন্ধী।
মন পবন তাত কৈলো বন্দী।।
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট।"[১১]

প্রসঙ্গে বিশেষ করে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, "ইহাতে মন পবন, মূল কমল, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, দশমী দুয়ার– পাবিধানিক শব্দগুলো হঠযোগ ও সহজযানে প্রচলিত। ইহাতে মনে হয় বড়ু চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন।"[১২] সে যাই হোক চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতি, বড়ুচণ্ডীদাস, দ্বিজচণ্ডীদাস আদির সহজিয়া সাধন-ভজনজ্ঞাপক 'রাগাত্মিকা' পদের মধ্যেই যে সেদিন বৈষ্ণবীয় পদের ধারাটি রক্ষিত ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না, উদাহরণের মধ্য দিয়ে এই দিকগুলো আলোকপাত করা যেতে পারে–

(ক) "এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।"[১৩]

–চণ্ডীদাস

(খ) "কৈছনে যাইব যমুনা তীর
কৈছে নেহার কুঞ্জ কুটীর।।
সহচরী সঙ্গে যাঁহা কয়ল ফুল খেরি
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি।।"[১৪]

–বিদ্যাপতি

দেখা যায়, এই পদসাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় প্রেম কবিতারই ধারক। তাঁরা জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক নর-নারীর চেতন-অবচেতন প্রেমের গাঁথাই লিখেছেন। কিশোর কিশোরীর এই প্রেমেই বৈষ্ণব পদকর্তাদের

আধ্যাত্মসাধনার ভাবময় অবয়বকে রূপায়িত করেছে। যেখানে পদকর্তাদের অজ্ঞাতসারেই দাস্যভাবের স্ফূরণ ঘটেছে, যা চৈতন্যপূর্ববর্তী পদসাহিত্যে 'দাস্য' বিশ্বাসের স্বাক্ষর বহন করছে। তাই দেখা যায় বড়ুচণ্ডীদাসের রাধা বলছে–

"কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবো আপনা।।"[১৫]

রাধার দাসী হয়ে কৃষ্ণের পদে নিজেকে সমর্পণ দাসভাবনারই প্রতীক। যে দাস্যভাবনার আঁকরেই রয়েছে 'প্রভুর চরণ', রাধা এখানে প্রেয়সীরূপে প্রভুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে চাইছে, যা সরাসরি দাসভাবনাকে সূচিত করে। পদাবলি সাহিত্যে এই 'চরণ'– প্রসঙ্গ বরাবরই আসতে দেখা গেছে, চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম না। 'নিবেদন' পর্যায়ের চণ্ডীদাসের রাধা বলছে–

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।।"[১৬]

উক্ত পদে রাধার আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা স্পষ্ট। প্রেমের চরম পর্যায়ে এসে রাধা তার দেহ, মন, কুল, শীল, জাতি, মান সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণের চরণে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এখানে পাপ-পুণ্য রাধার কাছে দুইই সমান, কেননা শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলই তার কাছে সর্বস্ব। উদাহরণের মধ্য দিয়ে একথা স্পষ্ট যে, প্রেমমনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপের বর্ণনার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবকবিরা অজান্তেই স্রষ্টার চরণে দাস্যভাবের স্ফূরণ ঘটিয়েছেন। তাই জনমে জনমে তাঁরা সেই স্রষ্টাকেই চাইছেন, সেই চরণই তাঁদের একমাত্র স্থান বলে নির্ণিত হোক একথা বারবারই প্রকাশ করেছেন তাঁরা। এদিকে বিদ্যাপতি লিখেছেন–

"মাধব বহু মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়।।"[১৭]

কবির এই আত্মগত অনুভূতির মধ্যে ভক্তের ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের সুর ধ্বনিত হয়েছে, যা দাস্যভাবকে সূচিত করে, এই তিল-তুলসী অর্পণ, প্রভুর চরণে প্রদান করা অর্ঘ্য প্রভুর জন্য করা ভক্তের কার্যকে নির্দিষ্ট করে, যা সরাসরি অর্থেই দাস্যভাবনার উপস্থিতিকে সূচিত করে।

বলা প্রয়োজন যে, বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজসভার কবি, আর তিনি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' কাব্য লিখেছিলেন। কাজেই একথা স্বীকার্য যে তিনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব কবি ছিলেননা। অদ্বৈতের জীবনী

থেকে একথা আরোও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সেখানে পাওয়া যায় যে, যখন অদ্বৈত দেখলেন গাছের নীচে বসে একজন রাধাকৃষ্ণের গানকীর্তন করছেন তখন তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে প্রত্যুত্তরে গায়ককবি বলেন–

"বিপ্র কহে দ্বিজ আমি নাম বিদ্যাপতি
রাজান্ন ভোজনে মোর বিষয়তে মতি।
বাতুলতা করি মুই রচিনু এই সংগীত।"

এখানে বিদ্যাপতির বাচনিক তিনি যে রাজসভার কবি, আর তিনি যে'বাতুলতা' করেই কৃষ্ণের পদ রচনা করেছেন একথা স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে বিদ্যাপতির উক্ত কথার উত্তরে অদ্বৈত মহাপ্রভু যা বললেন তা প্রণিধানযোগ্য–

"অপূর্ব রচিত এই তোমার সংগীত
মুই কোন ছাড় স্বয়ং কৃষ্ণ হয় আকর্ষিত।"

কাজেই রাজসভার কবি বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' লিখলেও, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবকবি না হলেও বাঙালিরা তাঁকে গ্রহণ করেছিল। উপরন্তু বিদ্যাপতির রচনা পরবর্তীকালে চৈতন্যকেও আকর্ষিত করেছিল এবং চৈতন্য তাঁকে আস্বাদন করেছিলেন। সেই বিদ্যাপতির পদেও সরাসরি দাস্যভাবনা ছিল। এর উদাহরণ তাঁর আরও কয়েকটি পদের মধ্য দিয়ে দেখানো যেতে পারে। 'প্রার্থনা' পর্যায়ে বিদ্যাপতির রাধা বলছে–

(i) "আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমনি রঙ্গ রসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা।"[১৮]

(ii) "এ হরি বন্দোঁ তুঅ পদ নায়
তুঅ পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়।।
জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবিলুঁ
জুবতী মতিময় মেলি।"[১৯]

উক্ত পদদ্বয়ে'পদ' (চরণ অর্থে) এবং 'ভজনা' শব্দের ব্যবহার 'দাস্যভাবনাকে' সূচিত করে। এই পদগুলোতে রাধা আক্ষেপ করছে জীবনের অনেকগুলো সময় (শৈশব ও কৈশোরকাল) শ্রীকৃষ্ণের 'ভজনা' বিহীন, 'চরণবন্দনা' বিহীন বৃথা অপচয় করার জন্যে। পক্ষান্তরে এদিকটিও স্পষ্ট যে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা অর্থাৎ 'সেবা' (√ভজ জাত ভজনা যার অর্থ সেবা) করার স্পৃহা রাধার মনে সেইসময় জাগ্রত হয়েছে বলেই পূর্বেকার শ্রীকৃষ্ণের সেবাবিহিত সময়কে ধিক্কার জানাচ্ছে। রাধার এই স্বভাববৈচিত্র্য সরাসরি দাস্যভাবের অন্তর্গত।

তবে একথাও সত্য, প্রাকচৈতন্য যুগের বৈষ্ণবপদাবলির এই 'দাস্যভাবনা', তা যে কোনো বিশেষ 'তত্ত্বের রস ভাষ্য' একথা ঠিক বলা যায়না, কেননা চৈতন্যপূর্ববর্তী পদগুলোতে কৃষ্ণের মাধুর্য এবং ঐশ্বর্যরূপের মধ্যে কোনো ভেদরেখা টানা হয়নি, অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কৃষ্ণ স্বয়ং নিজের ঐশ্বর্য রূপের কথা বলেছেন,

"তীন ভুবনে রাধা আহ্মে অধিকারী
বাছিআঁ সে পালি রাধা আহ্মাক ভারী।।"[২০]

আবার,

"কংস বধিবারে মোএ কৈলোঁ অবতার
এবেঁ কি বহিব আহ্মে তোর দধিভার।।"[২১]

এখানে বড়ুচণ্ডীদাসের কৃষ্ণ ত্রিভুবনের অধিকারী। এখানে তাঁর ঐশ্বর্যরূপ প্রতিফলিত। বলা প্রয়োজন যে ঈশ্বরকে ঐশ্বর্যময় করে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে মালাধর বসুর স্থান সর্বোপরি (গুণরাজ খান ছদ্মনামে)। তিনি যে ভাগবত অনুবাদ করে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' লিখেছেন, সেখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের প্রসঙ্গ বারবারই এসেছে, আর একথা অকপটে স্বীকার করা হয়েছে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায়। ভূমিকাকার লিখেছেন–

"প্রাকচৈতন্য যুগের শ্রীকৃষ্ণ লীলা সাধনের দুইটি ধারা দেখা যায়, একটি ধারায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও ভগবত্তার উপর বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে। অপর ধারায় বৃন্দাবন লীলার অন্তর্গত শৃঙ্গার রসের বর্ণনা বেশি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়রামানন্দ প্রভৃতি শেষোক্তধারার কবি– ইহারা প্রধানতঃ বৃন্দাবনলীলার গোপীপ্রেমের বর্ণনাই করিয়াছেন। আর মালাধর এবং আরও অনেক কবি প্রথম ধারা অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যকে মুখ্য স্থান দিয়াছেন।"[২২]

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র প্রায়ভাগ স্থান জুড়েই রয়েছে যুদ্ধের বর্ণনা। যেখানে প্রবল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করছেন কৃষ্ণ, যা কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের ধারক। তাছাড়া "কবি ঐশ্বর্য বর্ণনা করতেই ভালোবাসেন বলিয়া উদ্ধব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন। ভাগবতে উদ্ধবের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা নাই।"[২৩] ঈশ্বর যেখানে ঐশ্বর্যময়, যেখানে তিনি অনাদি-অনন্ত-সর্বশক্তিমান-ত্রিভুবনধারী সেখানে ভক্ত স্বভাবতই তাঁর চরণসেবায় নিমগ্ন থাকবে, অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা, যথার্থ অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ভক্তরা প্রভুর ঐশ্বর্যরূপকে সেবন করবে। তবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র তুলনা করলে দেখা যায় 'একই বৃন্তে দুটি কুসুমের' মত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের সঙ্গে মাধুর্যরূপও এসেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ যখন নিজের ঐশ্বর্যরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে 'তিন ভুবনে আহ্মে অধিকারী', 'কংস বধিবারে কৈলোঁ অবতার' ইত্যাদি বলছেন তখন দুটি পংক্তিরই প্রথম সারিতে নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে উপস্থাপিত করলেও, পরের সারিতেই 'বাঁছিয়া সে পালি রাধা আহ্মাক ভারী', 'এঁবে কি বহিব আহ্মে তোর দধিভারে' ইত্যাদির উচ্চারণে তার মাধুর্যরূপেই উঠে এসেছে। এখানে প্রেমের কাছে নিজের ঐশ্বর্যকে বিকিয়ে দিলেন কৃষ্ণ, রাধার দধিভার তিনি স্বয়ং বহন করলেন। তিনি তো সর্বশক্তিমান, চাইলেই রাধার প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ নাকজ করতেই পারতেন, কিন্তু করলেন না। এখানে ভক্তের সেবায় ভগবান নিজেকে নিয়োজিত করলেন, যা 'প্রতিদাস্যভাবনাকে' সূচিত করে। এই'প্রতি দাস্যের' উদাহরণ জয়দেবেও পাওয়া যায়, তাঁর 'গীতগোবিন্দম্' গ্রন্থে। সেখানে দেখা গেছে রাধার (ভক্তের) মান ভাঙানোর জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ 'পা' ধরেছেন রাধার–

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহ পদপল্লবমুদারম্।"[২৪]

'হে কামবিষ বিনাশক আমার এই শিরোভূষণ তোমার ঐ পরম সুন্দর পদপল্লব আমার এই মস্তকে স্থাপন কর।'

অর্থাৎ বৈষ্ণবসাহিত্যের পূর্বসূরী বিলাসকলাধীন জয়দেবের কাব্যেও 'প্রতিদাস্যের' বীজ সুপ্তভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল; যেখানে ভগবান তাঁর মস্তক ভক্তচরণে স্থাপন করেছেন। কাজেই, প্রাকচৈতন্য যুগে যেখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেখানে মালাধর বসুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েও, একথা যেভাবে বলা যায় যে বড়ুচণ্ডীদাস (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), জয়দেব (গীতগোবিন্দম) ইত্যাদির কাব্যে অনেকাংশে ঐশ্বর্যভাব থাকলেও দাস্যরসের ক্ষীণধারা সেখানে এসেছে– তাই কাব্যের অনেক স্থানেই শ্রীকৃষ্ণকে 'জীবনসর্বস্ব' বলে গ্রহণ করা হয়েছে, সেভাবে ঐশ্বর্যরূপ বর্ণনায় পটিয়সী স্বয়ং মালাধর বসু পর্যন্ত এই ভাবনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেননি, তাঁর বিরচিত একটি লাইনই তাঁর দাস্যভাবনার প্রামাণিক স্থিতি বহন করছে, আর সেটি হচ্ছে–

"বাসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"[২৫]

'প্রাণনাথ' শব্দটি সাধারণত একজন স্ত্রী তার স্বামীর জন্যই উচ্চারণ করে থাকে। কাজেই এই উক্তি 'কান্তাভাবকে' সূচিত করে অর্থাৎ 'মধুররস'। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র ভূমিকাকার উক্ত পদটিকে মালাধরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উক্তি বলে গ্রহণ করেছেন আর কবি মালাধরের এই সংলাপের প্রশংসা করে স্বয়ং চৈতন্যদেব কুলীনগ্রামবাসীদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই বলে–

"কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর"[২৬]

তাছাড়া চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে রায় রামানন্দের সঙ্গে বার্তালাপের সময় 'কান্তাভাবে' ভজনাকে 'সর্বসাধ্যসার' বলেছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম), যেখানে এসে দাস্যভাবনা প্রেমরসে মজে গিয়ে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে।

এই পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই প্রাকচৈতন্য যুগের বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যভাবের উপস্থিতির সঙ্গে জড়িত সকল দ্বৈতভাবের অবসান ঘটে, যেখানে ঈশ্বর ভক্তের প্রাণের সম্বল, ভগবানের কর্তৃত্বই ভক্তের পরিচয়, সেখানে 'দাস্যভক্তির' উপস্থিতিকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। যা চৈতন্যের পরবর্তীকালে আরও গাঢ়তর হয়।

● চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে দাস্যভাবনা

সেদিন বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্যের জীবনের আদর্শে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন রূপ নিয়েছিল, সেখানে দাস্যভাবনাকেই চরম স্থান দেওয়া হয়েছিল। শঙ্করাচার্য যেখানে বলেছিলেন 'জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ'– জীব হচ্ছে স্বয়ং ব্রহ্ম সেখানে বৈষ্ণবরা ঘোষণা করলেন যে জীব হচ্ছে তাঁর 'তটস্থা' শক্তির অন্তর্গত এবং জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাসচ আর বাংলার সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্য জীবের এই চিরন্তন স্বরূপকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে এবং কবিরা সেই রচনাবলির মধ্য দিয়ে স্রষ্টার চরণে আত্মনিবেদনের সুর তুলেছেন। ফলে চৈতন্যের পূর্বে যে সাহিত্যধারা

(বৈষ্ণব সাহিত্য) লৌকিক আবর্তনে কিছুটা হালকা হয়ে গিয়েছিল, চৈতন্য-সংস্পর্শে এসে সেই 'সাধারণী রতি' কৃষ্ণরতিতে পরিণত হয়। ভক্তমণ্ডলের কাছে এই প্রাণপুরুষ ছিলেন সংকীর্তনের নির্যাস (বহিরঙ্গ) আবার তত্ত্বগত (গৌরতত্ত্ব) দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ–

"শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।"[২৭]

চৈতন্যাবির্ভাবের হেতু নির্ধারণে বাংলার মনীষীগণ প্রধানত দুটি কারণ দেখিয়েছেন যা রৈখিক চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে–

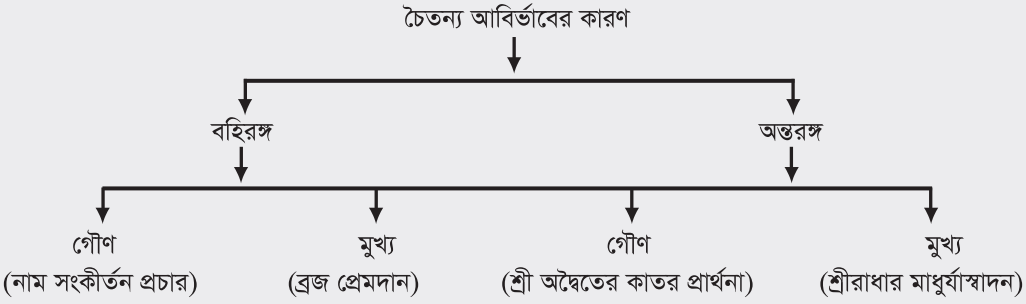

এখানে চৈতন্যাবির্ভাবের যে কয়টি কারণ দেখানো হয়েছে- অন্তরঙ্গ হোক অথবা বহিরঙ্গ সবকটিতেই দাস্যভাবের প্রক্ষেপ রয়েছে, এর বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। তাই'বহিরঙ্গের' অন্তর্গত কারণগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

গৌণ কারণ (নাম সংকীর্তন প্রচার)

'জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস' একথা সামনে রেখেই জীবের কৃষ্ণনাম গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে তাই চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা গেছে নামসংকীর্তন শ্রবণমাত্রই সকলে আত্মাভিমান বিসর্জন দিয়ে প্রেমাবেশে চৈতন্যের সঙ্গে কীর্তনে যোগদান করেছেন।[২৮]

মুখ্যকারণ (ব্রজ প্রেমদান)

ব্রজপ্রেমের মুখ্য ভিত্তিই হচ্ছে 'আত্মসমর্পণ'। রাধার মাধুর্য আস্বাদনে যে প্রেম রয়েছে, যে প্রেমের বর্ণনা রয়েছে 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে, 'চৈতন্যচরিতামৃতে' যে প্রেমের কথা বলা হয়েছে, যেখানে প্রেমিক নিজেকে ভুলে গিয়ে কেবল প্রেমাস্পদের সুখ কামনা করে, এর মধ্যে যে আত্মলুপ্তির ভাব ফুটে উঠে, তাই 'দাস্যপ্রেমের' অন্তর্গত।

'অন্তরঙ্গ' কারণের দুটি বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

গৌণ কারণ (শ্রী অদ্বৈতের কাতর প্রার্থনা)

এই প্রার্থনার মূলেও রয়েছে 'দাস্যভাবনা'। কারণ অদ্বৈত যখন গঙ্গাজল এবং তুলসিকে সাক্ষী করে ঈশ্বরকে হুংকার জানিয়েছেন যে, 'হে প্রভু তোমাকে আসতেই হবে'। এই যে জোর কোনো ঐশ্বর্যে বলীয়ান ভক্তের জোর

না, এ হচ্ছে দাসের ভক্তির জোর। তবে একথাও সত্য যে সেই সর্বশক্তিমান প্রভুর উপর এক ভৃত্যের জোর খাটানো কখনোই সম্ভব না, এখানেই কৃষ্ণের মাধুর্যরূপের স্থাপত্য, এখানেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিশিষ্টতা ধরা পড়ে। একমাত্র প্রকৃত দাসই তার প্রভুকে, এক সখা তার সখাকে, এক প্রেমিকা তার প্রেমিককে জোর দেখাতে পারে। এখানেই দাসের প্রেমের ব্যাপ্তি। তাছাড়া আরেকটি দিক এই যে অদ্বৈত সেই ঈশ্বরকে আসার জন্য যে হুংকার দিয়েছেন তা নিজের জন্য নয়, তিনি ঈশ্বরকে ডেকেছেন, ধরাতলে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিপথগামী জনগণকে উদ্ধারের জন্য।[২৯] অদ্বৈতের স্বার্থত্যাগী এই কাজের ভিত্তিতেও 'দাস্যভাবনার' উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, কারণ আত্মবিলুপ্তিই হচ্ছে দাস্যের মূল লক্ষণ।

মুখ্য কারণ (শ্রীরাধার মাধুর্যাস্বাদন)

এই রাধার মাধুর্যাস্বাদনেও রয়েছে দাস্যভাব। যার জন্য জয়দেবে আমরা দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ রাধার মান ভাঙাতে তার পায়ে নিজের মাথা ঠেকাচ্ছেন। এখানে 'প্রতিদাস্যের' ভাব পরিস্ফুট একথা আগেও বলা হয়েছে। তাছাড়া রাধাও প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেছে, এমনকি নিজের দেহ দিয়েও রাধা কৃষ্ণের সেবা করতে প্রস্তুত ছিল। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বলছে "কেঙ্কর্যমপি সর্বথা"[৩০] অর্থাৎ 'আমি সর্বতোভাবে তাহার সেবক'। সর্বাবস্থায় সর্বস্ব দিয়ে তাঁর সেবা, রাধার এই অবস্থান সরাসরি 'দাস্যভাবের' অন্তর্গত।

অতএব, বোঝাই যাচ্ছে যে চৈতন্যজীবনকে কেন্দ্র করে, তাঁর প্রবর্তিত ভক্তিভাবের সরল ব্যাখ্যায় বাংলাসাহিত্যে সেদিন দেখা গিয়েছিল কৃষ্ণসেবার প্লাবিত রূপ। চৈতন্যদেবের জীবন ও তাঁকে নিয়ে রচিত জীবনীসাহিত্যের মধ্যে সেদিন 'দাস্যভক্তির' প্রত্যক্ষ রূপটি প্রদর্শিত হয়েছিল।

চৈতন্যজীবনের ধারাবাহিকতার ক্রমপর্যায় অনুসৃত করলে দেখা যায় যে চৈতন্যদেব 'দাস্যভাব'কে স্বীকার করেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতের' সাধ্যসাধনতত্ত্ব নামক অধ্যায়ে রায়রামানন্দের সঙ্গে কথোপকথনকালে চৈতন্য 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'কে 'এহোবাহ্য'[৩১] বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, এর পেছনেও রয়েছে দাস্যভাবনারই প্রক্ষেপ। কারণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শঙ্করাচার্য তাঁর 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে 'জীব স্বয়ং ব্রহ্ম'[৩২] এই আত্মস্বরূপের অনুসন্ধানকে 'ভক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন যা সম্পূর্ণই 'বৈষ্ণববিরোধী'। 'জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাস' এই মতকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে শঙ্করাচার্যের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। তাই চৈতন্যদেব এর স্বীকৃতি দেননি।

পরবর্তীতে রায়রামানন্দ দাস্যপ্রেমকে 'সর্বসাধ্যসার' বলে উল্লেখ করলে চৈতন্যদেব এর প্রত্যুত্তরে 'এহোহয়'[৩৩] বলেছেন। জীবের যে নিত্যস্বরূপ, নিত্যদাসত্ব এখানে স্বীকৃতি পেয়েছে যদিও একেই চরম বলে তিনি গ্রহণ করেননি এবং এই দাস্যভাবকে অতিক্রম করে 'কান্তাপ্রেমকেই'[৩৪] চৈতন্য শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন যা মধুররসের ঘনীভূত রূপ। 'দাস্যভাবে' জীবের পুরোপুরি আত্মসমর্পণ হয়না, 'আমি দাস' এই আমিত্ববোধে অহং ভাবটুকু থেকে যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের রতি পাঁচটি– শ্রম, সেবা, বিশ্বাস লাল্যপাল্যভাব আর মধুরা। যা ক্রমে পাঁচটি রসের নিষ্পত্তি ঘটায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। আলংকারিকদের মতে "মনের সুখকর প্রিয় বস্তুতে চিত্তের যে অনুরাগ তাহাই রতি।"[৩৫] এর ঘনীভূত অবস্থা হচ্ছে প্রেম। তাই যেখানে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন ঘটে না, কারণ 'সম্পর্কানুগা' প্রেমের হাত ধরে অহং এর স্পর্শ

এখানে থেকে যায়; সেখানে মধুররসের অন্তর্গত অহং বিবর্জিত 'কান্তাপ্রেম' হচ্ছে 'প্রেমানুগা'– যা সেবাবাসনার সর্বোৎকৃষ্ট পথ। এখানে প্রেমিকা যেমন করেই হোক এমনকি নিজ অঙ্গ দিয়ে সেবা করে হলেও শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করে, যে সাধনার ঋণ পরিশোধনে স্বয়ং কৃষ্ণও অসমর্থ।[৩৬] শ্রীরূপ গোস্বামীও সকল বাসনা বর্জনপূর্বক কৃষ্ণসেবাকেই উত্তমাভক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন–

"ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ু র্হরেরেব সমর্পয়ান্তি।।"[৩৭]
'কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে কালহরণ না করা অব্যর্থকালত্ব।'

এই একই ভাবনার অনুরণন শোনা গেছে 'চৈতন্যভাগবতে'। সেখানে বলা হয়েছে–

"তোমা না জানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে
বৃক্ষমূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে।"[৩৮]

একমাত্র কৃষ্ণকে আরাধ্য বলে গ্রহণ করে, একমাত্র তাঁর চরণসেবায় ব্রতী হওয়া, বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসের এই বীজ বপন করা হয়েছিল সেই 'ভাগবতে'ই সেখানে স্পষ্টত বলা হয়েছিল–

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যান্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।"[৩৯]

'যেমন বৃক্ষমূলে জলসেচন করলে তার কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা প্রভৃতির পুষ্টিসাধন হয় এবং যেমন ভোজনের দ্বারা প্রাণসমূহের তৃপ্তিবিধান করলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই পরিপুষ্টি লাভ করে, ঠিক সেরকমই একমাত্র ঈশ্বরের পূজা দ্বারা সকলেরই পূজা হয়।'

এখানে একমাত্র ঈশ্বর অর্থাৎ একেশ্বরবাদের ধারণাই স্পষ্ট। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ভজনা বা সেবার কথা বলা হয়েছে। বৈষ্ণব কবি শ্রীমন্ত শংকরদেব এই একই বিশ্বাসের ঘোষণা করলেন এভাবে–

"অন্য দেবী দের ন করিবা সেবা
ন খাইবা প্রসাদ তার।
মূত্তিকো ন চাইবা গৃহো ন পশিবা
ভক্তি হৈব ব্যাভিচার।"[৪০]

জীবনের প্রতিটি কার্য কৃষ্ণের সেবার অনুগামী, এই একমাত্র কর্মের দ্বারা ভক্তের জীবনের প্রতিটি ক্ষণের সদোপ্রয়োগ হয়েছে বলে মনে করার এই প্রবণতাই হচ্ছে দাস্যপ্রেম, দাস্যভক্তি। রূপ গোস্বামী তাই এই একমাত্র কৃষ্ণের সেবাকেই শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে বিবেচনা করেছেন তাঁর'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থে–

"মুহূর্ত্তং বা মুহূর্তার্দ্ধং যস্তিষ্ঠেদ্ধরিমন্দিরে
স যাতি পরমং স্থানং কিমূ শুশূষণে রতা।"[৪১]

'যিনি মুহূর্ত বা অর্ধমুহূর্তকাল হরিমন্দিরে অবস্থিতি করেন, তিনি হরির পরম ধাম প্রাপ্ত হন, আর যাঁহারা তাঁহার সেবায় রত, তাহাদের ত কথাই নাই।'

বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে কৃষ্ণসেবাবাসনাকে 'উত্তমাভক্তি' বলে ধার্য করা হয়েছে। কৃষ্ণ-সেবকদের, প্রকৃত দাস্যভক্তের ইহকাল বা পরকাল কোনোকালেরই চিন্তা করতে হয় না। কারণ কৃষ্ণ নিজেই বলেছেন–

"মম নাম সদাগ্রাহী মম সেবা প্রিয়ঃ সদা
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন তু মুক্তিঃ কদাচন।।"[৪২]

'যে ব্যক্তি সর্বদা আমার সেবাতে প্রীতি সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর আমার নাম গ্রহণ করে, তাহাকে আমি ভক্তিই দিব কখনও (ভক্তিশূন্যা) মুক্তি দেব না।'

আসলে দাস্যভক্তের মুক্তিকাম্যই না, সে চায় চিরদাসত্ব, তাই ভগবানও সেই দাসের ভক্তিবৎসলতায় বাঁধা পড়েন, তাই তাকে স্বয়ং ভগবানও মুক্তির পরিবর্তে চিরন্তন ভক্তিই প্রদান করেন। তার আত্মনিয়োগকে আরও গাঢ়তর করে তোলেন। এদিকটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রহ্লাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে-

"নাথ জন্ম সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম।
তেষু তেষবচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।।"[৪৩]

'হে নাথ আমি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করলেও তোমার প্রতি আমার নিরন্তর ভক্তি যেন অটুট থাকে।'

দেখা গেছে যে ভক্ত এবং স্বয়ং ঈশ্বর 'দাস্যভাবনায়' কেউই কাউকে মুক্তি দিতে চান না। ভক্ত যেমন মুক্তি কামনা করে না জন্মে জন্মে কেবল দাসই থাকতে চায়, তেমনি ঈশ্বরও তাঁর দাসের সংস্পর্শেই থাকতে চান, দাস্যভক্তকে মুক্তি দেন না। তাই দেখা গেছে যে সার্বভৌমের সঙ্গে কথোপকথনকালে চৈতন্যদেব বলেছিলেন–

"মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় উল্লাস।।"[৪৪]

ঈশ্বরসাধনার পথে ভক্তের পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় তার নিত্যদাসত্ব। তাই কৃষ্ণসেবক কৃষ্ণের সঙ্গে একত্বপ্রাপ্তি কিংবা মোক্ষবাঞ্ছা পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণসেবার মাধ্যমেই জীবন অতিবাহিত করতে চায়।

তবে গৌড়ীয় মতে মোক্ষকামী পুরুষদের সাধনাও দাসভাবনা বিবর্জিত না, এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে মুক্তি পাঁচ প্রকার– 'সালোক্য', 'সামীপ্য', 'সারূপ্য', 'সার্ষ্টি', 'সাযুজ্য'। ভক্ত বিশ্বাসের মুক্তি কামনায় স্তর পৃথক। সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সমলোকে অবস্থান করা হলে 'সালোক্য'। সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকা বা ঈশ্বর সমীপে থাকা হলে 'সামীপ্য', সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সমগতি প্রাপ্তি বা সমরিষ্টি প্রাপ্তির নাম 'সার্ষ্টি'। পঞ্চমুক্তির মধ্যে প্রথম চারটিতে সেবার সুযোগ থাকে। সেখানে ভক্ত দাসের পথ অঙ্গীকার করতেও পারে।

"সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।।

তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার।।
সালোক্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।।"[৪৫]

কারণ মোক্ষবাঞ্ছার চতুর্থস্তর পর্যন্ত ভক্তের স্থান প্রভুর নীচেই থাকে। তবে 'সাযুজ্য' মুক্তি অর্থাৎ যেখানে ভক্ত ঈশ্বরের এক দেহপ্রাপ্তি কামনা করে সেখানে দ্যস্যভাবের স্থান থাকে না। আর দাস্যরসে ঈশ্বরের সঙ্গে 'একদেহিত্ব' প্রাপ্তি কখনোই কাঙ্ক্ষিত না। দাস্যসেবায় ভক্ত নরক পর্যন্ত কামনা করতে কুণ্ঠিত হয় না বরং ঈশ্বরের স্থান লাভের আকাঙ্ক্ষায় তার ঘৃণার উদ্রেক হয়। এই ভাবনায় দাসের একমাত্র সাধ–

"হরি হেন দিন হইবে আমার
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকারে।।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।।"[৪৬]

অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি, মোক্ষলাভ, অর্থ, যশ, সাহচর্য, কলা-কৃষ্টি ইত্যাদি পার্থিব জগতের কিছুই তার কাম্য না, জন্ম-জন্মান্তরে অহৈতুকী শ্রদ্ধা-ভক্তিই শুধু তার কাম্য। এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে চৈতন্যের শেষ জীবনে রচিত আটটি শ্লোকের মধ্যে অন্যতম চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে।

(চতুর্থ শ্লোক)

"ন ধনং ন জনং সুন্দরীং
কবিতা বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মানি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তির হৈতুকী ত্বয়ি।।"[৪৭]

'হে জগদীশ, আমি তোমার নিকট থেকে ধন, সুন্দরী, নারী বা কবিতা চাইনা। তোমার প্রতি যেন জন্ম-জন্মান্তরে আমার অহৈতুকী শ্রদ্ধা ভক্তি এই আমার কাম্য।'

যে ভক্তিতে হেতু থাকে তা 'কৈতবভক্তি'। ধন, জন, যশ, মোক্ষলাভ ইত্যাদি এগুলো বৈষ্ণবীয় দর্শন অনুযায়ী 'কৈতবভক্তি'। যে ভক্তিতে আত্মনিবেদনের কোনো হেতু থাকে না, জন্ম-জন্মান্তরে কৃষ্ণচরণ সেবায় বিভোর হয়ে থাকতে চায়। তাই হচ্ছে 'অকৈতবভক্তি'। এখানে প্রেমের গাঢ়তা ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণচরণের সেবা ভিন্ন আর কিছুই কামনা করে না, আর 'সেবক' অথবা 'দাস' হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না বরং এই পরিচয় তার কাছে অত্যন্ত সম্মানের। তাই চৈতন্যদেবও নিজেকে কৃষ্ণের কিঙ্কর হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন–

(পঞ্চম শ্লোক)

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বধৌ।।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।।"[৪৮]

'হে নন্দ নন্দন, বিষয় সংসার সমুদ্রে পতিত তোমার কিঙ্কর এই আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলীতুল্য মনে কর।'

জীব মাত্রই কৃষ্ণের দাস, তা ভুলে চৈতন্য মহাপ্রভু সংসার সমুদ্রে মায়াবশ হয়ে বসে রয়েছেন। তাই অত্যন্ত দৈন্যের সঙ্গে তিনি কৃষ্ণচরণে দাস্যভক্তির প্রার্থনা করে, কৃষ্ণ চরণতলে ধূলি হয়ে সর্বদা কৃষ্ণের সেবা করে কৃতার্থ হতে চেয়েছেন।

অতএব, একথা সহজেই অনুমেয় যে যেখানে পৌরাণিক যুগে মুক্তি তথা স্বর্গলাভের আশায় চারিত্রিক গুণাবলি রক্ষার্থে কৃষ্ণচরণে নিষ্ঠা তথা যাগযোজ্ঞাদির প্রচলন ছিল, ভারতের ভক্তি আন্দোলনে উত্তাল তরঙ্গে এই আচারকেন্দ্রিক যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদি নিষ্প্রভ হয়ে দাঁড়াল তখন ভক্তচোখে মায়াময় জগৎ হয়ে দাঁড়ায় লীলাময় এবং নির্বাণের বিপরীতে তারা চাইল লীলারসের আস্বাদন। সঙ্গে 'নামমাহাত্ম' প্রাধান্য পেল আর ভক্তের স্বরূপ হল নিত্যদাস। তবে একথা স্বীকার করা প্রয়োজন 'নামমাহাত্ম্যের' কথা 'গীতা'তেও রয়েছে, সেখানে যজ্ঞের মহিমাকে অক্ষুণ্ন রেখে হলেও জপমাহাত্ম্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল–

"মহর্ষিণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞেহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।।"[৪৯]

"মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসকলের মধ্যে এক অক্ষর ওঁকার, যজ্ঞসকলের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ, স্থাবর সকলের মধ্যে আমিই হিমালয়।"

বোঝাই যাচ্ছে যে, জপের মাহাত্ম্য প্রাচীন যুগেও অব্যাহত ছিল। তবে তা ছিল আচার কেন্দ্রিক, অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক। কিন্তু ভক্তি আন্দোলনের স্রোতে আগত 'নামমাহাত্ম্য' বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছিল 'প্রচারকেন্দ্রিক' আর আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে ছিল 'দাসের আর্তি'। এখানে এসেই দাস্যভাবনা এক তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণে পরিণত হয় যা বৈষ্ণবীয় দর্শনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। যার ক্রমবিবর্তনকে নিম্নোক্ত উদাহরণ সহযোগে দেখানো যেতে পারে।

ভক্তকবিদের সাহিত্যে দাসভাবনা

গৌড়ীয়বৈষ্ণব মতে পঞ্চরসের মূল স্বরূপই হচ্ছে ভক্তিরস, যা মধুররসে পরিপূর্ণতা পায়। লক্ষণীয় যে গোবিন্দদাস একটি কীর্তনের পদে নববিধ ভক্তির কথা উল্লেখ করেন, তার মধ্যে দাস্যভক্তি অন্যতম–

" শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাসি রে

পূজন সখিজন আত্ম নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষিরে।।"[৫০]

গোবিন্দদাস একটি কীর্তনের পদে 'ভাগবতে'র স্কন্ধের (৭/৫/২৩) নং শ্লোকানুসরণে নববিধা ভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে 'পাদসেবন', 'আত্মনিবেদন' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারের ফলে একথা স্পষ্ট করে যে গোবিন্দদাস 'দাস্যভক্তিকে' এক বিশেষ স্থান দিয়েছেন। এভাবে চৈতন্যপরবর্তী আরও অন্যান্য বৈষ্ণবকবিদেরও লেখনীমুখে দাসভাবনার প্রত্যক্ষ অনুরণন ঘটেছে। নরোত্তম দাসের একটি সুপ্রসিদ্ধ পদ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন–

"প্রিয় সখীগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুহুঁক কমলদিঠি কৌতুকে হেরব
দুহুঁ অঙ্গ পুলকঅঙ্কুরে।।"[৫১]

চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে অঙ্গের অথবা দেহের কথা এসেছে কামনাসিদ্ধির অন্যতম উপায় হিসেবে। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তীযুগে 'দেহকে' কৃষ্ণোন্মুখ করে ভক্তির পরাকাষ্ঠা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, লক্ষণীয় যে চৈতন্যদেব 'রাধাভাবকে' শ্রেষ্ঠ বলেছেন, যদিও রাধা গোপীদের মধ্যে অন্যতমা তবু অসমের শ্রীমন্ত শংকরদেব 'রাধাভাবকে' শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেননি, গোপীভাবকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তবে চৈতন্যদেবের কথা মেনে নিয়ে একথা বলাই যায় যে নিখিল ভক্তের সর্বোৎকৃষ্ট পথিক মধুর ভাবের প্রধান আশ্রয় শ্রীরাধা। তবে "সখিবিনে নহে এই লীলা।"[৫২] সখিহীন রাধাকৃষ্ণ প্রেম বৈচিত্রহীন প্রেমমাত্র লীলা নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকগণ গোপীভাবকেই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেছেন এবং গোপীদের পাদবন্দনাও করেছেন এর প্রমাণ 'ভাগবত' বহন করছে। অর্থাৎ গৌড়ীয়বৈষ্ণব সাধকগণের মধ্যে 'দাসেরও দাস' এই বিশ্বাসের অবস্থিতি লক্ষ করা যায়, যা দাস্যভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে একথাও স্বীকার করে যে কৃষ্ণের সেবকদেরও এক উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, তাই বৈষ্ণবকবিরা কৃষ্ণের নাহলেও কৃষ্ণদাসেরও যদি দাস হতে পারেন তাতেই তাঁরা সুখী। আর 'দাসেরও দাস' হওয়ার প্রার্থনাকে তারা স্বীকৃতিও দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অসম প্রদেশের শ্রীমন্ত শংকরদেব এই একইভাবে 'দাসেরও দাস' হওয়ার ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন এভাবে–

"কর প্রভু দয়া জন্মে জন্মে হৈবো
তোমার দাসের দাস।"[৫৩]

অতএব, একথা প্রমাণিত যে দাস ভাবনার প্রক্ষেপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তার লাভ করেছিল আর তার স্বাক্ষর বৈষ্ণবসাহিত্য আজও বহন করে চলেছে।

চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টি হচ্ছে 'বাৎসল্য' রসের পদ। এই বাৎসল্য রসের পদের ভিত্তিতেই কবিরা আত্মনিয়োগ করে নিজের সেবাবাসনার পূর্তি ঘটিয়েছেন। এরমধ্যে যাদবেন্দ্র ও বলরামের পদসমূহ অন্যতম–

(i) মা যশোদার নানান বিপদের আশঙ্কা বাল্যকৃষ্ণের গোচারণ যাত্রা নিয়ে, তাই কবি নিজে যুক্ত হয়েছেন সেই যাত্রায় কৃষ্ণের পাদুকাযুগল নিয়ে–

"বলরাম দাসের বাণী শুনো ওগো নন্দরানী
মনে কিছু নাভাবিও ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমি যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়।।"[৫৪]
(বলরাম দাস)

(ii) যাদবেন্দ্রের একটি পদে মায়ের উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে এভাবে–

"থাকিহ তরুরছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগায় গায়
যাদবেন্দ্র সঙ্গে লইও বাধা পানই কাছে থুইও
বুঝিয়া যোগাইবে রাঙ্গা পায়।।"[৫৫]

এখানে বাৎসল্য রস দাস্যরসে লীন হয়ে গেছে। উল্লেখিত পদসমূহে মায়ের আকুলতা ও উদ্বেগের চিত্র অতি স্পষ্ট, সঙ্গে দেখা যাচ্ছে পদকর্তারা নিজেরাই গোপালের পাদুকা যুগিয়ে দিচ্ছেন। কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে কৃষ্ণসেবায় তাঁদের নিজেদের নিয়োগের আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করতে পারেননি, তাই গোপালের পাদুকাদি সঙ্গে রেখেছেন। প্রয়োজন হলেই গোপালের রাঙা পায়ে যেন তার জোগান দিতে পারেন। তাঁরা গোপালের চরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই গোপালের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, যা চরণসেবারই দ্যোতক। এই বাৎসল্যরসের পদ ছাড়াও বৈষ্ণব কবিদের এমন কিছু পদও পাওয়া যায় যা সরাসরি দাস্যরসের ব্যপ্তিকে স্বীকার করে। তাই বলা যায় দাস্যপ্রেমের বশেই এই পদগুলো রচিত হয়েছে। যেমন–

(i) "চন্দন কুঙ্কুমে তিলক বনাইব
হেরব মুখ-সুধাকর।।
নীলপীতাম্বর যতনে পরাইব
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।।"[৫৬]

(ii) "সুগন্ধিত চন্দন মণিময় আভরণ
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যার দাসী যেন হও তার
অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে।।"[৫৭]

উল্লেখিত প্রথম পদটিতে কবি সরাসরি কৃষ্ণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাইছেন, ঈশ্বরকে নানা ভূষণাদির দ্বারা সুসজ্জিত করতে চাইছেন, এমনকি 'রতন মঞ্জীরে' পরিয়ে কৃষ্ণের 'পায়ের' শোভা বর্ধিত করার

ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন– তা যে সম্পূর্ণভাবেই দাসভাবনাধীন একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর দ্বিতীয় পদটিতে যে 'তাঁর' সেবায় নিমজ্জিত সেই সেবকের দাস হতে চাইছেন এবং তার (ভক্তের) সেবার মাধুর্যকে, তার সাঙ্গ দ্বারা সেবন করতে চাইছেন অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবকের সেবায় ব্রতী হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সে অর্থে দুটোই সরাসরি দাসভাবনার রূপচিত্রণের দৃষ্টান্ত একথা সহজেই বলা যায়। এভাবেই বৈষ্ণবকবিরা সেদিন নিজেকে সেবক রূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন আর নিজ পদাবলির স্ফুরণে সেই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

রাধার দাস্যভাবনা

গোপীদের মধ্যে অন্যতম রাধা। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি রাধাভাবের আনুগত্যময়ী। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' রায়রামানন্দ বলেছেন–

"ইহার মধ্যে রাধাপ্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি।"[৫৮]

রাধাভাবের এই শ্রেষ্ঠত্ব 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থেও বারেবারেই স্বীকৃতি পেয়েছে–

"সর্ব্বথৈবাসসোর্দ্ধা যা সা স্যাদাত্যন্তিকাধিকা
সা রাধা সাতু মধ্যৈব যন্নান্যা সদৃশী ব্রজে"[৫৯]
ইত্যাদি শ্লোকে..

'যাহার সর্ব্বতোভাবে সম অথবা অধিক কেহ নাই তাহাকে আত্যন্তিকাধিকা কহে। শ্রীরাধাই আত্যন্তিকাধিকা, শ্রীরাধাই মধ্যা যেহেতু ব্রজ মধ্যে তাঁহার সদৃশী অন্য কোন গোপাঙ্গনা প্রধানা নাই অতএব শ্রীরাধাই সর্বপ্রধানা'।

আগেই বলা হয়েছে যে মধুর রসে সেবাভাবনা থাকবেই। তাই রাধার প্রেম যে দাস্যভাবনাধীন একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া তার (রাধার) প্রেমে সর্বস্ব ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রেমাস্পদ কৃষ্ণের চরণে নিজের পরিচয় পর্যন্ত বিলীন করে দিয়েছে। প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে শ্রীরাধা কেবল কৃষ্ণচরণ কামনা করেছে। রাধা বলছে–

"বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ওদুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে।।"[৬০]

কৃষ্ণকে ভালোবেসে রাধা নিজেই মহিমান্বিত, তাতেই রাধার তৃপ্তি, রাধার রূপলাবণ্যও সেই ভালোবাসারই অর্ঘ্যস্বরূপ। প্রেমের গোঁড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে যখন ভক্তরূপ প্রেমিকের আত্মবিলুপ্তি ঘটে তখনই সকল দ্বৈতভাবনার অবসান ঘটে এবং দাস্যভাবনা পরিপক্কতা লাভ করে। 'উজ্জ্বলনীলমণিতে' রাধাপ্রেমের এদিকটি স্বয়ং কৃষ্ণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে এভাবে–

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলেছেন,

"কর্ত্তুং শর্ম্ম ক্ষণিকমপি মে সাধ্যমুজ্ঝতাশেষং
চিত্তোৎসঙ্গে ন ভজতি ময়া দত্তখেদাপ্যসূয়াং।
শ্রুত্বা চান্তর্ব্বিদলতি মৃষাপ্যার্ত্তিবার্ত্তালবং মে
রাধা মূর্দ্ধিন্যখিল সুদৃশাং রাজতে সদ্গুণেন।।"[৬১]

'আমার প্রতি শ্রীরাধার কি আশ্চর্য প্রীতি নিমিত্ত যদি আপনার অখিল ব্যবহার্য কার্য বিসর্জন দিতে হয়, তাহাও করিয়া থাকেন আমি তাহাকে খেদান নিতা করিলে তাহার মধ্যে পশু আর উদ্গম হয়না আর যদি কেহ তাহার অগ্রে মিথ্যা করিয়া আমার কিঞ্চিত মাত্র বিড়াল কথা বলে তাহাতেও তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, অতএব হে বন্ধো এই সকল গুণী শ্রীরাধা মৃগাক্ষী সকলের প্রতি অত্যর্থ বিরাজ করিতেছেন।'

সব ক্ষোভ, অভিমানের বিসর্জনপূর্বক সেই প্রেমাস্পদের সুখ কামনাই যার একমাত্র অভিপ্রায় সে দাস্যপ্রেমিকেরই মূর্ত বিগ্রহ, দাস যেমন সমস্ত পরিহার পূর্বক একমাত্র কৃষ্ণ সেবায় ব্রতী হতে চায়, তেমনি শ্রীরাধাও একমাত্র তাঁর সুখকামনায় নিজের অথবা অন্যের সমস্ত কর্মকে নাকজ করতে প্রস্তুত, কারণ কৃষ্ণকে সুখী করা ভিন্ন আর কিছুই কাম্যই নয় তার, এই বিশেষত্ব দাস্যভক্তির তথা দাস্যপ্রেমের অধীন। দাস্যপ্রেমের এই পথে আত্মমর্যাদার অবলুপ্তি ঘটে আর দাস্য পথগামী রাধা কেবলই বলে–

"তুমি সব জান কানুর পিরীতি
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি জীবন
তাহারে সঁপিয়াছি।।"[৬২]

দাস্যভাবনায় সব কিছুর বিনিময়ে হলেও দাস তাঁর দাসত্ব রক্ষা করতে চায় এখানে রাধা সবকিছু পরিহারপূর্বক নিজের প্রেমকে রক্ষা করতে চাইছে, এখানে 'সমর্পণ' প্রধান হয়ে উঠেছে, এজন্য রাধা (ভক্ত) পদটিতে সরাসরি 'দাস্যরসের' অধীন একথা তো বলা যায়ই উপরন্তু রাধা এখানে কান্তাভাবের অধীন এদিকটিও যদি প্রর্দশিত করা হয় তাহলেও যে সে 'দাস্যরস' বহির্ভূত না একথা প্রমাণিত হয় এভাবে–

"মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচে লালন মমতাধিক হয়।।
কান্তাভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসে হয় পঞ্চগুণ।।"[৬৩]

রাধাভাবের মধ্যে যে ব্যাকুলতা রয়েছে তার সূচনা 'দাস্য', 'সখ্য' এবং 'বাৎসল্যের' ভিতর দিয়ে চরম পরিণতি 'মধুরে'।'মধুররস' তিন 'রতি' দ্বারা জাত 'সাধারণী', 'সমঞ্জসা', 'সমর্থা'। 'সাধারণী' রতি হচ্ছে 'দর্শন জাত' এবং 'সম্ভোগা'ন্তে এর ইতি ঘটে। এর স্থায়িত্বও কম। 'সমঞ্জসা' রতি হচ্ছে গুণাদি শ্রবণজাত আর

'সম্পর্কানুগা'। এই রতি জাত প্রেম ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা তথা পরিণয় বন্ধনের পারস্পরিক সুখ চায়। তবে 'সমর্থা' রতিতে ভগবানের তৃপ্তি সাধনই একমাত্র লক্ষ্য। গুণ, রূপ কিছুই না কেবল 'কৃষ্ণ' বিষয়ক কোনো এক ধ্বনিই যেখানে আত্মহারা করে দেয়, সেখানে দাঁড়িয়েই চণ্ডীদাসের 'রাধা' গেয়েছিল "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম/কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর পরাণ।" 'সমর্থা' রতিতে সংসার সমাজ সব মিথ্যা শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ায়, তাঁর অবিহনে ভক্ত কেবল মৃত্যু কামনা করে। নিবেদন পর্যায়ের রাধার যে দিব্যোন্মাদনার প্রকাশ পেয়েছে তা 'সমর্থা' রতি জাত প্রেম। এই পর্যায়ে এসে প্রেমাস্পদ ব্যতীত মৃত্যুই শ্রেয় বলে মনে হয় জ্ঞানদাসের পথগুলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়–

১) "মনের যে দুখ মোর মনেতে রইল।
ফুটিল শ্যামের সেল বাহির নহিল।।
নিশ্চয় মরিম সখি তারে না দেখিয়া
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম মিলাব আনিয়া।।"[৬৪]

২) "মনের মর্মকথা শুনিলো সজনি
শ্যামবন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী।।
চিতের আগুন কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব।।"[৬৫]

কৃষ্ণই রাধার একমাত্র জীবন সম্বল। কৃষ্ণবিনে এই জীবন অসাড়। যেখানে কৃষ্ণের অদর্শনে মৃত্যু কাম্য, যেখানে জীবনের প্রতিটি ক্ষণ কৃষ্ণের জন্য অতিবাহিত সেখানে কৃষ্ণের অবর্তমানে আত্মহননের পথ অবলম্বন তাও কৃষ্ণকেন্দ্রিক হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই মৃত্যুর পরও রাধা কৃষ্ণের সাহচর্য কামনা করে। মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হলে কৃষ্ণের সঙ্গসুখ লাভ হবে না। তাই রাধা সখীদের বলছে–

"মরিলে তোরা করবি এক কাজে।
আমায় নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি দাহবি,
রাখবি তনু এই ব্রজমাঝে।
হামারি দুন বাহু ধরি, সুদৃঢ় করি বাঁধবি,
শ্যাম-রুচি-তরু-তমাল-ডালে।
প্রতি দিবস শর্ব্বরী, অবশি সেথা আসবি,
সময় বুঝি তোরা সকলে মিলে।
(হামারি) ললাট-হৃদি-বাহুমূলে শ্যাম-নাম লিখবি,
তুলসী-দাম দেওবি গলে।

(হামারি) শ্রবণ মূলে শ্যাম নাম কহবি।"[৬৬]

এই যে নিজ দেহ পঞ্চভূতে বিলীন না হওয়ার অনুণয়, মৃত্যুর পরও কৃষ্ণের সঙ্গ লাভের কামনা তা কোনো স্বার্থান্বেষী বাঞ্ছা না এই নশ্বর দেহ যেন মৃত্যুর পরও কৃষ্ণের আরাধনায়, তাঁর প্রতীক্ষায় বিলীন হয়ে যায় এই তার কাম্য। এখানে অহংকার না, এ হচ্ছে ভক্তির চরমসীমা। যা দাস্যপ্রেমেরই অযাচিত রূপ। যেখানে ভক্ত সেই বিলীনের পথেও চিত্তকে কৃষ্ণাভিমুখীন করে রাখে। এই চিরন্তন অবস্থান রাধার মুখনিঃসৃত প্রতিটি পদের মধ্যে প্রকাশিত। যার মর্মে মর্মে মুখরিত হচ্ছে বিরহগাথা, অথচ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এর অতলে খুঁজে পায় দাস্যভক্তের অটল সাধনা আর তার মনের আর্তি।

উপসংহার

বৈষ্ণব সাহিত্যে এভাবেই সেদিন 'সেবাভাবনা' এক বিশেষ স্থান পেয়েছিল। যা চৈতন্যপূর্ববর্তী কালেও লৌকিক প্রেমের আবেশে বিরহের দহনজ্বালায় 'দাসভাবনার' সুপ্ত প্রকাশ ঘটেছিল কিন্তু তা চেতনার শীর্ষস্তরের গড়ে ওঠা অনুভূতির প্রকাশ ছিল না তাই তখনকার সেবাভাবনা কেবল আত্মতৃপ্তির অনুদান হয়ে থেকে গিয়েছিল মাত্র আর এই অনুদানই চৈতন্যের জন্মের পর ভক্তিরসের রসায়নের দাস্যতত্ত্বের এক মহিমময় রূপ লাভ করে আর এই স্তরের সেবাবাসনায় মমত্ববোধ, নিষ্কৈতব প্রেম, আত্মবিসর্জনের সস্পৃহা, তাঁকে সুখী করার প্রয়াস আদি যোগ হয়।

সূত্রনির্দেশ

১. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার, 'বৈষ্ণব পদ সমীক্ষা', কলকাতা, গ্রন্থ বিকাশ, ২০০৫, পৃ. ৪৬

২. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ৫ম সংস্করণ, ১৪২৬ সন, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪৬

৩. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৫০

৪. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, ১/১৭, পৃ. ২১

৫. সেন, সুকুমার, 'চৈতন্যভাগবত', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ৭ম মুদ্রণ, ২০২১, শ্লোক ২/২৩, পৃ. ১৮৪

৬. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ১/৭, পৃ. ৮৩

৭. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৫০

৮. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ৫ম সংস্করণ, ১৪২৬ সন, পৃ. ২৩

৯. দাশগুপ্ত, ডক্টর শশীভূষণ, 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে', এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৫৯, পৃ. ১৩৬-১৩৭

১০. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ১/৪, পৃ. ২০

১১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', জিজ্ঞাসা, ১ম সংস্করণ, রাধাবিরহ, পৃ. ১৪১-১৪২

১২. 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', ৬০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৩৯

১৩. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০ পৃ. ৪৩

১৪. তদেব, পৃ. ১৩৬

১৫. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', জিজ্ঞাসা, ১ম সংস্করণ, বংশীখণ্ড, পৃ. ২৬১

১৬. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৬৮

১৭. তদেব, পৃ. ১১১

১৮. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০ পৃ. ১১০

১৯. তদেব, পৃ. ১১১।

২০. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', জিজ্ঞাসা, ১ম সংস্করণ, অথ ভারখণ্ড, পৃ. ২১১

২১. তদেব, পৃ. ২১২

২২. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ (সম্পা), মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৪, ভূমিকা

২৩. তদেব

২৪. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'গীতগোবিন্দম', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা, শ্লোক– ১০/৯, পৃ. ১১৯

২৫. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ (সম্পা), মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৪, ভূমিকা, শ্লোক– ৩, পৃ. ১

২৬. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা , ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ১/১০, পৃ. ৬০

২৭. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা , ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/৮, পৃ. ১৫২

২৮. চৈতন্য যখন–

"প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্যগীত কৈল।
দেখি সর্বলোকের চিত্তে চমৎকার কৈল।।
আশ্চর্য শুনিয়া লোক আইলা দেখিবারে।
প্রভু-রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে।
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বলে কৃষ্ণ হরি
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্ধ্ববাহু করি।।"

মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা , ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/৮, পৃ. ১৩৮

২৯. " অদ্বৈত আচার্য আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন।"
'চৈতন্যভাগবত', ১/৬, পৃ. ২৩

"স্বভাবে অদ্বৈত বড় করুন হৃদয়। জীবের উদ্ধার চিত্তে হইয়া সদয়।
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার। তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার ।
তবে শ্রীদ্বৈত সিংহ আমার বড়ঞি। বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাও হেথাঞি।"
'চৈতন্যভাগবত', ১/২, পৃ. ৬

৩০. শ্রীধর-দেবগোস্বামী (সম্পা), 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ, কলকাতা, ১ম সং, ১৩২৬

৩১. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ,'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা , ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/৮/১৪২

৩২. উল্লেখ্য, চক্রবর্তী, অমলেন্দু, 'সৌর বনাম চান্দ্র সংস্কৃতি (ভক্তি আন্দোলন), দ্রষ্টব্য, 'ঐতিহ্য', vol- VIII, Issue-১, ২০১৭, পৃ. ৬৪

৩৩. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোকথ ২/৮, পৃ. ১৪২

৩৪. তদেব, শ্লোকথ ২/৮/১৪৪

৩৫. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার, 'বৈষ্ণব পদ সমীক্ষা', কলকাতা, গ্রন্থ বিকাশ, ২০০৫, পৃ. ৪

৩৬. কৃষ্ণ রাধাকে বলছেন–

'ব্রজলোকের প্রেম শুনি আপনাকে ঋণী মানি
করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন।
ব্রজবাসী যতজন মাতা-পিতা সখীগণ
সবে হয় মোর প্রাণসম
তারমধ্যে গোপীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন
তুমি মোর জীবনের জীবন।।'

মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/১৩, পৃ. ১৯০

৩৭. শ্রীধর-দেবগোস্বামী (সম্পা), 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ, কলকাতা, ১ম সং, ১৩২৬, ৩য় লহরী, শ্লোক– ২৯, পৃ. ২০৫

৩৮. 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', শ্লোক– ২/১৯

৩৯. 'শ্রীমদ্ভাগবত'– ৪/৩১/১৪

৪০. শ্রীমন্ত শংকরদেব : 'শ্রীমদ্ভাগবত', ২য় স্কন্ধ, দ্রষ্টব্য : শ্রীমন্ত শংকরদেব সঙ্ঘ (প্রকা) : মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব বাক্যামৃত, পৃ. ২৫৫।

৪১. শ্রীধর-দেবগোস্বামী (সম্পা), 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ, কলকাতা, ১ম সং, ১৩২৬ পৃ. ১৭৯

৪২. তদেব, পৃ. ২২০

৪৩. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫,

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/৬, পৃ. ১৩৪

৪৪. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ,'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ৩/২০, পৃ. ৪২৫

৪৫. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৪২৬

৪৬. তদেব, পৃ. ৫৬৪

৪৭. ভট্টাচার্য, দীনেশ চন্দ্র (সম্পা), 'শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম', ভক্তি কার্যালয়, হাওড়া, ১ম সং, ১৩২২ সন, পৃ. ১৯

৪৮. তদেব, পৃ. ২১

৪৯. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০ পৃ. ৫৮১

৫০. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০ পৃ. ৫৮১

৫১. তদেব, পৃ. ৫৬৩।

৫২. চৈ. চ. ২/১৪/১৯৬

৫৩. কীর্ত্তন-ঘোষা, শ্লোক ১৬৩১

৫৪. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০ পৃ. ৭৪৩

৫৫. তদেব, পৃ. ৯৭৩

৫৬. তদেব, পৃ. ৯৭৩

৫৭. তদেব, পৃ. ৫৬২

৫৮. তদেব।

৫৯. বিদ্যারত্নেন, শ্রীরামনারায়ণ(অনু), 'উজ্জ্বলনীলমণি', তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১ম সং, ১৪১৪, অথ যুথেশ্বরী, শ্লোক– ৪, পৃ. ২১৬

৬০. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা),'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৩৯৪

৬১. বিদ্যারত্নেন, শ্রীরামনারায়ণ(অনু), 'উজ্জ্বলনীলমণি', তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১ম সং, ১৪১৪, নায়িকাভেদঃ, শ্লোক– ৫১, পৃ. ২০৭

৬২. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৪৩৪

৬৩. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা , ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/১৮, পৃ. ২৪৪

৬৪. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৪৩৪

৬৫. তদেব, পৃ. ৪৩৪

৬৬. উল্লেখ্য, সেন, দীনেশ চন্দ্র, 'পদাবলী-মাধুর্য্য', প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃ. ৬০

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022

Government
Brajalal College
Khulna
Bangladesh

BL College Journal

ISSN : 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV Issue-I
July 2022

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Contents

English Section

- Impacts of Active Learning on Students' Academic Performance at Undergraduate Level Zoology Classes
  Dr. S. M. Ali Ashraf 109-125
- On Some Characteristics of the Joint Distribution of Sample Variances
  M. Hafidz Omar and Anwar H. Joarder 126-139
- Study of Nanocrystallization Kinetics in $Fe_{73.5}Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ Finemet Type Alloy by Differential Thermal Analysis and Using Different Models
  Pritish Kumar Roy and Dr. Shibendra Shekher Sikder 140-155
- The Possibility of Participating Honour's Level Students in Insurance Sector as a Part of Financial Inclusion : A Practical Study
  Sonjit Shingha 156-171
- Marginalisation of Women on Caste
  A Subaltern Study of *Chandalika* and *Draupadi*
  Sharif Atiquzzaman 172-179

Volume -IV, Issue-I, July 2022

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 109-125

Impacts of Active Learning on Students' Academic Performance at Undergraduate Level Zoology Classes

Dr. S. M. Ali Ashraf

Dr. S. M. Ali Ashraf
Associate professor
Department of Zoology
Government Women's College
Khulna, Bangladesh
e-mail : ashrafzoology@gmail.com

Abstract

The purpose of the study was to investigate the impacts of active learning on students' academic performance compared to traditional learning. A sample of 30 undergraduate students from the Department of Zoology, Khulna Government Women's College, Bangladesh was used for the study. The total 30 students were randomly assigned as experimental group consisting of fifteen students and the control group from the remaining fifteen students. Each group was taught separately. The experimental group was taught by using some of the active learning strategies while control group was taught by the traditional lecture method only. The exam score of both groups of students were analyzed statistically and the results revealed that there was a significant difference ($p<0.05$) between the means of the exam score of the two groups of students. Statistical analyses also revealed that the experimental group performed better than the control group . A survey on students' experiences regarding active learning was done through a questionnaire questions. In addition, observational data were recorded from both groups of students to view their responses in terms of active learning and traditional lecture method.

Keywords

Active learning, traditional learning, academic performance

Introduction

Teaching means bringing of desirable changes in learners.[5] This change is not possible without the application of any suitable method used by the teachers. No method

becomes effective if it does not suit learners' needs. As a mode of instruction, the age-old lecture method is now neglected by educationists due to its inability to promote students' cognitive as well as attitudinal goals.[13, 41] Lecturing is an ancient method of teaching which students commonly perceive as boring. Not only that, it is devoid of pleasure and diversity for students. Besides, this method is unable to spark student incitement, belief, confidence, liveliness and other qualities such as self-regulation.[54] As a result students complete their education without developing skills which is very important for the success in their professional life.[26, 44]

In the lecture method classroom, students feel very shy in asking question to their teachers and the class room seems to be very lifeless. Students have no opportunity to share their own ideas with others. Hence in order to minimize the limitations of the lecturing method, attention has been given globally over the past few decades towards the approach that promotes active learning. This ensures student attitudes, critical power of thinking, grades and finally their increased academic performance without which the social and economic development of a country is difficult to attain.[3, 21, 31]

From primary school to university level, active learning is poorly practiced in Bangladesh except a very few institutions mainly in urban areas.[10] There are many factors behind this. Defective syllabuses, curricula, students number, classroom environment, duration of class time, teacher's knowledge of active learning method are important ones.[49] In Bangladesh, at undergraduate level Zoology classes teachers teach their students only by lecture method using "chalk and talk", textbooks and the like. As a result, students do not have chances to take part in their learning process. Students keep themselves mentally absent from class which has negative impacts on their academic attainments. In contrast, if active learning method is practiced, students have the opportunity to engage themselves and view their own ideas with their classmates as well as teachers**.** It is a two-way process.[23, 36]

In active learning, students have the chances to solve their academic problem in the class independently. This type of learning practice helps learner to build clear understandings and attainment lasts long in their minds.[12] Moreover they enjoy themselves very much in the classroom and show more interest in the class.

Active learning may take place in different ways such as formative quizzes, role play, group discussion, study tour, lab work, individual assignment, debate, uses of ICT,

poster making, presentation and others.[47] Students deal with learning content through the active learning process which can enhance their thinking ability, finally impacting on their academic performance.[18, 25]

Active learning means active participation of students with learning materials in the classroom through think-pair-share, peer discussion, collaborative work, analysis and application rather than simply to listen and memorize. Active learning includes not only group work, asking questions, explanations but includes planning and revision of the learning process also. Because of this practice, gained knowledge by active learning becomes permanent whereas in traditional lecture method students forget their achieved information very shortly.

Active learning is quite opposite to the traditional style of teaching where students just listen and absorb information offered by the teacher. In active learning student's role is considered prime. Kuh *et al*., noted that active learning contributes golden chances for significant academic activities which have positive impacts on retention and performance.[30] According to Mills, active learning foster students thinking more critically and creatively.[37] It also explores student's personal mindset, integrity and sense of honor. Stern put forwarded the definition of active learning as it imparted students to decide which particular field of education is liked by them for study.[48] According to Prince, active learning involves students' recall of information significantly.[44] The famous education philosopher John Dewey mentioned that learning by doing is active learning.[14]

In active learning students take the chief responsibility and seek help from teachers only when needed. Active learning methods initiate students to gain something new with pleasure, improving their writing and speaking skill as well. Active learning method helps students to think critically.[49] This method increases individual thinking power and finally has positive impacts on their academic results. Emphasizing the huge benefits of active learning in mind, the chief focus of this study is fixed to observe and evaluate the impacts of active learning process on students' academic performance at undergraduate level Zoology Classes in Khulna Government Women's College, Bangladesh instead of the traditional lecturing method.

Review of Literature

The impacts of active learning methods in classroom management and students' academic success was studied by Odabasi and Kolburan who found that active learning helped them to remember the concepts permanently and this method is vital for their academic success.[40] Sometimes uses of chart, models, technology etc enhances students' academic performance. Pop-Pacurar and Tirla introduced models in biology classes as strategies of active learning and observed that students' average final score has increased by 2.03 points from the initial test whereas it was only 0.93 points who did not use models.[43] Model provides information through visual, tactile and auditory ways. An observation of Marlowe indicated that students' semester grade improved who watched video lecture and finished their assignment in class hour in comparison to those students who did not prevail this opportunity.[34] Greater students learning and conceptual understanding in upper division biology class takes place when interactive participation of students is ensured and effective learning is never possible without active engagement of students in the learning process .[7, 28]

Mahendra *et al*., emphasized the multicultural activities for better understanding of classroom learning instead of a single talk-chalk method.[33] An integration some strategies of active learning with traditional lecture method in a non major biology class and obtained significant improvement in conceptual understanding, responses and grading of students.[35] As strategies they used chart, model, journal, diagrams and others during classroom teaching. The effects of active learning on quality education both at private and public universities of Bangladesh was studied by Chowdhury and she pointed out some factors such as shortage of better infrastructure, modern class room facilities, trained teachers as well as large class size, excessive curricular loads, students prior experiences about active learning are the major hindrance behind the quality education.[10] She also reported that most of the university teachers in Bangladesh believe that all students are alike in the class room and their needs are same. This conception is wrong because each student is unique in thinking, so a single strategy of teaching like chalk- talk is not enough for all students in the class. From the study, she recommended the introduction of training programs for junior and senior teachers, redesigning of class room in a way that will help group discussions and other interactive activities among the learners. Besides, she emphasized the use of computers, power point, videos and other reality based computer software to develop students' higher order of thinking.

In order to see the impacts of using students' personal mobile devices and laptops in higher education, Ghilay and Ghilay carried an experiment at Neri Bloomfield School of Design and Education , Haifa , Isreal.[20] Sixty seven students took part in the research and they opined that courses based on mobile phone technology ensured their better engagement in learning process and improved academic attainment.

Redesigning of courses sometimes has positive effect on learning process. In order to evaluate the impacts of course redesign on attitudes and performances of students Armbruster *et al*., [4] performed an experiment on undergraduate level major and non major biology students for three successive years (2006-2008). For this, they reorder the presentation of the course content first, and then introducing active and problem based learning into every lecture and finally using strategies to ensure a more suitable environment for student centered learning. Student were taught according to above mentioned redesigning of course in 2007 and 2008 but in 2006 they were taught with primitive traditional lecture format only. Students three years performances were grades and analyzed statistically. Results revealed that attitudes and performances of students have increased significantly in 2007/2008 than 2006.

Freeman *et al*., conducted an experiment to see the impacts of traditional versus active learning on examination score and failure rates of undergraduate college students of science discipline.[18] Their investigation results revealed that student performance in examination increased by active learning compared with traditional lecturing method. Average failure rates of students were recorded as near about twenty two percent under active learning whereas it was thirty four percent under traditional lecture method.

Daniel performed an investigation by adding cooperative and collaborative activities in an undergraduate introductory biology courses to measure their impacts on students attendance and performance.[12] For this he divided two hundred sixty six students into two equal groups i.e., each group consisted of one hundred and thirty three students. Students of one group were allowed ten minutes time to discuss with peers before the test. The counter group (Control group) was not given the opportunity. A test was taken by fifty multiple choice questions which were identical for both groups. Results revealed that students who took part in pre exam group discussion were more confident and anxiety free in answering the questions whereas students of control group were so nervous and did several stupid mistakes.

The effectiveness of active learning method is studied by Slavin who stated that it motivates goal oriented behavior of learners.[46] Tynjala found that active learning helps to produce student better results more effectively than a traditional teacher centered method.[52] The study of Prince advocated that use of active learning facilitates in improving student performance.[44]

Deeper learning by active learning approach depends on a number of variables, these are teacher attitudes [6], ways of teaching [15], assessment [22], and teacher response also.[53] Moreover research revealed that student age, sex, subject discipline are directly correlated with student learning and achievement.[16,51] Research also indicates that relevant course content, teachers' support and method of teaching are very crucial for more productive learning.[38, 11, 4]

The investigation results of the Shah and Irshadullah demonstrated that student attendance, prior english grades, demographic factors etc are linked behind the development of academic performance in addition with active learning.[45] Similar results were also observed by Mushtaq and Khan who mentioned that proper guidance, family stress, communication skills are important factors that affects student performance.[39]

Material and Methods

The investigation was carried out by mixed method as methodology. The quantitative data for this study were generated by analyzing the document of the students' exam score. A survey based on questionnaires was used as instruments to collect students' opinion as qualitative data. Ten structured questionnaire were developed after doing an extensive review of literature in order to find the students' experiences of experimental group only about active learning. Survey experiment is very important in making a very precise report and conclusion. The survey experiment also provides significant information about personal feelings, perceptions, attitudes, opinions, knowledge, etc of a group of targeted people.[32] Besides, an observational data were also recorded from both groups of students on their responses in active and traditional learning.

Sampling

The study was carried out at Khulna Govt. Women's College , Bangladesh. It is located in the Khulna district, a southwestern part of the country. Thirty students of third year (Hons.) of the Zoology Department were the subject of this study who regularly takes

part in the classes. They were all female students and their aged between 21-22. Two equal groups were made randomly by the students. One is experimental group and other is control group. Each group was composed of fifteen students. Each group of students was instructed blood circulatory system, digestive and hormonal system of human body separately but the objectives of their course out lines, duration of class time, even text book were kept same for internal validity. Moreover in order to minimize the teaching variability both groups of students were taught by the same faculty member. Two classes per week and six weeks (from first week of April, 2019 to middle of the month of May, 2019) courses were selected for the study. Duration of each class was sixty minutes in length. The experimental group was taught by applying strategies of active learning whereas the classes of control group were taken only by using traditional chalk and talk method only. Power point, models, chart, cooperative group work, think -pair-share, debate, quick quizzes, muddiest point etc were used as active learning strategies for the students of experimental group. At the quit of the courses a test was taken by same multiple choice questions of twenty marks to compare the grades between the two groups. Students had been urged to view their experiences on five point Likert Scale ranging from 5 (strongly agree) to 1 (strongly disagree) about active learning method. Before conducting the research, ethical issues of quality research as described in University of Nottingham Malaysia Campus (UNMC) documentation were ensured and approved by the respective tutor.

Analysis of data

In order to view the impacts of two teaching methods on students' academic performance, data were analyzed by descriptive (mean, standard deviation, standard error) and inferential (independent t-test) statistics at the <0.05 significant level. At the end of the courses, the academic overall performance of experimental group was compared with the overall performance of students of control group. Besides, students have viewed their experiences through answering of questionnaire questions. In order to enhance validity and reliability, all results of the investigation were triangulated.

Results

Calculated exam score of the two groups of students are provided in Table I. Survey results of students' experiences about active learning of experimental group and observational results on different parameters of classroom activities of both groups of

students are provided in Table II and Table III respectively.

Table I: Descriptive results of two groups of students.

Group	Mean ± S.E,	N	T	D.F	Level of significance
Experimental group (active learning)	15.46 ± .47	30	2.81	28	0.05*
Control group (traditional learning)	13.40 ± .48				

[S.E.-Standard error; N-Number of Students; T- t-test results; D.F.-Degrees of Freedom]

The results of the present study revealed that performance of students under traditional lecture method is not praiseworthy in comparison to the results of active learning method. Students under traditional lecture method could not achieve higher grades in exam outcomes. Quantitative data of students' exam outcomes indicated that a significant relationship (<0.05) exist between active learning and students' performance. Students performed better on content taught by active learning method.

Table II: Students' experiences about active learning method

Experiences of students	Strongly agree	Agree	Neither Agree nor Disagree	Disagree	Strongly disagree
1. The class with power point, group work, debate and other forms of active learning was interesting.	9 (60%)	6 (40%)	0 -	0 -	0 -
2. The class environment was charming and easy to understand in active learning method.	8 (53%)	6 (40%)	1 (7%)	0 -	0 -
3. Class activities were helpful in building interaction between students and teacher or students with other students.	6 (40%)	6 (40%)	2 (13%)	1 (7%)	0 -
4. Active learning method helped you to review the key points of the contents or reach higher order of thinking.	6 (40%)	5 (33%)	3 (20%)	1 (7%)	0 -

5. Active learning method helped you to retain course material for a long time.	5 (33%)	4 (27%)	3 (20%)	2 (13%)	1 (7%)
6. Active learning method helped you to keep your attention throughout the class.	6 (40%)	3 (20%)	2 (13%)	2 (13%)	2 (13%)
7. Active learning method helped you to use cent percent class time efficiently.	4 (27%)	5 (33%)	3 (20%)	2 (13%)	1 (7%)
8. Active learning method helped you to take better notes during lesson.	3 (20%)	4 (27%)	4 (27%)	2 (13%)	2 (13%)
9. In active learning method do teachers value your potential to solve your problem?	4 (27%)	3 (20%)	3 (20%)	3 (20%)	2 (13%)
10. Active learning method is helpful for you to attain better results in your examination.	5 (33%)	3 (20%)	4 (27%)	2 (13%)	1 (7%)

Strongly Agree-5; Agree-4; Neither Agree nor Disagree-3; Disagree-2 and Strongly Disagree-1

From the table **II** it is assumed that active learning method inspire students to participate in lessons more actively via group work, making interaction with others, reviewing the key points, keeping attention throughout the class, proper use of valuable time etc. Not only that this method also helps them to retain the course material permanently and obtaining better result. In a word the entire class room seems to them very charming and delightful. So this method may be a very useful tool for classroom management.

Table III: Observational results of experimental group and control group.

Description / parameter	Group	No. of participants	Description of activity / respond
Students' attendance	Experimental	15	All students (cent percent) of this group attend in the class timely.
	Control	15	Seventy five percent students come timely but the remaining twenty five percent make delay to attend the class.

Class room interaction	Experimental	15	Excellent. Students want o solve a problem by interacting each other. They respect others' opinion.
	Control	15	Very week or no sign of interaction.
Questioning in the class room	Experimental	15	Most of the students don't hesitate to ask question to their teachers
	Control	15	A very few (one or two) students ask questions to their teachers among the fifteen participants.
Answering question	Experimental	15	All are exciting to give the answer.
	Control	15	They all feel shy in answering teachers questions
Group work participation	Experimental	15	Students feel pleasure to take part in group work, debate, presentations and other collaborative activities.
	Control	15	Students do not take part in group work
Class room environment (disinterest/ participatory)	Experimental	15	Participatory and friendly. Every student takes the responsibility of doing things from their own.
	Control	15	Monotonous, boring, disinteresting, one way etc.

Discussion

Fayombo showed that a significant positive correlation exist between the application of active learning strategies and students academic achievement which strongly supports the outcomes of present study.[17] Haberyan gave an explanation of active learning which creates a student's affinity toward learning.[24] By active learning method students have an opportunity to discuss a thing in different ways with other members of the group and come to a decision about result on consensus basis that affects their exam grades positively which supports the results of present investigation. A comparative study between problem based and lectured based learning of Achuonye on eight hundred and ten secondary school science students in Nigeria has shown that problem based learning motivated the male students especially to learn biology more in comparison to lecture based learning which is in keeping with the results of the present study.[1] This high motivation come from the real life experiences and collaborative nature of problem

based learning strategy. The significance of problem based learning was reiterated by Tandogan and Orhan , who stated that enactment of problem based learning positively affects learner's intellectual progress and keeps their wrong thought at the reasonable level.[50]

The effectiveness of active learning was studied by Ganyaupfu who stated that a combination of teacher centered and student centered approach is the most effective method which is firmly consistent with the results of present investigation.[19] To determine the potential factors that affects student academic performance, Mushtaq and Khan carried out an experiment and found that communication, learning facilities and proper guidance have positive significant effect on student performance and the only family stress affects negatively the performance of students.[39]

The effectiveness of team based learning (TBL) versus lecture based learning in sociology class was evaluated by Killian and Bastes who found that students in TBL classes obtained higher grades in their final exam than students in lecture based learning (LBL) classes.[27] The main causes of better performance of students in TBL classes are students are able to discuss a topic in different ways or brainstorming their ideas with others or give opinion in small groups which supports the results of present investigation. In a word, a tem based learning class is enjoyable and appealing. Academic performance was monitored by Aji and Khan and found that students passing rate in active learning classes was 61% whereas it was only 40% for the students in traditional class room.[2] The high and low performance under active learning and traditional learning respectively supports the outcomes of students of experimental group (active learning) and control group (traditional lecture method of learning) of present study. The investigation of Burt proved that motivation as well as performance of students improves by active learning through development of self confidence, metacognitive skill, and learning goals.[9]

A study of Kokabas demonstrated that students attitudes positively improved by cooperative learning, a sub dimension of active learning.[29] Statistical analysis of the investigation results of Pimolporn and Darrin demonstrated that use of active learning approaches positively increases students' attitudes towards their academic achievement which is in keeping with the findings of present study .[42] Active learning of the present study helps students to construct a better understanding of the concepts more efficiently and obtain increased grades that is supported by the results of previous studies of

Armbruster, *al et*.,[4,] Bonwell & Eison[8], Chowdhury [10], Freeman, *et al*.,[18]. Not only that active learning helps learner to retain acquired knowledge for longer time because during learning they themselves remain active, performed activities in cooperation with their peers, try to learn something by doing.

Recommendations

i) Emphasis to be given on teacher professional training especially in pedagogy, teaching methodology and ICT.

ii) It is important to minimize class size i.e., students-teacher ratio for effective learning.

iii) Importance to be given on the availability of teaching aids like computer, power point, projector, microscope, digital board, chart, model, etc without which implementation of active learning is difficult to carry out.

iv) Importance to be given on the development of warm relationship between teacher and student.

v) Active learning is poorly practiced in our country. So this method should be incorporated in syllabuses and curricula of higher education institutions in Bangladesh.

vi) Before the introduction of active learning, try to convince the students about the benefits of active learning.

Conclusion

From the present study it is assumed that students engaged in active learning outperformed their counterpart which supports the superiority of active learning over the traditional learning method. Moreover questionnaire results indicated that the majority of the students showed their positive views towards the active learning approaches. Nevertheless the study may serve as basis for further studies to promote active learning strategies i.e., student direct engagement with course material, active collaboration, use of technology etc. Active learning plays an important role in class room management which ensures high satisfaction to the students in the present investigation. In addition to students' academic success, active learning method not only cultivates joyful and interactive classroom atmosphere but also helps them to recollect and keep obtained

knowledge permanently in their mind. Active learning method helps to develop students' metacognitive faculty also. So the active learning method ought to be incorporated in our educational system as a teaching method.

Acknowledgement

The paper is a part of the assignment of author's MA in Education courses at University of Nottingham Malaysia Campus (UNMC). The author is grateful to the UNMC authority and Ministry of Education (MoE), Bangladesh for their academic, financial and other necessary supports. The author is also thankful to the Principal of Khulna Govt. Women's College for giving permission and encouragement to conduct the research.

References

1. Achuonye, K. A. *A comparative study of problem-based and lecture-based learning in secondary school students' motivation to learn science.* International journal of science and technology Education Research, 1(6) 2010, Pp.126-131.
2. Aji,C.A., & Khan, M.J. *The impact of active learning on Students Academic performance.* Open Journal of Social Sciences, 7, 2019, Pp.204-211.
3. Ali, N., Jusoff, K., Ali, S., Mokhtar, N., & Salamat, A. S. A. *The factors influencing students' performance at Universiti Teknologi MARA Kedah, Malaysia.* Management Science and Engineering, 3(4), 2009. Pp. 81.
4. Armbruster, P., Patel, M., Johnson, E., & Weiss, M. *Active learning and student-centered pedagogy improve student attitudes and performance in introductory biology.* CBE—Life Sciences Education, 8(3), 2009, Pp. 203-213.
5. Ayeni, A. J. *Teachers' Professional Development and Quality Assurance in Nigerian Secondary Schools.* World journal of education, 1(1), 2011, Pp. 143-149.
6. Baeten, M., Kyndt, E., Struyven, K., & Dochy, F. *Using student-centred learning environments to stimulate deep approaches to learning: Factors encouraging or discouraging their effectiveness.* Educational Research Review, 5(3), 2010, Pp. 243-260.
7. Baxter, S., & Gray, C. *The application of student-centred learning approaches to clinical education.* International Journal of Language & Communication Disorders, 36(1), 2001, Pp. 396-400.
8. Bonwell, C. C., & Eison, J. A. *Active Learning: Creating Excitement in the Classroom.*

1991 ASHE-ERIC Higher Education Reports. ERIC Clearinghouse on Higher Education, The George Washington University, One Dupont Circle, Suite 630, Washington, DC 20036-1183.1991

9. Burt, J. *Impact of active learning on performance and motivation in female Emirati students*. Learning and teaching in higher education: Gulf Perspectives, 1(4), 2004, Pp.1-15.AAA

10. Chowdhury F. Emplyment of active learning at HELs in Bangladesh to improve education quality. *International Education Studies, 9 (10)*, 2016, Pp.47-57

11. Cortizo, J. L., Rodríguez, E., Vijande, R., Sierra, J. M., & Noriega, A. Blended learning applied to the study of Mechanical Couplings in engineering. *Computers & Education*, *54*(4), 2010, Pp.1006-1019.

12. Daniel, K. L. Impacts of active learning on student outcomes in large-lecture biology courses. *The American Biology Teacher*, *78*(8), 2016, Pp. 651-655.

13. Day, R. S. Teaching from notes: Some cognitive consequences. *New directions for teaching and learning*, (2), 1980, Pp.95-112.

14. Dewey, J. Democracy and education (1916). *Middle Works Bd*, *9*.1966

15. Diseth, Å. Students' evaluation of teaching, approaches to learning, and academic achievement. *Scandinavian Journal of Educational Research*, *51*(2), 2007, Pp. 185-204.

16. Edmunds, R., & Richardson, J. T. (2009). Conceptions of learning, approaches to studying and personal development in UK higher education. *British Journal of Educational Psychology*, *79*(2), 2009, Pp. 295-309.

17. Fayombo, G. A. Active learning strategies and academic achievement among some psychology undergraduates in Barbados. *Journals, World Academy of Science, Engineering and Technology*, *7*.2013

18. Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *111*(23), 2014, Pp. 8410-8415.

19. Ganyaupfu, E. M. Teaching methods and students' academic performance. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, *2*(9), 2013, Pp. 29-35.

20. Ghilay, Y., & Ghilay, R. TBAL: Technology-Based Active Learning in Higher Education.

Journal of Education and Learning, *4*(4),2015, Pp.10-18.

21. Greitzer, F. L. A cognitive approach to student-centered e-learning. In *proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting* (Vol. 46, No. 25, 2002, Pp. 2064-2068). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications.

22. Gulikers, J. T., Kester, L., Kirschner, P. A., & Bastiaens, T. J. The effect of practical experience on perceptions of assessment authenticity, study approach, and learning outcomes. *Learning and Instruction*, *18*(2),2008, Pp. 172-186.

23. Gulpiner, M.A., & Yegen, B.C. Interactive learning for meaningful learning in large groups. *Medical teacher,*27(7), 2005, Pp. 590-594

24. Haberyan, A. Team-based learning in an industrial/organizational psychology course. *North American Journal of Psychology*, *9*(1), 2007, Pp. 143.

25. Hacisalihoglu, G., Stephens, D., Johnson, L., & Edington, M. The use of an active learning approach in a SCALE-UP learning space improves academic performance in undergraduate General Biology. *PloS one*, *13*(5), 2018, 0197916.

26. Hake, R. R. Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American journal of Physics*, *66*(1), 1998, Pp. 64-74.

27. Killian, M., & Bastas, H. The effects of an active learning strategy on students' attitudes and students' performances in introductory sociology classes. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, *15*(3), 2015, Pp.53-67.

28. Knight, J. K., & Wood, W. B. Teaching more by lecturing less. *Cell biology education*, *4*(4),2005, Pp. 298-310.

29. Kocabas, A. *İşbirlikli öğrenmenin blokflüt öğretimi ve öğrenme stratejileri üzerindeki etkileri* (Doctoral dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).1995.

30. Kuh, G. D., Cruce, T. M., Shoup, R., Kinzie, J., & Gonyea, R. M. Unmasking the effects of student engagement on first-year college grades and persistence. *The journal of higher education*, *79*(5), 2008, Pp. 540-563.

31. Lake, D. Student performance and perceptions of a lecture-based course compared with the same course utilizing group discussions. Physical Therapy, 81(3), 2001. pp. 896-902.

32. Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. *Practical research*. Pearson Custom. (2005).

33. Mahendra, N., Bayles, K. A., Tomoeda, C. K., & Kim, E. S. Diversity and learner-centered

education. *The ASHA Leader*, *10*(16), 2005, Pp. 12-19.

34. Marlowe, C. A. The effect of the flipped classroom on student achievement and stress.2012

35. McClanahan, E. B., & McClanahan, L. L. Active learning in a non-majors biology class: lessons learned. *College Teaching*, *50*(3), 2002, Pp. 92-96.

36. Michael, j. Where is the evidence that active learning works? *Advances in Physiology Education, 30,* 2006, Pp.159-167

37. Millis, B. J. Active learning strategies in face-to-face courses. 2012.

38. Moulding, N. T. Intelligent design: Student perceptions of teaching and learning in large social work classes. *Higher Education Research & Development*, *29*(2), 2010, Pp. 151-165.

39. Mushtaq, I., & Khan, S. N. Factors Affecting Students Academic Performance. *Global journal of management and business research*, *12*(9). 2012

40. ODABAŞI, B., & KOLBURAN, G. Employement of Active Learning ın Classroom Management and It's Effect on Student'Academiz Success. 2013

41. Omelicheva, M. Y., & Avdeyeva, O. Teaching with lecture or debate? Testing the effectiveness of traditional versus active learning methods of instruction. *PS: Political Science & Politics*, *41*(3), 2008, Pp. 603-607.

42. Pimolporn, S & Darrin, T. The Relationship of Active Learning and Academic Achievement among Provincial University Students in Thailand. *APHEIT INTERNATIONAL JOURNAL* 7(1), 2018Pp.47-61

43. Pop-Pacurar, I., & Tirla, F. D. Models Role within Active Learning in Biology. A Case Study. *Acta Didactica Napocensia*, *2*(2), 2009, Pp. 41-50.

44. Prince, M. Does active learning work? A review of the research. *Journal of engineering education*, *93*(3), 2004, Pp. 223-231.

45. Shah, A. A., & Irshadullah, H. M. The factors affecting students' academic performance at Abdul Wali Khan University Mardan, Pakistan. *Research Journal of Education*, 2018, Pp. 59-67.

46. Slavin, R. E. Research for the future: Research on cooperative learning and achievement. *Contemporary Educational Psychology*, *21*, 1996, Pp. 43-69.

47. Soltanzadeh, L., Hashemi, S. R. N., & Shahi, S. The effect of active learning on academic

achievement motivation in high schools students. *Archives of Applied Science Research*, *5*(6), 2013, Pp. 127-131.

48. Stern, D. *Active learning for students and teachers: Reports from eight countries*. Peter Lang Pub Inc.1997.

49. Sultana, M., & Haque, M. S. The Cause of Low Implementation of ICT in Education Sector Considering Higher Education: A Study on Bangladesh. *Canadian Social Science*, *14*(12), 2018, Pp. 67-73

50. Tandogan, R. O., & Orhan, A. (2007). The Effects of Problem-Based Active Learning in Science Education on Students' Academic Achievement, Attitude and Concept Learning. *Online Submission*, *3*(1), 2007, Pp. 71-81.

51. Tetik, C., Gurpinar, E., & Bati, H. (2009). Students' learning approaches at medical schools applying different curricula in Turkey. *Kuwait Medical Journal*, *41*(4), 2009, Pp. 311-316.

52. Tynjälä, P. Traditional studying for examination versus constructivist learning tasks: Do learning outcomes differ?. *Studies in Higher Education*, *23*(2), 1998, Pp. 173-189.

53. Valk, A., & Marandi, T. How to support deep learning at a university. In *Proceeding of the international conference on education* .Vol. 200, 2005, Pp. 191-196).

54. Weimer, M. *Learner-centered teaching: Five key changes to practice*. John Wiley & Sons.2002.

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 126-139

On Some Characteristics of the Joint Distribution of Sample Variances

M. Hafidz Omar and Anwar H. Joarder

M. Hafidz Omar
Department of Mathematics and Statistics
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran 31261, Saudi Arabia
e-mail : omarmh@kfupm.edu.sa
e-mail : ohmstat@gmail.com
and
Anwar H. Joarder
Department of Computer Science and Engineering
Faculty of Science and Engineering
Northern University of Business and Technology Khulna
Khulna-9100, Bangladesh
e-mail : anwar.joarder@nubtkhulna.ac.bd
e-mail : ajstat@gmail.com

Abstract

The joint distribution of correlated sample variances and their product moments have been derived. Finite expressions have been derived for product moments of sample variances of integer orders. Marginal and conditional distributions, conditional moments, coefficient of skewness and kurtosis of conditional distribution of a sample variance given the other variance have also been discussed. Shannon entropy of the distribution is also derived. When the variables are uncorrelated, the resulting characteristics match with the independent case of sample variances.

Keywords

Joint distribution of sample variances; bivariate distribution; bivariate normal distribution, correlated chi-square variables; product moments

AMS Mathematics Subject Classification (2000): 62E15, 60E05, 60E10

1. Notations and Introduction

$\underset{\sim}{X}_j = \begin{pmatrix} X_{1j} \\ X_{2j} \end{pmatrix}$, $j = 1, 2, ..., N(> 2)$: Two dimensional normal random vectors,

X_{1j}, $j = 1, 2, ..., N(> 2)$: sample observations of the first component of a two- dimensional independent normal random vector, X_{2j}, $j = 1, 2, ..., N(> 2)$: sample observations of the second component of a two-dimensional independent normal random vector,

$\bar{X}_1 = \sum_{j=1}^{N} X_{1j}$, $\bar{X}_2 = \sum_{j=1}^{N} X_{2j}$: Mean of components, $\underset{\sim}{\bar{X}} = \begin{pmatrix} \bar{X}_1 \\ \bar{X}_2 \end{pmatrix}$: Vector of sample means,

$\sum_{j=1}^{N} (X_j - \bar{X})(X_j - \bar{X})' = A$: The sums of squares and cross product (SSCP) matrix,

$A = (a_{ik}), i = 1, 2; k = 1, 2$: SSCP matrix is written by its elements,

where $a_{ii} = mS_i^2 = \sum_{j=1}^{N} (X_{ij} - \bar{X}_i)^2$, $m = N - 1$, and $a_{12} = \sum_{j=1}^{N} (X_{1j} - \bar{X}_1)(X_{2j} - \bar{X}_2) = mRS_1$

$\Sigma = (\sigma_{ik})$, $i = 1, 2;\ k = 1, 2$: Variance covariance matrix,

where $\sigma_{11} = \sigma_1^2$, $\sigma_{22} = \sigma_2^2$, $\sigma_{12} = \rho\sigma_1\sigma_2$ with $\sigma_1 > 0$, $\sigma_2 > 0$,

ρ $(-1 < \rho < 1)$: The product moment correlation coefficient between X_1 and X_2.

Fisher (1915) derived the distribution of the matrix A in order to study the distribution of correlation coefficient for a bivariate normal sample. The joint density function (pdf) of the elements of A can be written by the following :

$$f(a_{11}, a_{22}, a_{12}) = c \left(a_{11}a_{22} - a_{12}^2\right)^{\frac{m-3}{2}} \exp\left(-\sum_{k=1}^{2} \frac{a_{kk}}{2(1-\rho^2)\sigma_k^2} + \frac{\rho a_{12}}{(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2} \right), \qquad (1.1)$$

where $2^m \sqrt{\pi}\Gamma(m/2)\Gamma((m-1)/2)c = (1-\rho^2)^{-m/2}(\sigma_1\sigma_2)^{-m}$,

with $a_{11} > 0$, $a_{22} > 0$, $-\sqrt{a_{11}a_{22}} < a_{12} < \sqrt{a_{11}a_{22}}$, $m > 2$, $-1 < \rho < 1$ (Anderson, 2003, 123).

For the estimation of correlation coefficient by modern techniques, we refer to Ahmed (1992). The joint density function of $U = mS_1^2/\sigma_1^2$ and $V = mS_2^2/\sigma_2^2$, called the bivariate chi-square distribution, was derived by Joarder (2007) in the spirit of Krishnaiah, Hagis and Steinberg (1963) who studied the bivariate chi-distribution. The product moment correlation coefficient between U and V can be calculated to be ρ^2. In case the correlation coefficient $\rho = 0$, the density function of U and V becomes that of the product of two independent chi-square variables each with m degrees of freedom.

In this paper, we derive the joint pdf of sample variances, namely, S_1^2 and S_2^2 in

Theorem 3.1. With the help of transformations in the density function, we derive the joint characteristic function in Theorem 3.2, the marginal distribution of variance, conditional distribution of variances, moments and some other characteristics of conditional distribution are discussed in Section 4. Product moments and Shannon entropy are discussed in Section 5 and Section 6 respectively. Correlation between sample variances is also derived in section 5. In the special case of $\rho = 0$, the findings in the paper matches with the independent case of sample variances. The results in the paper can be extended to joint distribution of sample variances based on scale mixture of bivariate normal distributions along Joarder and Ahmed (1996).

2. Some Mathematical Preliminaries

The hypergeometric function ${}_pF_q(a_1,a_2,\cdots,a_p;b_1,b_2,\cdots,b_q;z)$ is defined by

$$ {}_pF_q(a_1,a_2,\cdots,a_p;b_1,b_2,\cdots,b_q;z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a_1)_{\{k\}}(a_2)_{\{k\}}\cdots(a_p)_{\{k\}}}{(b_1)_{\{k\}}(b_2)_{\{k\}}\cdots(b_q)_{\{k\}}} \frac{z^k}{k!}, \tag{2.1} $$

where $a_{\{k\}} = a(a+1)\cdots(a+k-1)$.

The hypergeometric function ${}_1F_1(a;b;z)$ is related to generalized Laguerre polynomial $L_n^{(\alpha)}(x)$ by the relation

$$ L_n^{(\alpha)}(z) = \binom{n+\alpha}{n} {}_1F_1(-n;\alpha+1;z) \tag{2.2} $$

(Abramowitz and Stegun, 1964, #22.5.54, p780). Note that ${}_1F_1(a,b;z)$ can also be transformed as

$$ {}_1F_1(a;b;z) = e^z \, {}_1F_1(b-a;b;z) \tag{2.3} $$

(Abramowitz and Stegun, 505; #13.1.27). Also ${}_2F_1(a,b;c;z)$ can be transformed as

$$ {}_2F_1(a,b;c;z) = (1-z)^{c-a-b} \, {}_2F_1(c-a,c-b;c;z) \tag{2.4} $$

(Gradshtyen and Ryzhik, 1992, 1069). The function ${}_2F_1(a,b;c;z)$ is also related to Jacobi's polynomial $P_n^{(\alpha,\beta)}(z)$ in the following way:

$$ {}_2F_1(-n,\alpha+1+\beta+n;\alpha+1;z) = \frac{n!}{(n+1)_{\{n\}}} P_n^{(\alpha,\beta)}(1-2z). \tag{2.5} $$

We will also be using the following descending and ascending factorial of k terms:

$$ a^{\{k\}} = a(a-1)\cdots(a-k+1), \quad a^{\{0\}} = 1. \tag{2.6} $$

$$a_{\{k\}} = a(a+1)\cdots(a+k-1),\ \ a_{\{0\}} = 1. \tag{2.7}$$

3. The Joint Density Function of Sample Variances

Consider a random sample of size N represented by $\underset{\sim}{X}_j = (X_{1j}, X_{2j}, \cdots, X_{pj})', j = 1, 2, \cdots, N$ where $\underset{\sim}{X}_j \sim N_p(\underset{\sim}{\mu}, \Sigma)$, $\underset{\sim}{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_p)'$ and $\Sigma = (\sigma_{ik})$, $i = 1, 2, \cdots, p;\ k = 1, 2, \cdots, p$ is a $p \times p$ positive definite matrix. Then $U_i = \sum_{j=1}^{N} (X_{ij} - \bar{X}_i)^2 / \sigma^2 \sim \chi^2_m \ \ (i = 1, 2, \cdots, p)$ with $m = N - 1$, and the joint distribution of $U_1, U_2, \cdots, U_p$ is called a p-variate chi-square distribution (Krishnaiah, Hagis and Steinberg, 1963). In this section we derive joint pdf of sample variances S_1^2 and S_2^2, and study some related properties in the subsequent chapters. Though the joint density function follows from Krishnaiah, Hagis and Steinberg (1963) or Joarder (2007), we provide direct derivation to provide better insight.

Theorem 3.1 The joint pdf of S_1^2 and S_2^2 is given by

$$f_2(s_1^2, s_2^2) = \left(\frac{m}{2\sigma_1\sigma_2}\right)^m \frac{(s_1^2 s_2^2)^{(m-2)/2}}{(1-\rho^2)^{m/2}\Gamma^2(m/2)} \exp\left[\frac{-m}{2-2\rho^2}\left(\frac{s_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{s_2^2}{\sigma_2^2}\right)\right]$$

$$(3.1) \times {}_0F_1\left(\frac{m}{2}; \frac{(m\rho)^2 s_1^2 s_2^2}{(2-2\rho^2)^2 \sigma_1^2 \sigma_2^2}\right),$$

where $m = N - 1 > 2$, $-1 < \rho < 1$ and the function ${}_0F_1(a; z)$ is defined in (2.1).

Proof. Under the transformation $a_{11} = ms_1^2, a_{22} = ms_2^2, a_{12} = mrs_1s_2$ in (2.1) with Jacobian $J((a_{11}, a_{22}, a_{12}) \to (s_1^2, s_2^2, r)) = m^3 s_1 s_2$, the joint pdf $f_1(s_1^2, s_2^2, r)$ of S_1^2, S_2^2 and R can be written out, and then the pdf of S_1^2 and S_2^2 can be written as

$$f_2(s_1^2, s_2^2) = \left(\frac{m}{2\sigma_1\sigma_2}\right)^m \frac{(1-\rho^2)^{-m/2}}{\sqrt{\pi}\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{m-1}{2})} (s_1 s_2)^{m-2} \exp\left[-\frac{m}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{s_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{s_2^2}{\sigma_2^2}\right)\right] I(s_1, s_2)$$

where $I(s_1, s_2) = \int_{-1}^{1} (1-r^2)^{(m-3)/2} \exp\left(\frac{m\rho s_1 s_2 r}{(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2}\right) dr.$

Having evaluated the last integral and made some algebraic simplifications, we have the pdf in (3.1).

It has been checked with MATHEMATICA 5.0 that the function in (3.1) integrates to 1. Figure 1 in the Appendix shows the bivariate surface of the density function in (3.1) for

various values of ρ for m = 5.

Theorem 3.2 The characteristic function of the joint pdf in (3.1) of sample variances is given by

$$\phi(t_1,t_2)=\left[\left(1-\frac{2i\sigma_1^2}{m}t_1\right)\left(1-\frac{2i\sigma_2^2}{m}t_2\right)+\frac{4\sigma_1^2\sigma_2^2\rho^2}{m^2}t_1t_2\right]^{-m/2},$$

where $-1<\rho<1$ and $m>2$.

Proof. The characteristic function of the joint pdf of sample variances in (3.1) is given by $\phi(t_1,t_2)=\int_{v=0}^{\infty}\int_{u=0}^{\infty}e^{i(t_1u+t_2v)}f(u,v)dudv$. The integral can be evaluated by expanding ${}_0F_1(b;z)$ in the density function $f_2(s_1^2,s_2^2)$.

4. Marginal and Conditional Distributions

Theorem 4.1 Let S_1^2 and S_2^2 be sample variances with joint pdf given by (3.1). Then $S_i^2(i=1,2)$ has the following pdf:

$$g_i(s_i^2)=\left(\frac{m}{2\sigma_i^2}\right)^{m/2}\frac{(s_i^2)^{(m-2)/2}}{\Gamma(m/2)}\exp\left(\frac{-ms_i^2}{2\sigma_i^2}\right),\quad (i=1,2).$$

Proof. The proof requires the evaluation of the following integral :

$$g_i(s_i^2)=\int_0^{\infty}f_2(s_1^2,s_2^2)ds_i^2,\ \ i=1,2,$$

where $f_2(s_1^2,s_2^2)$ is defined in (3.1).

It can be checked that $mS_i^2/\sigma_i^2 \sim \chi_m^2,\ i=1,2.$

Theorem 4.2 Let S_1^2 and S_2^2 be two correlated sample variances with joint pdf given by (3.1). Then the conditional pdf of S_1^2 given $S_2^2=s_2^2$ is given by

$$f_2(s_1^2\,|\,s_2^2)=\left(\frac{m}{(2-2\rho^2)\sigma_1^2}\right)^{m/2}\frac{s_1^{m-2}}{\Gamma(m/2)}\exp\left[\frac{-m}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{s_1^2}{\sigma_1^2}+\frac{\rho^2s_2^2}{\sigma_2^2}\right)\right]$$
$$\times\ {}_0F_1\left(\frac{m}{2};\frac{(m\rho)^2s_1^2s_2^2}{(2-2\rho^2)^2\sigma_1^2\sigma_2^2}\right). \qquad (4.1)$$

where $m>2,\ -1<\rho<1$ and ${}_0F_1(a;z)$ is defined by (2.1).

Proof. The theorem follows from

$$f_2(s_1^2 \mid s_2^2) = \frac{f_2(s_1^2, s_2^2)}{g_2(s_2^2)}$$

where $g_2(s_2^2)$ is given by Theorem 4.1

Theorem 4.3 Le S_1^2 and S_2^2 be correlated sample variances with joint pdf given by (3.1). Then the regression function of S_1^2 given $S_2^2 = s_2^2$ is given by

$$E(S_1^2 \mid S_2^2 = s_2^2) = [m(1-\rho^2) + \rho^2 v]\frac{\sigma_1^2}{m}, \ m > 2, \ -1 < \rho < 1.$$

Proof. The regression function of S_1^2 given $S_2^2 = s_2^2$ follows from the definition

$$E(S_1^2 \mid S_2^2 = s_2^2) = \int_0^\infty s_1^2 f_2(s_1^2 \mid s_2^2) ds_1^2.$$

Theorem 4.4 Le S_1^2 and S_2^2 be correlated sample variances with joint pdf given by (3.1). Then the a-th moment of the conditional distribution S_1^2 given $S_2^2 = s_2^2$ is given by

$$E(S_1^{2a} \mid S_2^2 = s_2^2) = \left(\frac{(2-2\rho^2)\sigma_1^2}{m}\right)^a \frac{\Gamma\left(a + (m/2)\right)}{\Gamma\left(m/2\right)} e^{-z} {}_1F_1\left(a + \frac{m}{2}; \frac{m}{2}; z\right), \tag{4.2}$$

where $m > 2$, $-1 < \rho < 1$ and ${}_1F_1(a; b; z)$ is defined by (2.1) and (2.3).

Proof. The regression function of S_1^2 given $S_2^2 = s_2^2$ follows from the definition

$$E(S_1^{2a} \mid S_2^2 = s_2^2) = \int_0^\infty s_1^{2a} f_2(s_1^2 \mid s_2^2) ds_1^2.$$

The derivation requires evaluation of a gamma integral, and simplification of hypergeometric function.

Corollary 4.1 Le S_1^2 and S_2^2 be correlated sample variances with joint pdf given by (3.1). Then for any positive integer a, the a-th moment of the conditional distribution of S_1^2 given S_2^2 has the following representations:

$$E\left(S_1^{2a} \mid S_2^2 = s_2^2\right) = \left(\frac{\sigma_1^2}{m}\right)^a \sum_{k=0}^{a} \binom{a}{k} \left(\frac{m s_2^2}{\sigma_2^2}\rho^2\right)^k (2-2\rho^2)^{a-k} \left(m/2\right)_{\{a-k\}}, \tag{4.3}$$

$$\text{or,}\quad E(S_1^{2a} \mid S_2^2 = s_2^2) = \left(\frac{\sigma_1^2}{m}\right)^a (2-2\rho^2)^a a! L_a^{(m-2)/2}(-z), \tag{4.4}$$

where $-1 < \rho < 1$, $m > 2$, $L_n^{(\alpha)}(x)$ is the generalized Laguerre Polynomial defined by (2.2) and z is defined by $(2-2\rho^2)\sigma_2^2 z = m s_2^2 \rho^2$.

Proof. By using (2.1) in (2.3), we have

$${}_1F_1\left(a+(m/2);(m/2);z\right) = e^z \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-a)_{\{k\}}}{(m/2)_{\{k\}}} \frac{(-z)^k}{k!},$$

which, by virtue of (2.6) and (2.7), can be expressed as

$${}_1F_1\left(a+(m/2);(m/2);z\right) = e^z \sum_{k=0}^{a} \frac{a^{\{k\}}}{(m/2)_{\{k\}}} \frac{z^k}{k!}.$$

Since $\binom{a}{k} = \frac{a^{\{k\}}}{k!}$, we have

$${}_1F_1\left(a+(m/2);(m/2);z\right) = e^z \sum_{k=0}^{a} \binom{a}{k} \frac{z^k}{(m/2)_{\{k\}}}. \tag{4.5}$$

Hence by using (4.5) in (4.2), we have (4.3).

Next, by using (2.3) in (4.2), we have

$$E(S_1^{2a} \mid S_2^2) = \frac{(2-2\rho^2)^a}{\Gamma(m/2)} \Gamma\left(a+(m/2)\right) {}_1F_1\left(-a;(m/2);-z\right). \tag{4.6}$$

Putting $n = a, \alpha+1 = (m/2)$ in (2.2), we have

$$L_a^{(m-2)/2}(-z) = \frac{\Gamma\left(a+(m/2)\right)}{a!\Gamma\left(m/2\right)} {}_1F_1\left(-a;(m/2);-z\right). \tag{4.7}$$

By using (4.7) in (4.6), we have (4.4).

Corollary 4.2 The second, third and fourth order moments of the conditional pdf of sample variances are given by

$$E(S_1^4 \mid S_2^2 = s_2^2) = \left[\rho^4 v^2 + 2(m+2)\rho^2 v(1-\rho^2) + m(m+2)(1-\rho^2)^2\right] \frac{\sigma_1^4}{m^2}, \tag{4.8}$$

$$E\left[\left(S_1^2\right)^3 \middle| s_2^2\right] = \left[\rho^6 v^3 + 3(m+4)\rho^4(1-\rho^2)v^2 + 3(m+2)(m+4)\rho^2(1-\rho^2)^2 v + m(m+2)(m+4)(1-\rho^2)^3\right]\left(\sigma_1^2/m\right)^3, \tag{4.9}$$

and

$$E\left[\left(S_1^2\right)^4 \middle| s_2^2\right] = \left[\rho^8 v^4 + 4(m+6)\rho^6(1-\rho^2)v^3 + 6(m+4)(m+6)(1-\rho^2)^2 v^2 + 4(m+2)(m+4)(m+6)\rho^2(1-\rho^2)^3 v + M(1-\rho^2)^4\right]\left(\sigma_1^2/m\right)^4, \tag{4.10}$$

respectively where $M = m(m+2)(m+4)(m+6)$ and $v = ms_2^2/\sigma_2^2$.

Corollary 4.3 The second, third and fourth order corrected moments of the conditional pdf of sample variances are given by

$$E\left[\left\{S_1^2 - E\left(S_1^2 \mid S_2^2\right)^2\right\} \mid S_2^2\right] = \left[2m\left(1-\rho^2\right)^2 + 4\rho^2\left(1-\rho^2\right)\frac{ms_2^2}{\sigma_2^2}\right]\left(\sigma_1^2/m\right)^2, \tag{4.11}$$

$$E\left[\left\{S_1^2 - E\left(S_1^2 \mid S_2^2\right)^3\right\} \mid S_2^2\right] = 8\left(1-\rho^2\right)^2\left[m\left(1-\rho^2\right) + \frac{3ms_2^2\rho^2}{\sigma_2^2}\right]\left(\sigma_1^2/m\right)^3, \tag{4.12}$$

and

$$E\left[\left\{S_1^2 - E\left(S_1^2 \mid S_2^2\right)\right\}^4 \mid S_2^2\right] = 12\left(1-\rho^2\right)^2\left[4\rho^4 v^2 + 4(m+4)\rho^2\left(1-\rho^2\right)v + m(m+4)\left(1-\rho^2\right)^2\right]\left(\sigma_1^2/m\right)^4, \tag{4.13}$$

respectively where $m > 2$ and $-1 < \rho < 1$.

The moment in (4.11) is the variance of the conditional pdf of variances and is popularly denoted by $Var(S_1^2 \mid S_2^2 = s_2^2)$.

Corollary 4.4 The coefficient of skewness of the conditional distribution of variances is given by

$$\frac{E\left[\left\{S_1^2 - E\left(S_1^2 \mid S_2^2\right)\right\}^3 \mid S_1^2\right]}{\left[Var\left(S_1^2 \mid S_2^2\right)\right]^{3/2}} = \frac{\sqrt{8\left(1-\rho^2\right)}\left[m\left(1-\rho^2\right) + 3\rho^2 ms_2^2/\sigma_2^2\right]}{\left[m\left(1-\rho^2\right) + 2\rho^2 ms_2^2/\sigma_2^2\right]^{3/2}}. \tag{4.14}$$

If $\rho = 0$, the coefficient of skewness reduces to $\sqrt{8/m}$, which is the coefficient of skewness for univariate chi-square distribution with m degrees of freedom (See Johnson, Kotz and Balakrishnan, 1994, 420). If $\rho = 0$ and m increases indefinitely, then the coefficient of skewness of the conditional distribution would converge, as expected, to 0.

Corollary 4.5 The coefficient of kurtosis of the conditional distribution of variances is given by

$$\frac{E[\{(S_1^2 - E(S_1^2 \mid s_2^2)\}^4 \mid s_2^2]}{[Var(S_1^2 \mid s_2^2)]^2} = \frac{3[4\rho^4 v^2 + 4(m+4)\rho^2(1-\rho^2)v + m(m+4)(1-\rho^2)^2]}{[2\rho^2 v + m(1-\rho^2)]^2}, \qquad (4.15)$$

where $v = ms_2^2/\sigma_2^2$, $-1 < \rho < 1$, and $m > 2$. If $\rho = 0$, the coefficient of kurtosis reduces to $3 + 12/m$, which is the coefficient of kurtosis for univariate chi-square distribution with m degrees of freedom (See Johnson, Kotz and Balakrishnan, 1994, 420). If $\rho = 0$ and m increases indefinitely, then the coefficient of kurtosis of the conditional distribution would converge, as expected, to 3.

5. Product Moments

The following theorem reported in Joarder and Abujiya (2008) and Joarder (2009) has been expressed in generalized hypergeometric and some other functions in this section.

Theorem 5.1 Let the sample variances S_1^2 and S_2^2 have the joint pdf in (3.1). Then for $a > -m/2$, $b > -m/2$ and $-1 < \rho < 1$, the (a,b)-th product moment of S_1^2 and S_2^2, denoted by $\mu'(a,b;\rho) = E(S_1^{2a} S_2^{2b})$, is given by

$$\mu'(a,b;\rho) = \left(\frac{2}{m}\right)^{a+b} \sigma_1^{2a}\sigma_2^{2b} \frac{\Gamma\left((m/2)+a\right)\Gamma\left((m/2)+b\right)}{\Gamma^2(m/2)} {}_2F_1\left(-a,-b;(m/2);\rho^2\right). \qquad (5.1)$$

Proof. The (a,b)-th product moment $\mu'(a,b;\rho) = E(S_1^{2a} S_2^{2b})$ is given by

$$\mu'(a,b) = \frac{\sigma_1^{2a}\sigma_2^{2b}}{m^{a+b}} \frac{2^{a+b}(1-\rho^2)^{a+b+(m/2)}}{\sqrt{\pi}\,\Gamma(m/2)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2\rho)^{2k}}{(2k)!} \frac{\Gamma\left(k+a+(m/2)\right)}{\Gamma\left(k+(m/2)\right)} \Gamma\left(k+b+(m/2)\right)\Gamma\left(k+\tfrac{1}{2}\right).$$

Since $(2z)!\sqrt{\pi} = 2^{2z}\, z!\,\Gamma\left(z+(1/2)\right)$, the above can be written as

$$\mu'(a,b;\rho)=\frac{\sigma_1^{2a}\sigma_2^{2b}}{m^{a+b}}\frac{2^{a+b}(1-\rho^2)^{a+b+(m/2)}}{\Gamma(m/2)}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\rho^{2k}}{k!}\frac{\Gamma\left(k+a+(m/2)\right)}{\Gamma\left(k+(m/2)\right)}\Gamma\left(k+b+(m/2)\right). \quad (5.2)$$

Then by hypergeometric function (2.1), we have

$$\mu'(a,b;\rho)=\frac{\sigma_1^{2a}\sigma_2^{2b}}{m^{a+b}}2^{a+b}(1-\rho^2)^{a+b+(m/2)}\frac{\Gamma\left(a+(m/2)\right)\Gamma\left(b+(m/2)\right)}{\Gamma^2(m/2)}$$
$$\times {}_2F_1\left(a+(m/2),b+(m/2);(m/2);\rho^2\right)$$

which can be transformed to (5.1) by virtue of (2.4).

Corollary 5.1 Let the sample variances S_1^2 and S_2^2 have the joint pdf given by (3.1). Then for nonnegative integers a and b, $m>2$ and $-1<\rho<1$, we have the following:

$$(i)\ \mu'(a,b;\rho)=\frac{\sigma_1^{2a}\sigma_2^{2b}}{m^{a+b}}2^{a+b}(m/2)_{\{b\}}\sum_{k=0}^{a}(-1)^k\binom{a}{k}(1+b-k)_{\{k\}}\left((m+2k)/2\right)_{\{a-k\}}\rho^{2k},$$

$$(ii)\ \mu'(a,a;\rho)=\frac{\left(\sigma_1^2\sigma_2^2\right)^a}{m^{2a}}4^a(m/2)_{\{a\}}\sum_{k=0}^{a}\binom{a}{k}(1+a-k)_{\{k\}}\left((m+2k)/2\right)_{\{a-k\}}\rho^{2k},$$

$$(iii)\ \mu'(a,-a;\rho)=\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right)^a\frac{(m/2)_{\{a\}}}{\left((m-2)/2\right)^{\{a\}}}\sum_{k=0}^{a}\binom{a}{k}\frac{(1-a-k)_{\{k\}}}{(m/2)_{\{k\}}}\rho^{2k},$$

where $a^{\{k\}}$ and $a_{\{k\}}$ are defined by (2.6) and (2.7) respectively.

Proof. (i) Since ${}_2F_1(-a,-b;(m/2);\rho^2)=\sum_{k=0}^{a}\frac{(-a)_{\{k\}}(-b)_{\{k\}}}{(m/2)_{\{k\}}}\frac{\rho^k}{k!}$, (See 15.4.1 of Abramowitz and Stegun, 1972, p561), from Theorem 5.1, we have

$$\mu'(a,b;\rho)=2^{a+b}\frac{\Gamma\left(a+(m/2)\right)\Gamma\left(b+(m/2)\right)}{\Gamma^2(m/2)}\sum_{k=0}^{a}\frac{(-a)_{\{k\}}(-b)_{\{k\}}}{(m/2)_{\{k\}}}\frac{\rho^k}{k!}.$$

Further by virtue of $(-a)_{\{k\}}\Gamma(a-k+1)=(-1)^k\ \Gamma(a+1)$, we have

$$\mu'(a,b;\rho)=\frac{\sigma_1^{2a}\sigma_2^{2b}}{m^{a+b}}2^{a+b}\frac{\Gamma\left(a+(m/2)\right)\Gamma\left(b+(m/2)\right)}{\Gamma\left(m/2\right)\Gamma\left(m/2\right)}\sum_{k=0}^{a}\binom{a}{k}\frac{(b-k+1)_{\{k\}}\Gamma\left(m/2\right)}{\Gamma\left((m/2)+k\right)}\rho^{2k},$$

which is equivalent to (i), since $a_{\{k\}}\Gamma(a)=\Gamma(a+k)$.

(ii) Putting a for b in Theorem 5.1, we have

$$\mu'(a,a)=\frac{\sigma_1^{2a}\sigma_2^{2a}}{m^{a+a}}2^{2a}\frac{\Gamma^2\left(a+(m/2)\right)}{\Gamma^2(m/2)}\,{}_2F_1\left(-a,-a;(m/2);\rho^2\right)$$

which is the same as what we have in part (ii) of the corollary.

(iii) Putting $-a$ for b in Theorem 5.1, we have

$$\mu'(a,-a;\rho)=\frac{\sigma_1^{2a}\sigma_2^{-2a}}{m^{a-a}}\frac{\Gamma\left(a+(m/2)\right)\Gamma\left(-a+(m/2)\right)}{\Gamma(m/2)\Gamma(m/2)}\sum_{k=0}^{a}\frac{a!(-a-k+1)_{\{k\}}}{(a-k)!(m/2)_{\{k\}}}\frac{\rho^{2k}}{k!}.$$

Since by (2.6), $a^{\{k\}}\Gamma(a+1-k)=\Gamma(a+1)$, the above can be written as what we have in part (iii) of the corollary.

The moments in (ii) and (iii) represent the a-th moment of $S_1^2S_2^2$ and S_1^2/S_2^2 respectively whenever a is a nonnegative integer. The above moments in (i) and (ii) are represented by Jacobi's Polynomials in the following corollary:

Corollary 5.2 Let the sample variances S_1^2 and S_2^2 have the joint pdf given by (3.1). Then for nonnegative integers a and b, $m>2$, and $-1<\rho<1$, we have the following:

$$(i)\ \mu'(a,b;\rho)=\frac{\sigma_1^{2a}\sigma_2^{2b}}{m^{a+b}}\ 2^{a+b}\left(m/2\right)_{\{b\}}(1-\rho^2)^{-a-b}\,a!P_a^{((m/2)-1,-a-b-(m/2))}(1-2\rho^2),$$

$$(ii)\ \mu'(a,a;\rho)=\frac{\left(\sigma_1^2\sigma_2^2\right)^a}{m^{2a}}\ 4^a\left(m/2\right)_{\{a\}}(1-\rho^2)^{-2a}\,a!P_a^{((m/2)-1,-2a-(m/2))}(1-2\rho^2).$$

Proof. Putting $a=n$, $\alpha+1+\beta+a=-b$, $\alpha+1=(m/2)$, $z=\rho^2$ in (2.5), we have

$${}_2F_1(-a,-b;(m/2);\rho^2)=\frac{a!}{\left(m/2\right)_{\{a\}}}P_a^{((m/2)-1,-a-b-(m/2))}(1-2\rho^2).$$

Then (i) and (ii) follows from Theorem 5.1.

The corrected product moments of the joint pdf of sample variances can also be calculated by $\mu(a,b;\rho)=E[(S_1^2-E(S_1^2))^a(S_2^2-E(S_2^2))^b]$ with the help of $\mu'(a,b;\rho)$. Then one can write out the covariance matrix of bivariate chi-square distribution by

$$Var\left(\frac{mS_1^2}{\sigma_1^2}\right)=2m,\ Var\left(S_1^2\right)=\frac{2\sigma_1^4}{m},\ Var\left(S_2^2\right)=\frac{2\sigma_2^4}{m},\ \text{and}\ \ Cov\left(S_1^2,S_2^2\right)=\frac{2\sigma_1^2\sigma_2^2\rho^2}{m},$$

which also clearly shows that the correlation between U and V is ρ^2.

If $\rho = 0$ in (3.1), $Cor(S_1^2, S_2^2) = \rho^2 = 0$, that is, if sample variances are uncorrelated, it can be checked that $f_2(s_1^2, s_2^2) = g_1(s_1^2)\, g_2(s_2^2)$. That is, the joint pdf in (3.1), is an example that exhibits that uncorrelation of S_1^2 and S_2^2 implies independence between them.

6. Shannon Entropy

The Shannon Entropy $H(f)$ for any bivariate density function $f(x_1, x_2)$ is defined by $H(f) = -E\left(\ln f(X_1, X_2)\right)$. For the bivariate normal distribution it is given by $H(f) = \ln(2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}) + 1$. In the following theorem we derive the Shannon entropy for the joint pdf of sample variances.

Theorem 6.1 Let the sample variances S_1^2 and S_2^2 have the joint pdf of in (3.1). Then the Shannon entropy $H(f)$ of the distribution is given by

$$-H(f) = (m-2)\left[\log 2 + \psi(m/2)\right] - \ln\left[2^m\ \Gamma^2(m/2)(1-\rho^2)^{m/2}\right] - \frac{m}{1-\rho^2} + E\left[\ln\ {}_0F_1\left(\frac{m}{2}; \frac{\rho^2 m^2 S_1^2 S_2^2}{\sigma_1^2\sigma_2^2(2-2\rho^2)^2}\right)\right], \tag{6.1}$$

where $\psi(z) = \dfrac{d}{dz}\ln\Gamma(z)$ is a digamma function.

Proof. From (3.1), the Shannon entropy $H(f) = -E\left(\ln f(S_1^2, S_2^2)\right)$ is given by

$$-H(f) = E\left[\ln \frac{(S_1^2 S_2^2)^{(m-2)/2}}{2^m\ \Gamma^2(m/2)(1-\rho^2)^{m/2}} - \frac{S_1^2 + S_2^2}{2-2\rho^2} + \ln\ {}_0F_1\left(\frac{m}{2}; \frac{\rho^2 S_1^2 S_2^2}{(2-2\rho^2)^2}\right)\right]$$

which simplifies to

$$-H(f) = \frac{m-2}{2}\left[E(\ln S_1^2) + E(\ln S_2^2)\right] - \ln\left[2^m\ \Gamma^2(m/2)(1-\rho^2)^{m/2}\right] - \frac{m}{1-\rho^2} + E\left[\ln\ {}_0F_1\left(\frac{m}{2}; \frac{\rho^2 S_1^2 S_2^2}{(2-2\rho^2)^2}\right)\right].$$

Since S_1^2 or S_2^2 has a chi-square distribution with m degrees of freedom, the theorem is then obvious by virtue of $E(S_1^2) = \dfrac{\sigma_1^2}{m}\left[\log 2 + \psi(m/2)\right]$ where $\psi(z)$ is the digamma function defined in the theorem.

7. Conclusion

We have derived some characteristics of joint distribution of variances which will have applications in the estimation of generalized variance and other inferential methods. It is also open to extend these results to any other bivariate distribution especially to scale mixture of bivariate normal distribution which includes bivariate t-distribution.

Acknowledgements The authors gratefully acknowledge the excellent research facility provided by King Fahd University of Petroleum & Minerals. In particular, the first author gratefully acknowledges the research support provided through the FT 2004-22 project.

References

1. Abramowitz, M. and Stegun, I. (1964). Handbook of Mathematical Functions, Dover Publications, New York.
2. Ahmed, S.E. (1992). Large sample pooling procedure for correlation. The Statistician, 41, 415-428.
3. Anderson, T.W. (2003). An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. John Wiley and Sons. New York.
4. Fisher, R.A. (1915). Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. Biometrika, 10, 507-521.
5. Gradshteyn, I.S. and Ryzhik, I.M. (1995). Table of Integrals, Series and Products, Academic Press.
6. Joarder, A.H. and Ahmed, S.E. (1996). Estimation of characteristic roots of scale matrix. Metrika, 44(3), 259 - 267.
7. Joarder, A.H. (2009). Moments of the product and ratio of two correlated chi-square random variables. Statistical Papers, 50(3), 581-592.
8. Joarder, A.H. and Abujiya, M.R. (2009). Standardized moments of bivariate chi-square distribution. Journal of Applied Statistical Science, 16(4), 1-9.
9. Johnson, N.L., Kotz, S. and Balakrishnan, N. (1994). Continuous Univariate Distributions (volume 1). John Wiley and Sons, New York.
10. Krishnaiah, P.R.; Hagis, P. and Steinberg, L. (1963). A note on the bivariate chi distribution. SIAM Review, 5, 140-144.

Appendix

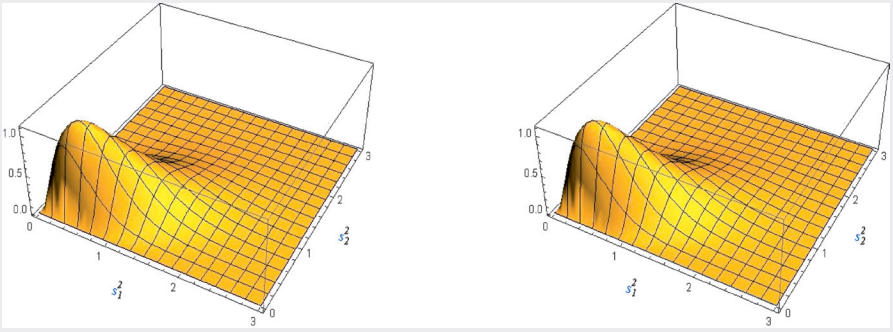

a) ρ = -0.8 b) ρ = 0.8

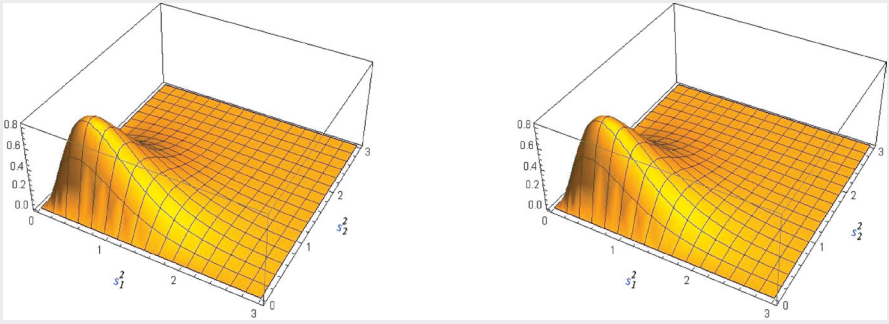

c) ρ = -0.5 d) ρ = 0.5

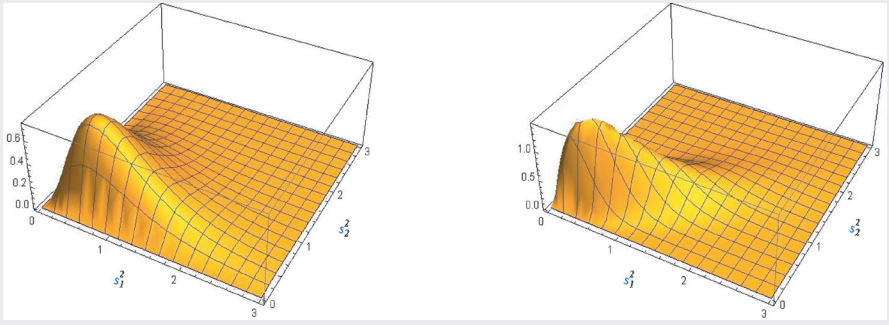

e) ρ = 0 f) ρ = 0.9

Figure 1. Joint Probability Density Function of Sample Variances for m = 5, σ_1 = 1, σ_2 = 0.9, and various ρ values

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 140-155

Study of Nanocrystallization Kinetics in $Fe_{73.5}Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ Finemet Type Alloy by Differential Thermal Analysis and Using Different Models

Pritish Kumar Roy and Dr. Shibendra Shekher Sikder

Pritish Kumar Roy
Associate Professor
Department of Physics
Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh
e-mail : pritish1974.phy@gmail.com

Dr. Shibendra Shekher Sikder
Professor, Department of Physics
Khulna University of
Engineering and Technology
(KUET), Bangladesh
e-mail : sssikder@phy.kuet.ac.bd

Abstract

The study of the crystallization processes in the FINEMET type nanocrystalline amorphous alloy is interesting not only from the fundamental aspect of establishing reaction mechanism of crystal nucleation and growth, but also from a technological point of view. The process and nature of crystallization phase constitution of nanocrystalline amorphous alloy of composition $Fe_{73.5}Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ prepared by rapid quenching method is investigated in the present study. The amorphous nature of the alloy has been verified by x-ray diffraction (XRD). The differential thermal analysis (DTA) experiments were performed at different continuous heating rates of 10, 20, 30, 40 and 50^0C/min. Two different crystalline phases are observed. The crystallization temperatures, the volume fraction of crystallizations and enthalpies of two different crystalline phases of the alloy have been determined from DTA traces. The dependence of on-set crystallization temperature (T_X) on the heating rate of different phases have been used for the determination of different crystallization parameters such as, the activation energy of crystallization, the order parameter or Avrami exponent (n). The results of crystallization were discussed on the basis of different models such as Kissinger's approach and modification for non-isothermal crystallization of Matusita in addition to Kolmogorov, Johnson, Mehl, Avrami and Ozawa.

Keywords

Amorphous, FINEMET, XRD, DTA, α-Fe(Si) phase, Fe_2B phase, Activation energy of crystallization, Avrami exponent.

1. Introduction

Traditionally, solid state physics has meant crystal physics. Solidity and crystallinity are considered as synonymous in text on condensed matter physics. Yet one of the most active fields of solid state research starts from the middle of the last century has been the study of solids that are not crystals, solids in which the arrangement of atoms lacks the slightest vestige of long range order. The advances that have been made in the physics and chemistry of these materials, which are known as amorphous solids or glasses, have been widely appreciated within research community.

Amorphous soft magnetic alloys are now well accepted and mature materials. At first the great interest in amorphous metals stems from the reports by Duwez et.al[1] on the preparation and properties of amorphous metallic alloys. Simpson and Brambley[2] appear to have been the first to point out that the amorphous alloys are expected to have no magnetocrystalline anisotropy and should have very low coercivity.

Nanocrystalline soft magnetic materials were first reported in 1988 by Yoshizawa, Oguma and Yamauchi[3]. Exploitation of this novel material in practical applications started shortly after the discovery and manufactured by Hitachi Co. Ltd. under the trade name FINEMET[4]. FINEMET is the first nanocrystalline soft magnetic material in the world developed by Hitachi Metals, Ltd. The precursor material of FINEMET is amorphous metal obtained by rapid quenching the molten metal, consisting of Fe, Si, B and small amounts of Cu and Nb. The originally proposed composition of the alloy was $Fe_{73.5}Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$. By applying proper heat treatment to the alloy at higher temperature (around 555^0C) than its crystallization temperature of the amorphous state, this alloy produces homogeneous, ultrafine nanocrystalline grain structure of α-Fe(Si) with bcc structure having grain diameter approximately 10 nanometer and gain unique soft magnetic properties[5]. Usually on crystallization of amorphous alloys much larger grains with diameter 0.1-1μm is obtained. The formation of this nanocrystalline structure is ascribed to the combined condition of Cu and Nb, which both are not soluble in α-Fe. Hereby Cu is thought to increase the nucleation of α-Fe grains, whereas Nb lowers its growth rate[6]. FINEMET has high saturation magnetic flux density (more than 1T) comparable to Fe-based metal and high permeability (10000 at 100kHz) comparable to Co-based amorphous metal. It has the advantages of both Fe-based and Co-based amorphous metals. Researchers are working on nanocrystalline soft magnetic

alloys since last around five decades. The interest has been growing day by day in the synthesis and characterization of FINEMET type nanocrystalline amorphous alloys due to their excellent performance in electromagnetic noise suppression and contribution to energy saving. It allows reduction in size and weight of electric and electronic devices. Magnetically soft materials are needed for the applications of magnetic devices such as transformer, inductive devices, biomedical applications, space applications and many more other applications. Nowadays, researchers are thinking that by using the nanoscience and technology, it is possible to solve many unsolved real life problems such as the fatal diseases like cancer.

FINEMET is obtained by the proper heat treatment to the amorphous state of the nanocrystalline alloy. So, study of crystallization kinetics and behavior of this type of fine metal (FINEMET) is fundamentally important. Differential thermal analysis (DTA) is a direct and effective technique for analyzing the crystallization kinetics and stability of the crystalline phase with respect to the crystallization process. In this technique structural change occurs in the material under heat treatment. These changes may be due to melting, solidification, dehydration, phase transition from glass to solid, transition from one crystalline variety to another, destruction of crystalline lattice, oxidation, decomposition etc. Differential thermal analysis (DTA) has been widely used in scientific and engineering fields to study clays, soaps, polymers and various other organic and inorganic materials those, may be solid or liquid. The DTA technique was first suggested by H. Le Chatelier[7] in 1887 and was applied to the study of clays and ceramics. The objectives of these DTA studies, generally speaking, included two aspects: identifying the characteristic temperature and nature of phase transformations of the alloy studied, and determining the effect of chemical composition and processing on phase transformation behavior in the alloy.

2. Experimental

Glassy alloy $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ is prepared by melt spinning technique. The melt spinning facilities were used at the Centre for Materials Science, National University of Hanoi, Vietnam. Melt spinning is a widely used production method for rapidly solidifying materials as well as preparing amorphous metallic ribbons. Amorphous ribbons with the composition $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ were prepared in an arc furnace on a water-cooled copper hearth under an atmosphere of pure Argon (Ar). High purity

(99.9%) source materials were obtained from Johnson Matthey (Alfa Aesar Inc.).

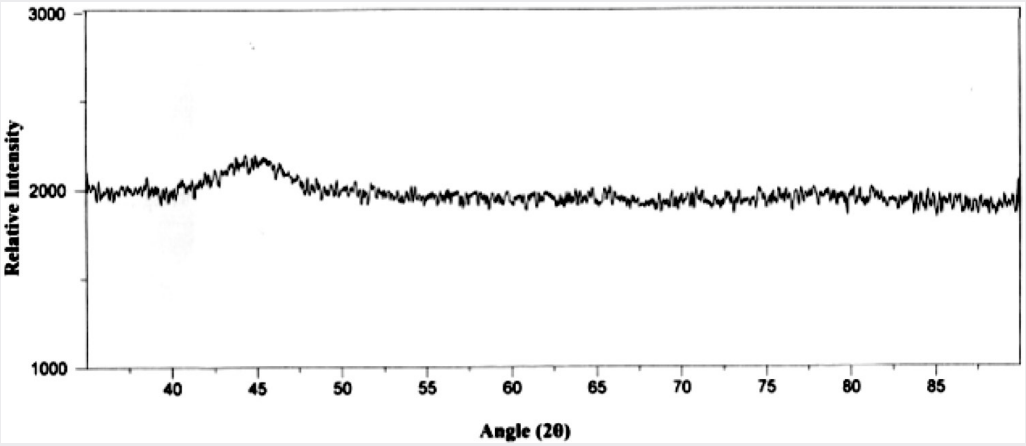

Fig. 1 XRD pattern of nanocrystalline amorphous $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ alloy at room temperature.

A Philips Model PW 3040 X' Pert PRO XRD system was employed for studying the structure of the material. The copper target was used as a source of X-rays with λ = 1.5406 Å (Cu-K_α). The scanning angle was in the range of 30^0- 90^0. Fig. 1 shows the X-ray diffraction pattern of $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ nanocrystalline amorphous ribbon at room temperature. The absence of any sharp structural peak confirms the amorphous nature of the sample.

Differential Thermal Analyzer (DTA) Shimadzu model TG/TDTA 6300 was used to measure the thermal manifestation of the phase transformation and to study the crystallization kinetics under non-isothermal condition. The DTA runs have been taken at five different heating rates i.e. 10, 20, 30, 40 and 50^0C/min on accurately weighed samples taken in aluminum pan. The temperature range covered in DTA was from room temperature to 800^0C.

3. Results and Discussion

In Fig. 2 DTA trace of as-cast nanocrystalline amorphous $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ ribbon sample recorded in a nitrogen atmosphere with a heating rate of 10^0C/min has been presented.

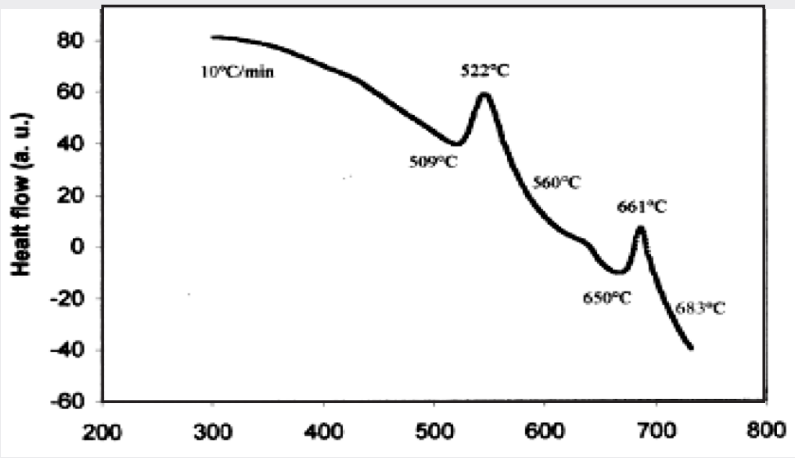

Fig. 2 DTA trace of as-cast nanocrystalline amorphous $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ alloy.

There are clearly two separated exothermal peaks at T_{p1}=522^{0}C and T_{p2}=661^{0}C on DTA curve, ascribed to the precipitation of bcc-Fe(Si) and boride (FeB/Fe_2B) phase, respectively. Fig. 3 represents the DTA traces of as-cast nanocrystalline amorphous $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ alloy from room temperature to 800^{o}C with heating rates of 10-50^{o}C/min at the step of 10^{o}C. In each DTA curve, two exothermic peaks are distinctly observed; corresponding to two different crystallization events initiated at temperature T_{x1} and T_{x2} respectively.

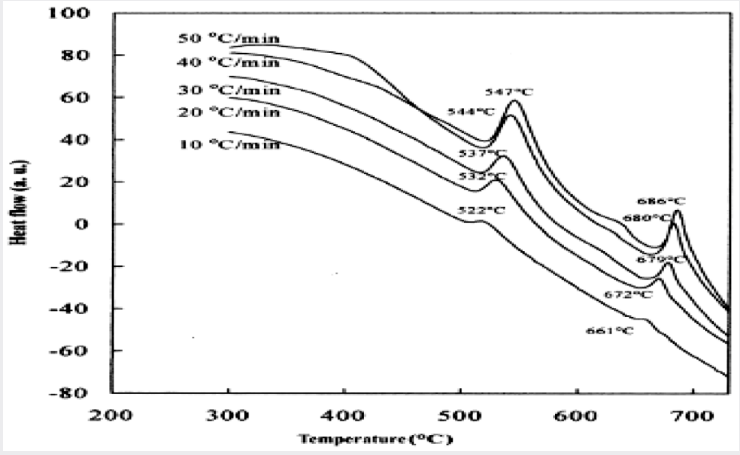

Fig. 3 Effects of heating rate on DTA trace of as-cast nanocrystalline amorphous $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ alloy.

The on-set crystallization temperature T_x has been defined as temperature corresponding to the intersection of two linear portion adjoining the transition elbow of the DTA trace in the exothermic direction. The value of on-set crystallization temperatures (T_{x1} and T_{x2}), crystallization peak temperatures (T_{p1} and T_{p2}) and crystallization ending or completion temperatures (T_{e1} and T_{e2}) at different heating rates for the alloy is given in Table-1.

Table-1 Effects of heating rate on 1st and 2nd crystallization states of the nanocrystalline $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ amorphous alloy.

Heating rate (β) in °C/min	1st crystallization state				2nd crystallization state				$(T_{p2}-T_{p1})$ in °C
	Onset temp. (T_{x1}) in °C	Peak temp. (T_{p1}) in °C	Ending temp. (T_{e1}) in °C	Temp. range ($T_{e1}-T_{x1}$) in °C	Onset temp. (T_{x2}) in °C	Peak temp (T_{p2}) in °C	Ending temp. (T_{e2}) in °C	Temp. range ($T_{e2}-T_{x2}$) in °C	
10	509	522	560	51	650	661	683	33	139
20	516	532	574	58	657	672	696	39	140
30	518	537	578	60	661	679	707	46	142
40	520	544	587	67	665	680	709	44	136
50	522	547	600	78	668	686	713	45	139

Fig. 3 reveals that the crystallization of each phase occurs over a wide range of temperatures and this temperature range increases with the increase of heating rate for the1st crystallization state, but a little anomaly is seen in the 2nd crystallization state. From Table-1 the crystallization temperature range for the 1st crystallization state is 51 to 78°C and for the 2nd crystallization state is 33 to 46°C. Crystallization temperature range for the 1st crystallization state is always greater than the 2nd crystallization state. The DTA curves in Fig. 3 show sharp peaks at 522-547°C for the 1st crystallization state depending on the heating rate from 10°C/min to 50°C/min, which is lower than that for original FINEMET 540-572°C respectively[8] and the replacement of 1% Fe by Cr of the original FINEMET 542-569°C respectively[9]. Fig. 3 also reveals that the peak temperature shifts to higher values with the increase of heating rate. In other word, more heat energy is required for the formation of crystalline phases with increasing heating rates. Table-1 also shows that the two crystallization events are separated by a large temperature gap of ~140°C. For FINEMET without Cr i.e. for pure FINEMET the temperature difference between two events was found ~150°C[10]. The large separation between two crystallization events is one of the characteristic features of the FINEMET type alloys, which exhibit easy nanocrystallization[11]. From Fig. 3 we can also see that

the peaks of 2nd crystallization state exhibited with high sharpness than the peaks of 1st crystallization state relating to strong crystallization of boride phase. These results are fully agreed with those reported in the work of C. Gomez-Polo et.al [12].

The crystallization volume fraction (α) at any temperature T is given as $\alpha = A_T/A$, where, A is the total area of exothermic peak between the on-set crystallization temperature T_x, where crystallization just begins and the temperature T_e where the crystallization peaks end i.e. crystallization is completed. A_T is the partial area of exothermic peak between the temperature T_x and T_e. The temperature T is selected between T_x and T_e.

The calculated values of volume fraction of crystallization at different heating rates for the alloy under study are listed in the Table-2.

Table -2 Effects of heating rate on crystallization volume fraction of 1st and 2nd crystallization states of the nanocrystalline $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ amorphous alloy.

Heating rate (β) in ^{0}C/min	1st crystallization state			2nd crystallization state		
	Total peak area(A) in mm^2	Partial peak area(A_T) in mm^2	Crystallization volume fraction(α)	Total peak area(A) in mm^2	Partial peak area(A_T) in mm^2	Crystallization volume fraction(α)
10	9.53	2.55	0.27	5.66	1.26	0.22
20	16.98	5.48	0.32	8.90	3.12	0.35
30	15.92	6.01	0.34	13.80	5.19	0.38
40	23.86	10.62	0.45	18.05	8.79	0.49
50	41.38	20.55	0.50	21.98	11.8	0.54

Table-2 along with the Fig. 3 shows that the total peak area increases with the increase of heating rate for both the crystallization states and for each of the DTA trace, the area under the first crystallization peak is larger than the area covered by the second crystallization peak. Table-2 also shows that, the crystallization volume fraction (α) increases with the increase of heating rate for both the crystallization states. The dependence of on-set crystallization temperature (T_x) on the heating rate (β) is given by the empirical relation that has been suggested by Lasocka[13] and has the form:

$$T_x = B_x \ln \beta + A_x \quad (1)$$

Where, A_x and B_x are constants. The plots of ln(β) vs T_x for the 1st and 2nd crystallization states of the alloy is shown in Fig. 4(a) and Fig. 4(b).

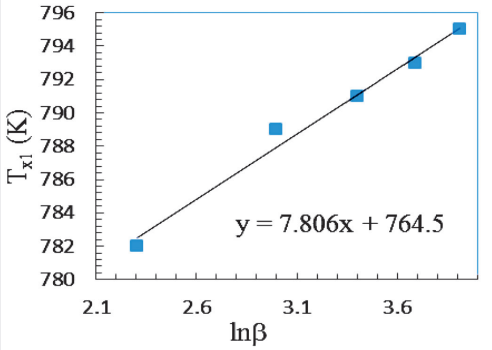

Fig. 4(a) Plot of T_{x1} [K] as a function of lnβ for α-Fe(Si) phase of $Fe_{71.5}Cr_2Nb_3Cu_1Si_{13.5}B_9$ alloy.

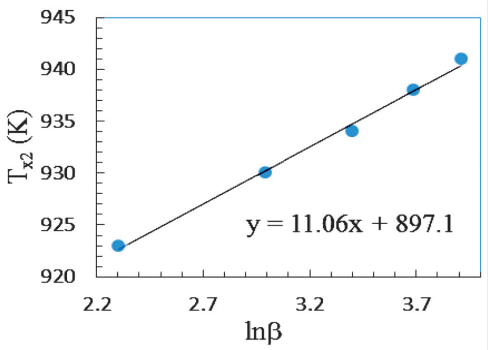

Fig. 4(b) Plot of T_{x2} [K] as a function of lnβ for Fe_2B phase of $Fe_{71.5}Cr_2Nb_3Cu_1Si_{13.5}B_9$ alloy.

The straight lines show the good validity of this relationship for the alloy. The calculated values of A_x =764.5K=491.5°C, B_x=7.81min for the 1st crystallization state and A_x =897.1K=624.1°C, B_x=11.06 min for the 2nd crystallization state. A_x values depict the crystallization temperature at a heating rate of 1^0C/min while B_x values are proportional to the time taken by the system to reduce its crystallization temperature when its heating rate is lowered from 10^0C/min to 1^0C/min.

The kinetics of isothermal crystallization involving nucleation and growth is usually analyzed using the Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami (KJMA) model[14, 15]. According to this model, the volume fraction of crystallites ((0<α<1)) is given by[16-18]:

$$\alpha(t) = 1 - \exp\{-(kt)^n\} \quad (2)$$

where, α(t) is the volume fraction crystallized after time t, n is the Avrami exponent that is associated with the nucleation and growth mechanisms and k is the effective overall reaction rate, which actually reflects the rate of crystallization in thermally activated process and usually assigned Arrhenian temperature dependence,

$$k = k_0 \exp(-E_c/RT) \quad (3)$$

Where, E_c is the activation energy of crystallization, k_0 is the pre-exponential factor or frequency factor, which indicates the number attempts made by nuclei to overcome the energy barrier during crystallization and R is the gas constant. In the framework of KJMA model, the kinetic parameters n, k_0 and E_c are assumed to be constant during the crystallization process.

In non-isothermal crystallization, the existence of a constant heating rate condition is assumed. The relation between the sample temperature and the heating rate can be written as

$$T = T_0 + \beta t \tag{4}$$

Where, T_0 is the initial temperature and β is the heating rate. As the temperature constantly changes with time, k is no longer a constant but varies with time in a more complicated form and Eq. (2) becomes

$$\alpha\,(t) = 1 - \exp\,[-\{k\,(T-T_0)/\beta\}^n] \tag{5}$$

After rearranging and taking logarithms of Eq. (5), Ozawa[19, 20] obtained

$$\ln\,\{-\ln\,(1-\alpha)\} = n\ln k\,(T-T_0) - n\ln\beta \tag{6}$$

According to Eq. (6), a plot of $\ln\{-\ln(1-\alpha)\}$ versus $\ln\beta$ yield a straight line with slope equal to n.

Fig. 5(a) and Fig. 5(b) show the variation of $\ln\{-\ln(1-\alpha)\}$ against $\ln\beta$ for the nanocrystalline $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ amorphous alloy. The value of n for the α-Fe(Si) crystalline phase is 0.60~1 and for the Fe_2B crystalline phase is 0.69~1.

It is well known that crystallization of nanocrystalline amorphous alloy is associated with nucleation and growth processes and the extent of crystallization increases with an increase in temperature. Due to these order parameter (n) changes. Since for the sample prepared by melt quenching technique, the value of n may be 4, 3, 2 or 1, which can be

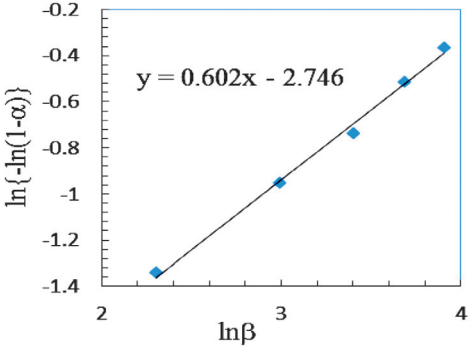

Fig. 5(a) Plot of $\ln\{-\ln(1-\alpha)\}$ as a function of $\ln\beta$ for the α-Fe(Si) phase of the $Fe_{71.5}Cr_2Nb_3Cu_1Si_{13.5}B_9$ alloy.

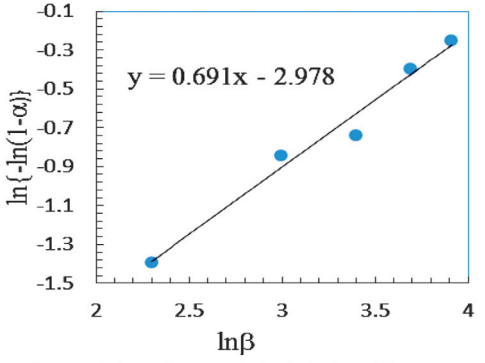

Fig. 5(b) Plot of $\ln\{-\ln(1-\alpha)\}$ as a function of $\ln\beta$ for the Fe_2B phase of the $Fe_{71.5}Cr_2Nb_3Cu_1Si_{13.5}B_9$ alloy.

related to different crystallization mechanism; n=4 represents volume nucleation, three dimensional growth; n=3 represents volume nucleation, two dimensional growth; n=2 represents volume nucleation, one dimensional growth; n=1 represents surface, one dimensional growth from surface to inside[21]. In our present system of nanocrystalline $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ amorphous alloy, the value of n is equal to 1 for both the crystalline phase, which represents surface, one dimensional growth from surface to inside.

The interpretation of the experimental crystallization data is given on the basis of Kissinger's, modified Ozawa's and Matusita's equations for non-isothermal crystallization. The activation energy (E_c) for crystallization can therefore be calculated by using Kissinger's equation[22],

$$\ln (\beta/T_p^2) = - E_c / RT_p + C \qquad (7)$$

Where, C is a constant.

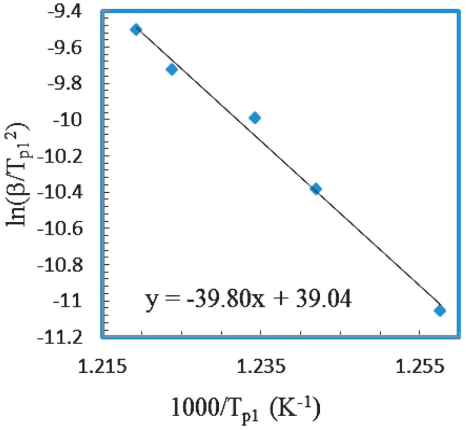

Fig. 6(a) Plot of $\ln(\beta/T_{p1}^2)$ as a function of $1000/T_{p1}$ $[K^{-1}]$ for the α-Fe(Si) phase of the $Fe_{71.5}Cr_2Nb_3Cu_1Si_{13.5}B_9$ alloy.

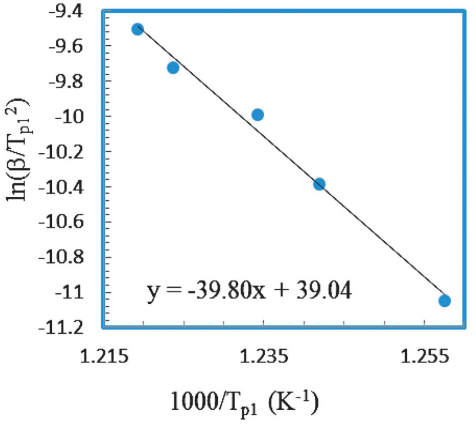

Fig. 6(b) Plot of $\ln(\beta/T_{p2}^2)$ as a function of $1000/T_{p2}$ $[K^{-1}]$ for the Fe_2B phase of the $Fe_{71.5}Cr_2Nb_3Cu_1Si_{13.5}B_9$ alloy.

The plots of $\ln(\beta/T_p^2)$ versus $1000/T_p$ for nanocrystalline $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ amorphous alloy are shown in Fig. 6(a) and Fig. 6(b), which come to be straight lines. The value of E_c may be calculated from the slope of each line and it is found for the α-Fe(Si) crystalline phase is 3.43eV and for the Fe_2B crystalline phase is 4.92eV.

The activation energy of crystallization can be obtained from the variation of the crystallization peak temperature with heating rate by using Ozawa's[20] relation as :

$$\ln \beta = E_c / RT_p + D \qquad (8)$$

Where, D is a constant.

Fig. 7(a) and Fig. 7(b) show lnβ versus $1000/T_p$ dependences for the alloy under study, which come to be linear. The value of E_c is calculated from the slope of each line and it is found for the α-Fe(Si) crystalline phase is 3.57eV and for the Fe_2B crystalline phase is 5.08eV.

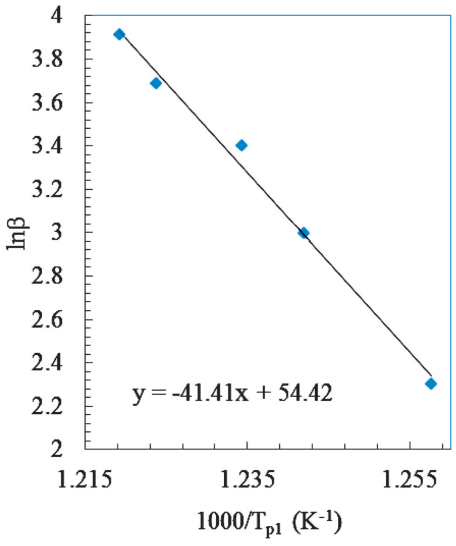

Fig. 7(a) Plot of lnβ as a function of $1000/T_{p1}$ $[K^{-1}]$ for the α-Fe(Si) phase of the $Fe_{71.5}Cr_2Nb_3Cu_1Si_{13.5}B_9$ alloy.

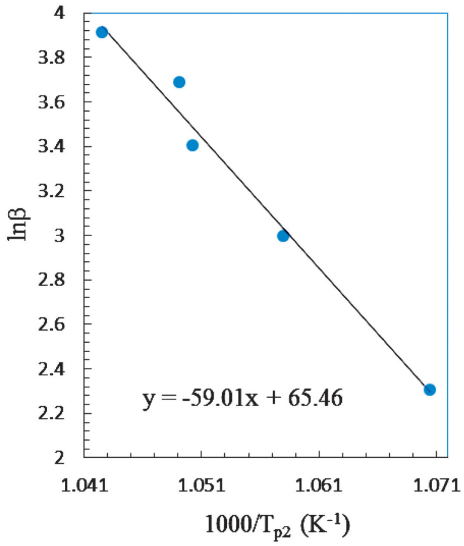

Fig. 7(b) Plot of lnβ as a function of $1000/T_{p2}$ $[K^{-1}]$ for the Fe_2B phase of the $Fe_{71.5}Cr_2Nb_3Cu_1Si_{13.5}B_9$ alloy.

The activation energy of crystallization can also be obtained from the variation of crystallization volume fraction (α) and the crystallization peak temperature with constant heating rates by using Matusita's[23] relation as:

$$\ln \{-\ln(1-\alpha)\} = -n \ln\beta - 1.052mEc / RT_p + \text{constant}$$

$$-[\ln \{-\ln(1-\alpha)\} + n \ln\beta] = 1.052mEc / RT_p - \text{constant} \qquad (9)$$

Where, m and n are integer or half integer numbers that depend on the growth mechanism and the dimensionality of the crystal. Usually it is considered m=1, 2 or 3 for one, two, or three dimensional growth of the crystal[24].

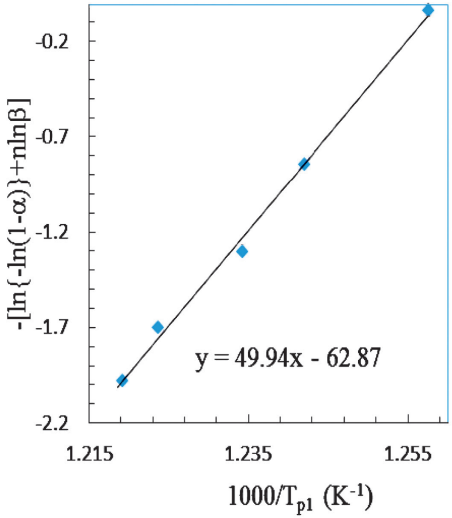

Fig. 8(a) Plot of -[ln-{ln(1-α)}+lnβ] as a function of $1000/T_{p1}$ [K^{-1}] for the α-Fe(Si) phase of the $Fe_{71.5}Cr_2Nb_3Cu_1Si_{13.5}B_9$ alloy.

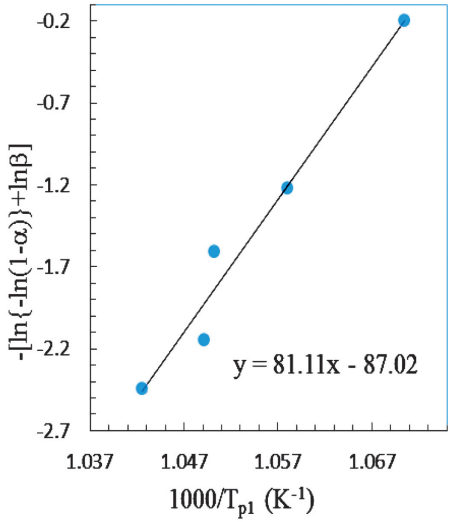

Fig. 8(b) Plot of -[ln-{ln(1-α)}+lnβ] as a function of $1000/T_{p2}$ [K^{-1}] for the Fe_2B phase of the $Fe_{71.5}Cr_2Nb_3Cu_1Si_{13.5}B_9$ alloy.

Fig. 8(a) and Fig. 8(b) show -[ln{-ln(1-α)}+ n lnβ] versus $1000/T_p$ dependences for the alloy under study, which come to be linear. The value of E_c is calculated from the slope of each line and it is found for the α-Fe(Si) crystalline phase is 4.09eV and for the Fe_2B crystalline phase is 6.65eV.

The values of the activation energy calculated from Eq. (8)[20] are slightly higher than the values of activation energy calculated from Eq. (7)[22]. So it can be considered Eq. (7) and Eq. (8) are in good agreement with each other. But, the value of the activation energy calculated from Eq. (9)[23] is a little bit higher.

The activation energy of the original FINEMET, the replacement of 1% Fe by Cr of the original FINEMET and the replacement of 2% Fe by Cr of the original FINEMET is listed in Table-3

Table-3 Activation energies of original FINEMET and modified FINEMET alloys.

FINEMET and modified FINEMET type alloys	Activation energy of 1st crystallization phase in eV	Activation energy of 2nd crystallization phase in eV	Model used for calculating activation energy of crystallization phases
$Fe_{73.5}Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$	3.25[8]	-----	Kissinger's model
$Fe_{72.5}Cr_1Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$	3.26[9]	4.87[9]	Kissinger's model
$Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$	3.43 (present work)	4.92 (present work)	Kissinger's model
$Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$	3.57 (present work)	5.08 (present work)	Ozawa's model
$Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$	4.09 (present work)	6.65 (present work)	Matusita's model

The activation energy for formation of 1st crystallization α-Fe(Si) phase of the original FINEMET is 3.25eV[8, 22]. The activation energy of 1st crystallization phase of modified FINEMET type alloy $Fe_{72.5}Cr_1Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ (replacement of 1% Fe by Cr of the original FINEMET) is 3.26eV[9, 22], which is approximately similar to that of original FINEMET. But the activation energy of crystallization phases of modified FINEMET type alloy $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ (replacement of 2% Fe by Cr of the original FINEMET) is 3.43eV[22], which is slightly higher than the previously observed tendency. It is also noticed that the activation energy for first crystallization phase is lower than the second crystallization phase. This is because, at the early stage of crystallization, a formation of Cu clusters leads to low activation energy for preferential nucleation however, with the increase of crystallized volume fraction, the Cu-rich regions gradually run out[25].

Measuring the total area under the exothermic peak, the experimental determination of crystallization enthalpy released ΔH_c during crystallization process is evaluated by using the formula:

$$\Delta H_c = KA / M \qquad (10)$$

Where, K is the constant of the instrument used, M is the mass of the sample and A is the area under the crystallization peak. Mass of the sample M was taken constant trough out the DTA experiment. So, from Eq. (10) it shows that, crystallization enthalpy released ΔH_c is directly proportional to the area under the crystallization peak. The value of ΔH_c i.e. the area under the crystallization peak for nanocrystalline $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ amorphous alloy at different heating rates are shown in Table-2. From Table-2 it is seen that, enthalpy released for both the crystalline states increases with the increase of heating rate and the enthalpy released in 1st crystallization phase is higher than the

enthalpy released for 2nd crystallization phase. The release of enthalpy is related to the metastability of the crystalline phases and the least stable crystalline states are supposed to have maximum ΔH_c [21]. From the enthalpy consideration the 1st crystallization phase is less stable than the 2nd crystallization phase and both the phases have higher stability at the lower heating rate of the alloy under study.

4. Conclusions

Non-isothermal DTA measurements have been performed from room temperature to 800^0C at several heating rates in order to study the kinetics of the nanocrystallization process of the $Fe_{71.5}Cr_2Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ amorphous alloy. Replacement of 2% Fe by Cr of the original FINEMET was observed to decrease heating rate dependence crystallization (on-set or peak) temperature with respect to the original FINEMET and the FINEMET with the replacement of 1% Fe by Cr. Cr additions also narrowing the interval between crystallization (on-set or peak) temperatures of the observed crystallization states. A temperature interval of ~140°C between the two crystallization events is measured. This temperature gap is an indication of the enhancement of stability of α-Fe(Si) phase against detrimental Fe_2B phase due to a slight substitution of Cr in place of Fe. The nanocrystallization kinetics is described using the Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami (KJMA) approach and values close to 1 were found for the Avrami exponent (n) for both the crystallization states of the alloy. The n values close to 1 are related to an increase of a diffusion barrier, suggesting a controlled diffusion process with a nucleation rate close to zero. The interpretation of the experimental crystallization data is given on the basis of M. Lasocka's, Kissinger's, modified Ozawa's and Matusita's equations. By employing Kissinger's, Ozawa's and Matusita's methods, the activation energy of crystallization (E_c) determined from the heating rate dependence of crystallization temperature. The activation energy of the primary crystallization of α-Fe(Si) phase is found to be 3.43eV(Kissinger), 3.57eV(Ozawa) and 4.09eV(Matusita). The results obtained from Kissinger's and Ozawa's models are very close to each other and compatible with the previous works which indicates that these two models are in good agreement with each other. The result obtained from Matusita's equation is a little bit higher. The activation energy is found to be increased with the increase of replacement amount of Fe by Cr. The results of crystallization kinetics indicate that the degree of crystallization fits well with the theory of Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami (KJMA), Kissinger and Ozawa.

Acknowledgements

The authors are indebted to Centre for Materials Science, National University of Hanoi, Vietnam for sample supplies. The authors are also highly grateful to Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR) and Atomic Energy Centre, Dhaka (AECD) for giving their experimental facilities. The first author specially grateful to all the teachers, colleagues and staffs of Department of Physics, Khulna University of Engineering and Technology (KUET) and Department of Physics, Government Brajalal College, Khulna for their vital support and inspiration.

References

[1] Pol Duwez, R. H. Willens and W. Klement jr, Continuous Series of Metastable Solid Solutions in Silver-Copper Alloys, *Journal of Applied Physics, 31*, 1960, p. 1136.

[2] A. W. Simpson and D. R. Brambley, The Magnetic and Structural Properties of Bulk Amorphous and Crystalline Co-P Alloys, *Physica Status Solidi (b) Vol. 43*, *Issue 1*, 1971, p. 291-300.

[3] Y. Yoshizawa, S. Oguma and K. Yamauchi, New Fe-based soft magnetic alloys composed of ultra-fine grain structure, *J. Appl. Phys. 64*, 1988, p. 6044-6046.

[4] Y. Yoshizawa & K. Yamauchi, Effects of Magnetic Field Annealing on Magnetic Properties in Ultrafine Crystalline Fe-Cu-Nb-Si-B Alloys, *IEEE Trans. Magnetics. 25*, 1989, p. 3324.

[5] Hitachi Metals, Ltd., http://www. Hitachi-metals.co.jp

[6] G. Herzer, Grain Structure and Magnetism of Nanocrystalline Ferromagnets, *IEEE Trans. Magnetics, MAG- 25*, 1989, p. 3327- 3328.

[7] H. Le Chatelier, The Constitution of Clay, *Z. Physik. Chem. I*, 1887, p. 396.

[8] Chau N, Hoa NQ, Luong NH., The crystallization in Finemet with Cu substituted by Ag, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 290–291*, 2005, p. 1547–1550.

[9] Shihab MT, Reza MA, Shil SK, Tawhid MM, Sikder SS and Gafur MA, Study of crystallization phases and magnetic properties of nanocrystalline $Fe_{73.5}Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ alloy prepared by rapid quenching method, *Material Science & Engineering International Journal, Vol. 4, Issue 2*, 2020, p. 37- 43.

[10] Leu MS, Chin TS. Crystallization behavior and temperature dependence of the initial permeability of FeCuNbSiB alloy, *J Appl. Phys. 81*, 1997, p. 4051- 4053.

[11] G. Pozo López, L. M. Fabietti, A. M. Condó and S. E. Urreta, Microstructure and soft magnetic properties of Finemet-type ribbons obtained by twin-roller melt-spinning.

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 322, *Issue 20*, 2010, p. 3088-3093.

[12] C. Gomez-Polo, J.I. Perez-Landazabal, V. Recarte, *IEEE Transactions of Magnetics, Vol. 39*, *issue: 5*, 2003, p. 3019-3024.

[13] Maria Lasocka, The effect of scanning rate on glass transition temperature of splat-cooled $Te_{85}Ge_{15}$, *Materials Science and Engineering, Vol. 23*, *Issues: 2-3*, 1976, p. 173-177.

[14] A.N. Kolmogorov, Statistical theory of Nucleation processes, *Bull. Acad. Sci. U.S.S.R., Phys. Ser. 3*, 1937, p. 555.

[15] W. A. Johnson, R. F. Mehl, Reaction kinetics in processes of nucleation and growth, *Trans. Am. Inst. Min. Metall. Eng. 135,* 1939, p. 416-443.

[16] M. Avrami, Kinetics of phase change. I General theory, *Journal of Chemical Physics, Vol. 7*, *No. 12*, 1939, p. 1103-1113.

[17] M. Avrami, Kinetics of phase change II Transformation –time relations for random distribution of nuclei, *Journal of Chemical Physics, Vol. 8*, 1940, p. 212-224.

[18] M. Avrami, Kinetics of phase change III Granulation, phase change and microstructure, *Journal of Chemical Physics, Vol. 9*, 1941, p. 177-184.

[19] T. Ozawa, Kinetics of non-isothermal crystallization, *Polymer, vol. 12*, *Issue 3*, March 1971, p. 150-158.

[20] T. Ozawa, A New Method of Analyzing Thermogravimetric Data, *Bulletin of the chemical Society of Japan, 38*, 1965, p. 1881-1886.

[21] Z. H. Khan, S. A. Khan and M. A. Alvi, Study of Glass Transition and Crystallization Behavior in $Ga_{15}Se_{85-x}Pb_x$ ($0 \leq x \leq 6$) Chalcogenide Glasses, *ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 123*, *No. 1,* 2013, p. 80-86.

[22] H. E. Kissinger, Reaction Kinetics in Differential Thermal Analysis, *Analytical Chemistry, Vol. 29*, *No. 11,* 1957, p. 1702-1706.

[23] K. Matusita, T. Konatsu, R. Yokota, Kinetics of non-isothermal crystallization process and activation energy for crystal growth in amorphous materials, *Journal of Material Science, vol. 19*, *No. 1*, 1984, p. 291-296.

[24] Praveen K. Jain, Deepika, K.S. Rathore, Nidhi Jain and N.S. Saxena, Activation Energy of Crystallization and Enthalpy Released of $Se_{90}In_{10-x}Sb_x$ (x=0, 2, 4, 6, 8, 10) Chalcogenide glasses. *Chalcogenide letters, Vol. 6, No. 3*, 2009, p. 97-107.

[25] T. Liu, N. Chen, Z. X. Xu, and R. Z. Ma, The amorphous-to-nanocrystalline transformation in $Fe_{73.5}Cu_1Nb_3Si_{13.5}B_9$ studied by thermogravimetry analysis, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 152, Issue 3,* 1996, p. 359-364.

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 156-171

The Possibility of Participating Honour's Level Students in Insurance Sector as a Part of Financial Inclusion : A Practical Study

Sonjit Shingha

Abstract

The article aims at doing a feasibility study on students of three educational institutions to include them in insurance sectors as a part of financial inclusion. 15 students from Khulna university, Govt. Brajalal college and Azam Khan Govt. Commerce College, Khulna are taken as sample. The study shows that insurance policies are very rear among the students. Even many students don't have any idea about insurance. At present, there are no insurance policy of the students in two institutions. The students are afraid of making insurance policy because they don't have enough knowledge about insurance. On the other hand the the insurance compamies don't pay the claim timely. The fraudulence of the insurance agents and unavilability of the service in the colleges and universities are other reasons of their fear. Most of the students are interested in making policy mainly they want to make student related policy. If the company becomes interested to include the students in this sectors then this sectors will be a emerging sectors and that will help our economic development.

Sonjit Shingha
Assistant Professor
(Finance and Banking)
Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh
e-mail : sonjitdu@gmail.com

Keywords

Inclusion, Participation, Nationalization, Amend, Agent

Background of the Study

Bangladesh has a large economic system that has been made up of by different financial sectors. Insurance sector plays a vital role in this regard. Insurance sector has a great impact on the financial system in our country. At present there are 83 insurance

companies in our country. Among them 36 are life insurance and 47 are general insurance companies. There are two state owned insurance companies. One is Jobon Bima Corporation and the other is Sadaron Bima Corporation. Actually the private insurance companies are now the market leader of this sector. Government launched a programme named financial inclusion that means to include all classes of people in the financial sectors. In that case Insurance companies have some liabilities. There are about 30 lac students in our countries who are studying different universities and colleges. Most of them are out of financial sector even they have little or no knowledge about the financial sector especially insurance sectors. If insurance companies can motivate or provide various knowledge about the insurance, they will be interested to participate in the insurance sector. In the report, we will observe whether the students are interested or not to include themselves the insurance sectors.

Objectives of the Study

The article has been made to show the possibility of students of honours level to participate in insurance sector as a part of financial inclusion. The article will reveal the practical feasibility study of introducing insurance policy among the students of honours level because the data will be collected directly from the students of different universities or honours level colleges. The main objectives of this article are:

- To make out the knowledge of insurance of the honours level students.
- To explore the ways of motivating them to make a policy.
- To explore the sources of fund for making policy.
- To find out the possibility of including the students in the insurance sector.

Methodology

The article has been written on the primary data. Data have collected directly from the students of Khulna university, Government Brajalal College, Khulna, and Azam Khan Government Commerce college, Khulna through questionnaire. Random sampling method has been applied in this case. Both qualitative, quantitative and graphical method have been used to prepare the article. Totally 12 questions are prepared to collect data from the students of Khulna university, Government Brajalal College, Khulna and Azam Khan Government Commerce college, Khulna. Total 15 students from

Khulna university, Government Brajalal College, Khulna and Azam Khan Government Commerce college, Khulna have been taken as sample. Theoretical, numerical and graphical method has been applied.

1.4 Scope of the Study

This article provides some valuable evaluations, present scenario and the interest of the students to participate in financial inclusion through insurance that have been collected from the three famous educational institutions. Here some points are given below:

- Present knowledge of insurance among the students .
- Reasons why they are apart from the insurance.
- The possible ways of motivating them to make policy.
- % probability of including them in the insurance sector.
- Finding out the possible ways of including the students in Insurance sectors.

1.5 Limitations of the Study

To prepare an authentic report through primary data is not an easy task. While preparing the report, many limitations have been encountered. Achieving practical experience in a short duration is not an easy task for preparing the paper. In preparing this thesis paper, some problems & limitations have encountered, which are as follows:

- ❖ In many cases, interviewing the students was very difficult.
- ❖ Large scale analysis was not possible due to time constraints & restrictions.
- ❖ Data insufficiency is the main constraint in the development of the paper.
- ❖ Time constraints are another important limitation of the thesis paper.
- ❖ This paper did not include the whole financial position of insurance market in Bangladesh, actually more focused on inclusion of honours level students in insurance sector in Bangladesh and its possibility.

Research Gap

Most of the authors studied on the insurance market in Bangladesh and they tried to analyze the insurance policies for the adults people. But there are very few works on the inclusion of students in the insurance sectors. For this reason I have tried to work on the inclusion of students in the insurance sectors.

Research Design

Goal of the paper: The main goal of my work is to find possibilities of including the honours level students in insurance sector in Bangladesh and provide some recommendation regarding this.

Data collection: Primary data has been used to complete the paper. Data have collected directly from the students of Khulna university, Government Brajalal College, Khulna, and Azam Khan Government Commerce college, Khulna through questionnaire. Totally 12 questions are prepared to collect data from the students of those institutions. Total 15 students from Khulna university, Government Brajalal College, Khulna and Azam Khan Government Commerce college, Khulna are taken as sample.

Analysis of the research: The research has been analyzed on the qualitative, quantitative and graphical analysis.

History of insurance in Bangladesh

After our independence in 1971, Bangladesh Insurance (Nationalization) order-1972 was imposed and two nationalized insurance companies were set up, one is Sadharon Bima Corporation and another is Jibon Bima Corporation. on 14 may 1973 a restructuring was made under the insurance corporation act 1973. In 1973, general insurance business became the sole responsibility of sadharan Bima corporation and life insurance business was carried out by Jibon Bima corporation, American Life Insurance Company and Postal Life Insurance Department until 1994. After amending the insurance company act of 1973, private sector insurance companies were permitted to establish in Bangladesh in 1985. The insurance company act was again amended in 1993. But it is unfortunate that there was no formal act of insurance until 2010 in Bangladesh. In 2010, Insurance Act- 2010 was passed in the national parliament of Bangladesh. Under this act, Insurance development and regularity authority were established in Bangladesh. At present there are 36 life insurance company and 47 non life general insurance company working in our country.

Present insurance companies in Bangladesh

Life insurance company	Non Life (General) insurance company	Total
35(Private)+1 (Govt)	46 (Private)+ 1 (Govt)	83

Source: Website of IDRA

Currently total 83 insurances companies are working in our country. Among them 36 life insurance company and 47 non life general insurance company working in our country.

Life insurance company	Non Life (General) insurance company
1. Sonali Life Insurance Company Limited	1. Agrani Insurance Company Ltd.
2. MetLife Bangladesh (American Life Insurance Company Ltd).	2. Asia Insurance Ltd.
3. Guardian Life Insurance Limited	3. Asia Pacific Gen Insurance Co. Ltd.
4. Chartered Life Insurance Company Limited	4. Bangladesh Co-operatives Ins. Ltd.
5. Astha Life Insurance company Limited (a concern of Bangladesh Army welfare Trust).	5. Bangladesh General Insurance Co. Ltd.
6. Delta Life Insurance Company Ltd.	6. Bangladesh National Insurance Co.Ltd.
7. Meghna Life Insurance Company Ltd.	7. Central Insurance Company Ltd.
8. National Life Insurance Company Ltd.	8. City General Insurance Company Ltd.
9. Padma Islami Life Insurance Company Ltd.	9. Continental Insurance Ltd.
10. Popular Life Insurance Company Ltd.	10. Crystal Insurance Company Ltd.
11. Bengal Islami Life Insurance Ltd.	11. Desh Gen. Insurance Company Ltd.
12. Prime Islami Life Insurance Co. Ltd.	12. Eastern Insurance Company Ltd.
13. Progressive Life Insurance Company Ltd.	13. Eastland Insurance Company Ltd.
14. Rupali Life Insurance Company Ltd.	14. Express Insurance Ltd.
15. Sandhani Life Insurance Company Ltd.	15. Federal Insurance Company Ltd.
16. Sunflower Life Insurance Company Ltd.	16. Global Insurance Ltd.
17. Sunlife Insurance Company Ltd.	17. Green Delta Insurance Co. Ltd.
18. Zenith Islami Life Insurance Ltd.	18. Islami Commercial Insurance Co. Ltd.
19. Mercantile Islami Life Insurance Ltd.	19. Islami Insurance Bangladesh Ltd.
20. Pragati Life Insurance Ltd.	20. Janata Insurance Company Ltd.
21. Guardian Life Insurance Ltd.	21. Karnaphuli Insurance Company Ltd.

22. Fareast islami Life Insurance Company Ltd	22. Meghna Insurance Company Ltd.
23. Best Life Insurance Company Ltd.	23. Mercantile Insurance Company Ltd.
24. Protective Islami Life Insurance Co. Ltd.	24. Nitol Insurance Company Ltd.
25. Bondhon Life Insurance Co. Ltd.	25. Northern Gen.Insurance Company Ltd.
26. Sawdesh Life Insurance Co. Ltd.	26. Peoples Insurance Company Ltd.
27. Diamond Life Insurance Co. Ltd.	27. Phonix Insurance Company Ltd.
28. Alpha Islami Life Insurance Ltd.	28. Pioneer Insurance Company Ltd.
29. Trust Islami Life Insurance Co. Ltd.	29. Pragati Insurance Ltd.
30. Jamuna Life Insurance Ltd.	30. Paramount Insurance Company Ltd.
31. Golden Life Insurance Ltd.	31. Prime Insurance Company Ltd.
32. Homeland Life Insurance Company Ltd.	32. Provati Insurance Company Ltd.
33. Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.	33. Purabi Gen Insurance Company Ltd.
34. NRB Islami Life Insurance Company Ltd.	34. Reliance Insurance Limited
35. Baira Life Insurance Company Ltd.	35. Republic Insurance Company Ltd.
36.**Jobon Bima Corporation (Govt)**	36. Rupali Insurance Company Ltd.
	37. Sonar Bangla Insurance Company Ltd.
	38. South Asia Insurance Company Ltd.
	39. Standard Insurance Ltd.
	40. Takaful Islami Insurance Ltd.
	41. Dhaka Insurance Ltd.
	42. Union Insurance Company Ltd.
	43. United Insurance Company Ltd.
	44. Sena Kalyan Insurance Company Ltd.
	45. Sikder Insurance Company Ltd
	46. 46. Sonali Life Insurance Company Ltd
	47. **Sadharon Bima Corporation (Govt)**

Insurance for Students

Insurance for students is now very important. Actually students can make different policies to minimize the risks of their life. There are many countries where the student

insurance is very popular. We know that the insurance for the student is a must in India. In Our countries some educational institution has started insurance policies for their students. Recently university of Rajshahi has introduced insurance policies for their students. Student insurance can be as follow:

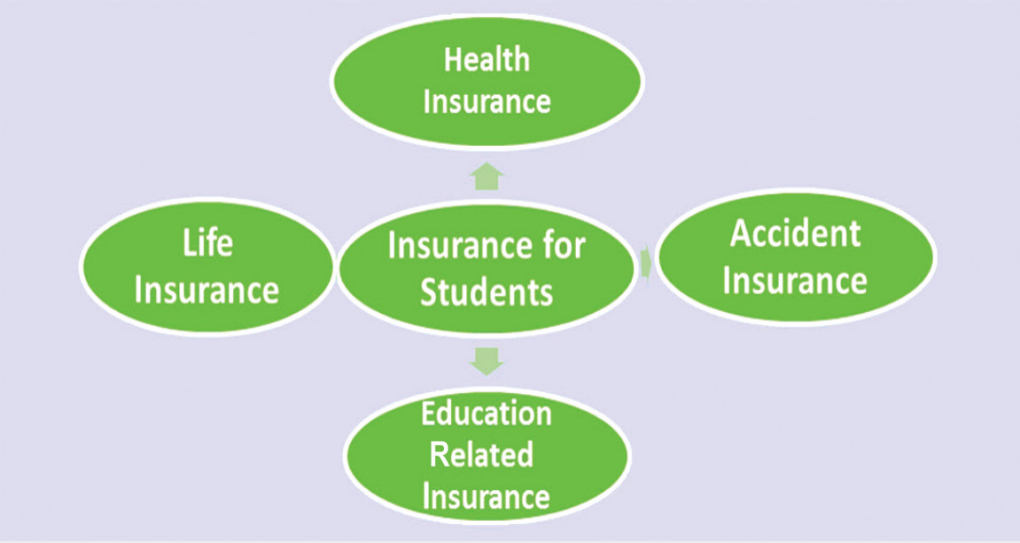

Knowledge about Insurance

	Khulna University	Brajalal College	Azam Khan College
Enough Idea	0%	20%	0%
Little Idea	60%	40%	20%
Very Little idea	40%	20%	40%
No Idea	0%	20%	40%

In the table we see that in Khulna university, students do not have enough knowledge about insurance, in Brajalal college only 20% students have knowledge about insurance, and Azam Khan college 0% students have knowledge about insurance. On the other hand 60% students have little and 40% have very little and 0% students have no idea about insurance. In Brajalal college 40% students have little knowledge, 20% students have very little knowledge and 20% students don't have any idea. In Azam Khan college 20% students have little idea, 40% have very little idea and 40% have no idea about the insurance.

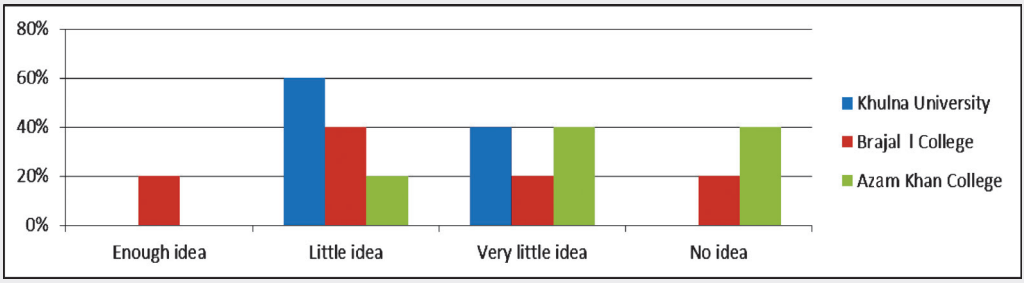

In the graph, we see that Khulna university students have more little idea than that of Brajalal college and Azam Khan commerce college. On the other hand, Khulna university and Azam Khan College have same little knowlwdge but Brajalal college has less little knowledge about insurance. The graph indicate that all the students of Khulna university have some idea about insurance but 20% students of Brajalal college and 40% students of Azam Khan college have no idea about insurance.

Students having insurance policy

	Khulna University	Brajalal College	Azam Khan College
No	100%	100%	60%
Yes	0%	0%	40%
Had a policy	0%	0%	0%
Never Had a policy	0%	0%	0%

The above table shows the students having insurance policy. We see that no student of Khulna University has any insurance policy. But in Azam Khan college 40% students have insurance policy. There are some reasons behind this. As Azam Khan is a commerce college, so they have some idea about the insurance. For this reason 40% students have insurance policy in Azam Khan College. That indicates that if we can provide the knowledge of insurance, then the inclusion of students in insurance policy is possible.

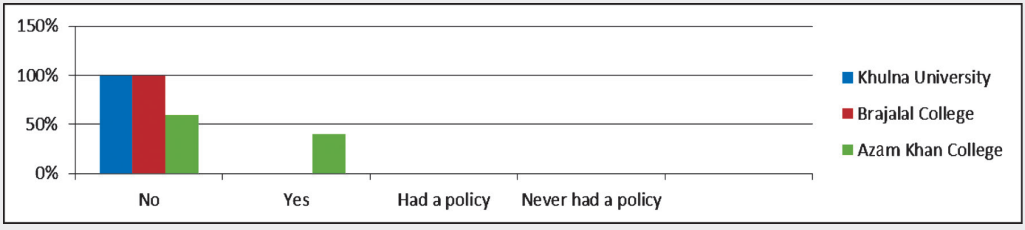

In the graph we see that maximum students of Khulna University, Brajalal college and Azam Khan college don't have any insurance policy. But of the students of Azam Khan

college, some have insurance policy because they study commerce and know about the benefit of insurance. This graph indicates the worse condition of insurance policy made by the students.

Knowledge about the benefit of Insurance

	Khulna University	Brajalal College	Azam Khan College
Enough Idea	0%	0%	0%
Little Idea	40%	80%	80%
Very Little idea	40%	0%	20%
No Idea	20%	20%	0%

If the students know the benefits of insurance then they will be interested to open insurance policy. But it is unfortunate that 0% students of Khulna University, Brajalal College and Azam Khan College have enough idea about insurance. 40% students from Khulna university, 80% students from Brajalal college and 80% students from Azam Khan college have little idea. 40% students from Khulna University, 0% students from Brajalal College and 20% students from Azam Khan college have very little idea. On the other hand 40% students from Khulna University, 0% students from Brajalal college and 20% students from Azam Khan college have no idea.

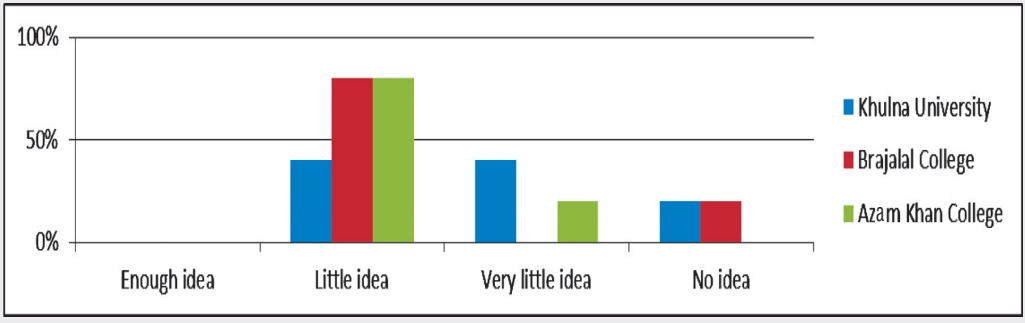

The graph represents that no students have enough idea about the benefit of insurance. Some students have little idea and very few have very little idea about the benefit of insurance. Some students have no idea about the benefit of insurance from the three famous institutions.

Reasons for not making policy

	Khulna University	Brajalal College	Azam Khan College
No reason	20%	20%	0%
Slightly afraid	0%	40%	80%
Afraid	80%	20%	20%
Very afraid	0%	20%	0%

The question is that why they don't want to open policy. 20% students from Khulna University and 20% students from Brajalal college have no reason to make policy but 80% students from Khulna university and 20% students from Brajalal college and 20% students from Azam Khan college are afraid of making policy. On the other hand, 20% students from Brajalal college are very afraid of making policy.

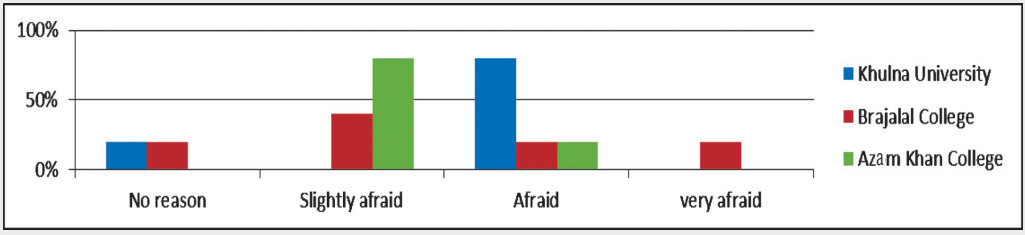

The graph indicates that most of the students from three institutions are afraid of making policy. Some students are afraid and some students are very afraid of making policy.

Reasons for being afraid of making policy

	Khulna University	Brajalal College	Azam Khan College
Don't pay claim	20%	40%	0%
Fraudulence of Agent	40%	20%	20%
Unavailable of service in root level	20%	20%	60%
No idea	20%	20%	20%

In the table we see that in Khulna university, 20% students say insurance companies don't pay claims, in Brajalal college only 40% students say insurance companies don't pay claims. On the other hand, 40% students answer about the fraudulence of Agent from Khulna university and 20% students answer about the fraudulence of Agent from Brajalal college and 20% students answer about the fraudulence of Agent from Azam Khan college. Unavailablity of service in root level is answered by 20% from Khulna

University, 20% from Brajalal college and 60% from Azom khan college. 20% students have no idea it from three institutions.

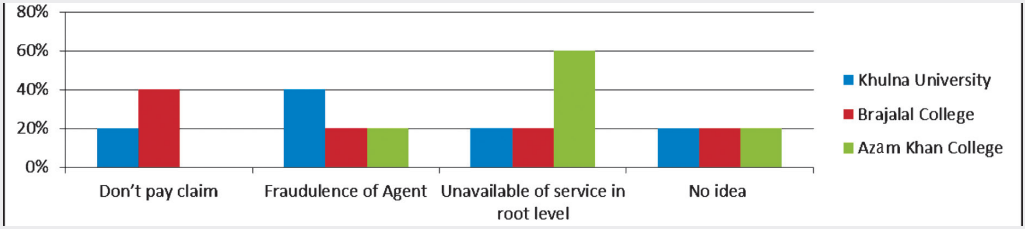

In the graph, we see that maximum students of Khulna university are on the unavailability of service in the root level. On the other hand, most of the students from Brajalal college and Azam khan college say about the fraudulence of Agent. Some students have no idea about it. Some students from Khulna University and Brajalal college have no idea about it.

Do you want to make a policy(before my Description about insurance)

	Khulna University	Brajalal College	Azam Khan College
Yes	40%	20%	60%
Need approval from parents	20%	40%	0%
Need to think	40%	40%	20%
Never	0%	0%	0%

In the table we see that 40% students from Khulna university, 20% students from Brajalal college and 60% students from Azam Khan college want to make policy . 20% students from Khulna University, 40% students from Brajalal college and 60% students from Azam Khan college need approval from their parents. 40% students from Khulna University, 40% students from Brajalal College and 20% students from Azam Khan college need to think to make policy. 0% students say that they don't want to make policy.

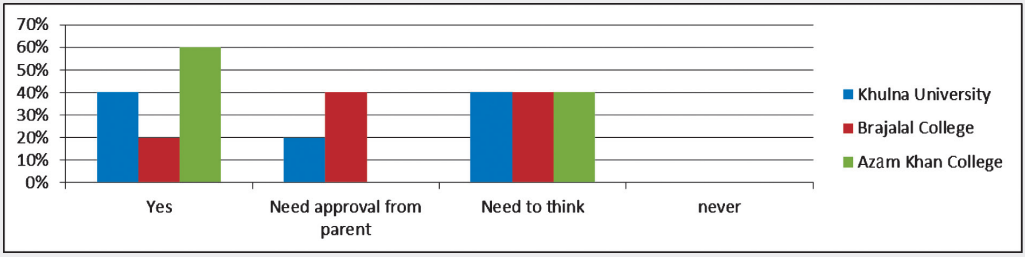

In the graph we see that some students want to make policy, some need permission from their parents and some need to think about it. But no students from three institutions say that they don't want to open a insurance policy.

Do you want to make a policy (after my Description about insurance)

	Khulna University	Brajalal College	Azam Khan College
Yes	60%	40%	60%
Need approval from parents	0%	40%	0%
Need to think	40%	20%	40%
Never	0%	20%	0%

After my description, some students became interested to open a policy. Then 60% students from Khulna university, 40% students from Brajalal college and 60% students from Azam Khan college want to make policy . 0% students from Khulna University, 40% students from Brajalal college and 0% students from Azam Khan college need approval from their parents. 40% students from Khulna University, 20% students from Brajalal college and 40% students from Azam Khan college need to think to make policy.

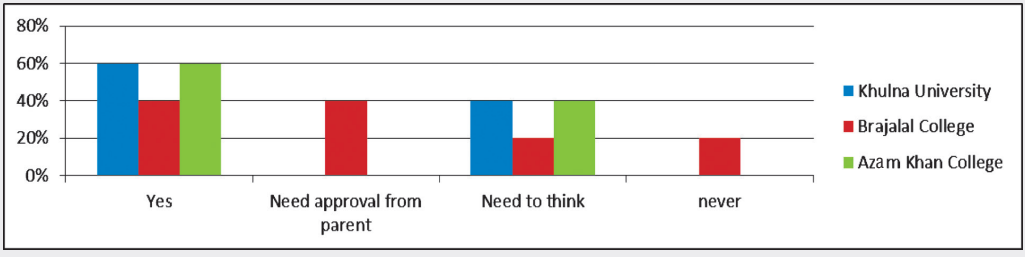

In the graph, we see that After my description, the % of students who want to open policy have increased. On the other hand, the % of students need approval from their parents and need to think has decreased. So it indicates that if we can provide the knowledge of insurance omong the students of honours level, they will be interested to open insurance policy.

Types of insurance policy they want to open

	Khulna University	Brajalal College	Azam Khan College
Life Insurance	20%	20%	0%
Health Insurance	0%	40%	0%
Education related policy	80%	40%	100%
Other policy	0%	0%	0%

20% students of Khulna university , 20% students of Brajalal college and 0% students of Azam Khan college want life insurance. 0% students from Khulna university, 40% students from Brajalal college and 0% students from Azam Khan college want health insurance. 80% students from Khulna university, 40% students from Brajalal college and 100% students from Azam Khan college want education related policy.

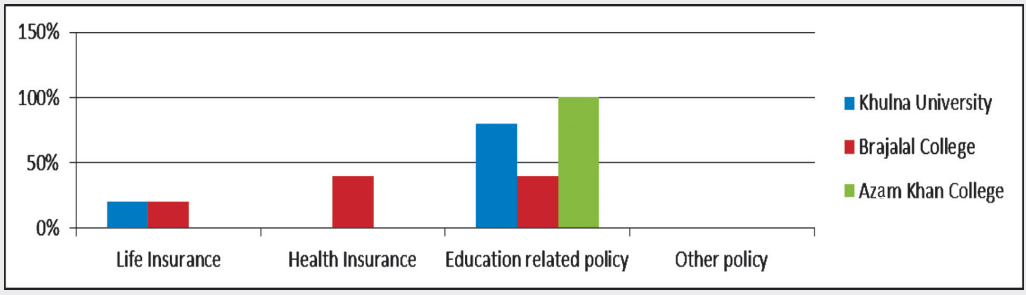

In the graph we see that maximum students from the three institutions want education related policy. Some students want life insurance and some want health insurance. This indicates that the insurance company can introduce the education related policy for the students.

Sources of premium of the students

	Khulna University	Brajalal College	Azam Khan College
From parents	80%	20%	0%
From tuition	20%	60%	80%
Savings from monthly expenses	0%	20%	20%
From scholarship	0%	0%	0%

80% students of Khulna university, 20% students of Brajalal college and 0% students of Azam Khan college want to pay premium from their parents. 20% students from Khulna university, 60% students from Brajalal college and 80% students from Azam Khan college want to pay premium from their tuition. 0% students from Khulna University, 20% students from Brajalal college and 20% students from Azam Khan college want to pay premium from their savings of monthly expenses. No student wants to pay premium from their scholarship.

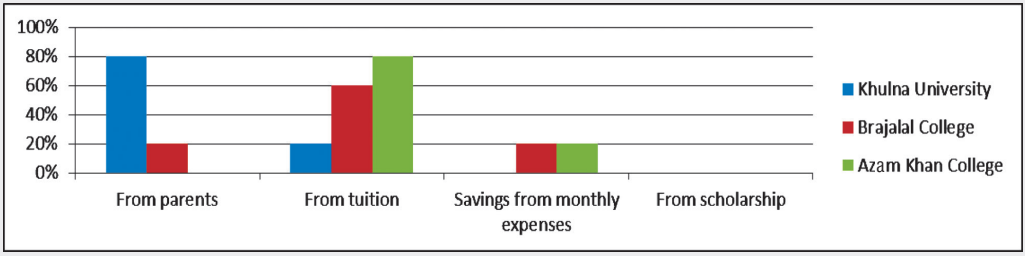

In the graph, we see 0% students from Khulna university, 20% students from Brajalal college and 20% students from Azam Khan college want to pay premium from their savings of monthly expenses. 80% students of Khulna university, 20% students of Brajalal college and 0% students of Azam Khan college want to pay premium from their parents. 20% students from Khulna university, 60% students from Brajalal college and 80% students from Azam Khan college want to pay premium from their tuition fees. 0% students from Khulna university, 20% students from Brajalal college and 20% students from Azam Khan college want to pay premium from their savings of monthly expenses. But no student wants to pay premium from their scholarship.

Findings

- Participation of honours level students in insurance is very alarming.
- Students are interested to participate in insurance sector.
- Students have very little knowledge about the insurance policy.
- Very few companies have student related policy.
- Fail to pay claim and fraudulence of insurance agent are main obstacles against the participation of students in insurance sectors.
- Tuition fees and savings from their monthly expenses are the main sources of premium.
- There is a great possibility of including the students in insurance sector in Bangladesh.

Recommendations

1. Government should come forward to taking different steps to include the students in this sector.
2. Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA) should develop policy guidelines regarding the participation of students in insurance sector.
3. Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA) should ease the process of student- related policy.
4. Insurance companies should arrange some seminar in the university and honours level college to provide them insurance related knowledge.
5. Insurance companies should arrange annual conference with the students of the reputed universities and colleges.
6. Universities or colleges should come forward to making group insurance for the students like Rajshahi University.
7. Fail to pay claim and fraudulence of insurance agent should be stopped.
8. Insurance companies can appoint students from different universities and honours level colleges who will work to open the students related policy.

Conclusion

Insurance sector plays an important role in developing the economy of a country like Bangladesh. But this sector has not been developed yet. A large number of students are out of this sector. But there is a great possibility of including them in this sector to expand its area. Many students don't have insurance policy even any knowledge about insurance. But they are interested to enter into the sector. So our government should take necessary steps to make the market available for the students of honours level. Insurance Development and regulatory Authority (IDRA) can develop policy guidelines regarding inclusion of the honours level students. The guidelines have to be suitable for both students and the company. Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA) should formulate necessary policy to ease the opening insurance policy and paying the claim. The claim of the students should be paid within shortest possible time. The students want to make online policy and they want to deposit premium without any

middleman or agents. Insurance companies can arrange different seminar, conference in different Universities and colleges inviting students to gain knowledge and make insurance policy. If the Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA) and insurance companies can solve the problem and create the consciousness among the students then it will be possible to include them in the insurance sector.

Reference

1. Ibrahim.Md (2019), Expansion of Non-life Insurance both Public and Private Sector in Bangladesh, Insurance Journal,Vol-64
2. Mohammad Ali (2020), Challenges, Prospects and Role of Insurance on Economic Growth in Bangladesh, IIUM Journal of Case study in Management,Vol-2
3. http://www.idra.org.bd
4. http://www.bia.gov.bd

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 172-179

Marginalisation of Women on Caste

A Subaltern Study of *Chandalika* and *Draupadi*

Sharif Atiquzzaman

Abstract

The marginalized people of Indian society have been neglected and tortured by the dominating section since time immemorial. The so-called upper-class people labelled them as subhuman untouchables. Although subaltern studies as a critical theory were unknown to Rabindranath Tagore, it will be interesting to review ***Chandalika*** *from the post-colonial standpoint. The musical drama shows plenty of evidence of subalternity. Prakriti, a low-caste girl, broods over her destiny and curses her mother for giving her birth to an untouchable family. Dopdi, the central character in Mahasweta Devi's* ***Draupadi*** *also allows us to view the subaltern identity with the hegemonic structures of the society. It's a story about a santhal woman who organised a rebellion against the local landlords who didn't allow them to fetch water from their wells for being untouchable. Dopdi, in Devi's story,* ***Draupadi*** *is a revised and demythicised incarnation of the epical Draupadi. She belongs to a small ethnic group called santhal. In her reincarnation, she is placed within a contemporary historical context, where her present status is described as an activist in the Naxalite movement of the seventies. Mythology is used here as a source and vehicle of hegemonic control over the marginalized 'other'. This article would be investigating Tagore's* ***Chandalika*** *and Mahasweta Devi's* ***Draupadi*** *from the subaltern standpoint, and focus on Tagore's ideal of humanitarianism and universalism giving a strong espousal to the Doctrines of Buddha. The paper also aims at showing how Mahasweta Devi produces a sense of male-dominated power structure, deconstructive and counter-historical discourse. Referring to the subaltern theory, it will further explore postcolonial issues of subjectivity, marginalisation, and identity formation.*

Sharif Atiquzzaman
Professor of English
Principal
Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh
e-mail : sharifatiquzzaman@yahoo.co.uk

Keywords

Subaltern, Postcolonial, Marginalisation, Untouchable, Subjectivity, Identity

Objectives

Revisiting, relocating, and reflecting upon the images of female subaltern within the hegemonic framework of the society are the main objectives along with presenting the shifting paradigms of women subaltern in these select texts.

Methodology

This paper has been written within the theoretical structures of subaltern studies, examining and discussing the secondary data collected through books, journals, websites, etc.

Introduction

Subalternity means position without identity. The term subaltern was first used by Antonio Gramsci in his Prison Notebooks. It refers to marginalised and lower-class who were subjugated by the hegemonic sections of society. 'The history of subaltern social group is necessarily fragmented and episodic… Subaltern groups are always subject to the activity of ruling groups even when they rebel and rise up.'[1] Subaltern studies, as an interdisciplinary theory emerged in the early eighties and were made popular in post-colonial discourse by a group of intellectuals like Ranajit Guha, Gayatri Chakravorty Spivak, Gautam Bhadra, Dipesh Chakrabarty, Gyanendra Pandey, and others. When Spivak focuses on some of the problems of third-world women in her essay 'Can the Subaltern Speak?' in 1985, the discourse gained momentum. Her opinion about the subaltern having no history, and females being more deeply in shadow has drawn attention since then. To her, subaltern women are subjected to operation more than subaltern men.

The Orthodox Indian society always considered women inferior and this notion is reflected in many literary texts where women are portrayed as Draupadi, Kunti, and Sita of the Indian epic. This kind the portrayal throws light on the mechanism of patriarchy and reveals the attitude of society toward women. 'Thus humanity is male and man defines woman, not in herself but in relation to himself; she is not considered an autonomous being.'[2]

Rabindranath is famous and criticized as well for his unconventional portrayal of women characters. A great number of rebellious female characters in his writings challenge the existing social customs and claim their right and dignity as human beings. Vinodini (Chokher Bali), Uma (Khata), Mrinal (Stri Patra), Charulata (Nashtanir), Kumudini (Jogajog), and finally Prakriti (Chandalika) tried to break the shackle of patriarchy. Of all these female characters, Prakriti is in the most fragile condition as she belongs to the low-caste community that was treated as untouchable. Tagore was severely criticized for creating these characters by his fellow critics to provoke women to be unsubmissive, but he as a humanitarian raised his voice for the right cause.

Rabindranath Tagore was not unaware of the Dalit movement that started in the early Twentieth century and got momentum in the 1930s when Dr. B R Ambedkar took over the leadership, but a conflict ensued between Mahatma Gandhi and Ambedkar. He declared in a meeting, 'unfortunately, I was born an untouchable Hindu but I will not die as a Hindu' and he converted to Navayana Buddhism accompanied by nearly half a million Dalit after two decades in 1956 and died after two months. It happened 15 years after the death of Rabindranath Tagore though he wrote *Chandalika* in 1938, three years before his demise. As Tagore was fully aware of the discrimination and violence faced constantly by the Dalits, he addressed the problem in an artistic manner by writing *Chandalika*. He protested against the age-old struggle of the marginalised section composing the drama on a Buddhist legend he came across while reading *The Sanskrit Buddhist Literature* by Rajendralal Mitra.

According to the story, Ananda, a famous disciple of Buddha being thirsty seeks water from Prakriti, an untouchable young girl who serves him water from her pitcher after a few hesitant attempts. She knows that she is deprived of the right to serve water to anyone for being an untouchable girl, but Ananda teaches her that there is no discrimination between human beings on the basis of caste and creed. She is the same human being as he is. Prakriti is moved by his liberal humanitarian attitude and falls in love at first sight. When her mother comes to know it, she becomes afraid and starts cursing her daughter for committing a sin. There is a long debate between mother and daughter regarding social discrimination, deprivation of human rights, untouchability, religion, love, and social nuances prevalent in society. And Prakriti, the gendered subaltern stands as a resolute challenge to the issues of untouchability.

Prakriti, being a daughter of a social outcast, always laments her destiny and curses her mother for giving her birth in such a lower-caste family. Everywhere she is tortured, subjugated, and ignored by surrounding people. The neighbours despise her, the hawkers do not sell their goods to her, and thus, she is deprived of her human rights everywhere. In this situation, her coincidental meeting with Ananda and her subsequent act of falling in love with him inspires her to establish her identity as a human being. She starts believing that she has the right to love and shows desperation to materialise the love. Her love and reverence for Ananda arouse her self-determination, self-consciousness, and self-esteem. Finding no way to meet Ananda, she requests her mother to bring him back with her magical power. Her reluctant mother finally agrees with the stubborn insistence of Prakriti and successfully drags Ananda before her. But the response of love she expected in Ananda's face was absent, giving her a new realisation that Ananda is a pure soul above all kinds of earthly desire. Prakriti touches her feet seeking forgiveness and requests her mother to break the magic spell which costs her mother's life. The play ends with Ananda uttering blessing words on her.

Legend states that the *varnas* (colours) sprang from Prajapati, a creator god—in order of status, the Brahmin (white) from his head, the Kshatriya (red) from his arms, the Vaishya (yellow) from his thighs, and the shudra (black) from his feet. Shudras, the fourth and lowest of the traditional caste are practically artisans and labourers. They are not allowed to perform the upanayana or any spiritual rites. Although there is no precedent of untouchability in the apex source of class division, it is only with the interpretation of those hymns the caste system and untouchability took birth. According to the prevalent discourse of untouchability, they don't have any right to live rightfully. It does not matter whether they do good or bad. Belonging to the lower caste, they have no right to enjoy the equal status of the higher class. Their fate is predestined and unchangeable. And it is reasserted by Prakriti's mother as a way to refrain her from loving Ananda. '… you were born a slave. it is the writ of destiny, who can undo it?'[3]

In *Chandalika*, Rabindranath Tagore deconstructed a Buddhist legend portraying Prakriti, a chandal girl as the central character. His aim was to give the girl an illuminated and spiritual elevation from a subaltern status. Here Ananda, the Buddhist monk is the elevator, and Prakriti is elevated. When Ananda sought water from her and she declined to serve water to him for being an untouchable, Ananda affirmed the human value in

her by saying that both they are human beings and there was no discrimination between them. Prakriti felt self-elevated and deconstructed all the discourses of untouchability. She instantly constructed her own identity by refusing to follow the doctrines of her own religion anymore. She felt a sense of emancipation and said, 'A religion that insults is a false religion.'[4]

Tagore portrays the Buddhist monk Ananda as the messenger of God who comes up with the message of equality to Prakriti. When Prakriti mentions to Anand of her lower birth, he says, 'As I am a human being, so also you are, and all water is clean and holy that cools our heat and satisfies our thirst.'[5] Prakriti instantly receives the message and expresses her joy as if she took a new birth. Though her mother Maya constantly warns her against the illusive pursuit as she is untouchable, Prakriti tirelessly contradicts the discourse of untouchability and subalternity. She refuses to accept the myth of caste and origin. She tells her mother, 'self-humiliation is a sin, worse than self-murder.'[6]

Although her love for Ananda is nothing but an earthly desire, her voice is a protest against the religious hypocrisy prevalent at that time. Prakriti emerges as a feminine resistance to the so-called caste ideology. Rabindranath's aim behind writing this play on the basis of Buddhist scriptures is to reveal the evils of the religious caste system and untouchability in the Indian social structure. The light infused in her by Ananda gives her the power to disregard vile practices in the name of religion. Although the theory of subaltern studies was unknown during Tagore's time, he wrote the play only on humanitarian grounds. *Chandalika* is a powerful critique of Indian society that deprives the fundamental right of a low section of the Hindu community labeling them as untouchables. The play is a subaltern protest against upper-class hegemony. Rabindranath also draws attention to the inner weakness of subaltern people through the character of Maya who accepts her position as predestined. This subjectivity is not only externally imposed but also is ingrained in the subaltern mentality. Prakriti's endeavour to transcend her externally imposed social status of marginality is at first thwarted by her mother. Prakriti condemns her mother's passivity by saying, 'Fie, fie, Mother, I tell you again, don't delude yourself with this self-humiliation—it is false, and a sin. Plenty of slaves are born of Royal blood, But I am no slave; plenty of Chandals are born of Brahmin families, what I am no Chandal.'[7] In this dance drama, Tagore focuses on Prakriti's struggle, limitations, and possibilities too.

Mahasweta Devi, in some of her fiction, portrays women's subjugation on the basis of caste and class. In her *Draupadi*, she represents a Santhal tribe woman who fought for the rights of her community. Both the tribal 'Dopdi' and the mythological 'Draupadi' of the *Mahabharata* struggled for their rights snatched by the upper-class hegemony. Mahasweta intervenes in the mythology which is the vehicle of hegemonic control of the marginalised people. Mahasweta devi, by using mythology, is showing the oppression continuing from the days of the *Mahabharata* to the present times. She, by deconstructing the mythological figure, portrayed her with vigour and potential. The passive Draupadi is transformed into an active protester.

Draupadi is a story about Dopdi Mehjen, a woman who belongs to the Santhal tribe of West Bengal. The landlords do not allow them to fetch water from their wells as they are untouchables. She along with her husband, Dhulna Majhi, murders wealthy landlord Surja Sahu and his sons, and usurps their wells, which are the primary source of water for the villagers. The government attempts to subjugate the tribal rebellion through kidnapping, murdering, and raping. At first, they murder Dulna and Dopdi is captured by Senanayak who instructs the army officers to rape her to get information about the rebel uprising.

Ironically, when the same officer who ordered the soldiers to violate her chastity, insists that she should come before him wearing a saree, but she refuses and comes naked. Senanayak asks where her clothes are and the men say she tore them. Dopdi shakes with laughter and in a terrifying voice emanating from her bleeding lips, asks what the use of clothes is—they can strip her, but they cannot clothe her again. She spits a bloody gob on his shirt and says that there isn't a man that she should be ashamed of. She will not let anybody put a cloth on her. What more can they do?

The story is an adaptation of the *Mahabharata*'s grand narrative and royal attributes and is situated in Champabhumi, a village in West Bengal. The stripping of Draupadi's cloth is reconstructed in Devi's story, subverting the narrative where Draupadi is rescued by Lord Krishna. Instead, in Devi's narrative, Dopdi is not rescued, yet she refuses to be a victim, leaving the armed men terribly afraid.

Dopdi is a woman of strong will as she defied the shame associated with rape and sexual abuse. Mahasweta's stories are counter-hegemonic as these reveal the history of

repression within the mythical narratives. Referring to her re-construction of subaltern history by deconstructing mythical discourse, Radha Chakravorty writes: 'One of the most notable features of Mahasweta Devi's writings is the visionary, utopia or myth-making impulse that acts as a counter-balance to her dystopian, 'forensic', critical perspective on the contemporary world.'[8]

The lives of poor tribes, their revolt, and their sufferings are not mentioned in mainstream history books. Mahasweta Devi attempts to give them a voice through her writings because she wants their voices to be heard. Dopdi, in her story *Draupadi*, is a deconstructed incarnation of the mythological Draupadi, who belongs to the Santhal tribe. In her reincarnation, she is placed within contemporary historical contexts where her ancestry is treated as lower caste. Dopdi is a gendered subaltern. As a woman of the low economic class, she is subjected to subalternation.

Dopdi is in a situation where she has to act for herself. Physical torture, curse, and other forms of aggression have always been used to control women's bodies. Always the female body is both the object of desire and the subject to control. Dopdi is gang-raped and brutally tortured all through the night, but she neither expects nor receives salvation from anyone. She neither wash nor allow the rapists to clothe her body. The sexual assault of the *Mahabharata* episode was staged to consolidate power. Mahasweta Devi's Dopdi reverses the situation and produces a sense of terror and confusion among the rapists. No divine agent comes to rescue her. The mythological Draupadi prays and seeks help from paternal powers in her crisis. Mahasweta's Dopdi seeks help from none. She defies the authority and calls them cowards.

Dopdi, a woman of the forest is born and brought up in the lap of nature who symbolises freedom. On the other hand, Senanayak is a representative of the modern patriarchal world order. By refusing to carry out the order of Senanayak, Dopdi not only stands against the state-power but also questions the masculinity of those that violate her chastity. Thus raising her voice, she effectively breaks Gayatri Chakrabarty Spivak's contention in her book *Can the Subaltern Speak?* Dopdi is a subaltern female character who can not only speak but also act.

Conclusion

Tagore's dance drama denounces the contemptible caste system practiced in the name of religion in society. Though he has portrayed Prakriti as a rebellious character, he has not forgotten to show her limitations and impossibilities. The artistic representation of such a subaltern theme is an attempt by Rabindranath Tagore to draw people's attention to the inhumanity and establish equality among human beings. The possibilities of the subaltern society are essential requirements for nation-building. What Mahasweta Devi wants by portraying the character of Dopdi is to show the subaltern challenges in the upper-class hegemonic society. Connecting the theme to the Naxalite movement, she seeks social change. Once she told,'I want a change in the present social system and do not believe in mere party politics.'[9] Thus *Draupadi* becomes a symbol of resistance. She represents millions of tribal women who are fighting against religious and state oppression and they dare to challenge imperialism and patriarchy. Dopdi is marginalized in more than one way as she lives in constant fear of victimization. But finally, she stands with her tribal identity and fights for the rights of her whole community.

References

1. Gramsci, Antonio. *Selections from Prison Notebooks*, Ed. and Trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, London: Lawrence and Wishart, 1971, Print, Pp. 54-55
2. Beauvoir, de Simone, The Second Sex, Translated by Constance Borde & Sheila Malovany Chevallier, Vintage Book, New York, 2010, Print, Pp-26
3. Tagore, Rabindranath. *Three Plays,* Trans. Marjorie Sykes, Madras: Oxford University Press, 1970, Print, Pp-158
4. Ibid, 154
5. Ibid, 148
6. Ibid, 148
7. Ibid, 158
8. Chakrabarty, Radha. *Reading Mahasweta: Shifting Frames,* Ed. Mahasweta Devi Critical Perspective, New Delhi: Pencraft International, 2011, Print, Pp-69
9. Mahasweta Devi, *Agnigarbha*, Calcutta, 1978, Pp. 8

BL College Journal Vol-IV, Issue-I, July 2022 Subscription : BDT 300/- [$ 5 Outside Bangladesh]

Published by
Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna, Bangladesh